বুবু / পিতুনকে

সূচী

আধুনিক ইতালিয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার আলবার্তো মোরাভিয়ার জন্ম উনিশ শো সাত খৃস্টাব্দে—জন্মস্থান রোম, পিতা পেশায় স্থপতি।

প্রথম জীবনে আলবার্তোর স্বাস্থ্য ভালো ছিলো না, ন-দশ বছর থেকে বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত ক্রমাগত নানান অসুখে ভুগেছেন। কিন্তু নিতান্ত বালক বয়সেই তিনি ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজি—এই তিনটি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেন। উনিশশো পঁচিশ খৃস্টাব্দে প্রথম উপন্যাসটি রচনার সময় আলবার্তো তুরিনের La Stampa এবং La Gazzetta act popola পত্রিকার লণ্ডন, পারী এবং অন্যান্য স্থানের বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী ফ্যাসিস্ট যুগে তাঁর সমস্ত লেখা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হওয়ায়, আলবার্তোকে ছদ্মনামে লেখা চালিয়ে যেতে হয়। উনিশ শো চুয়াল্লিশ খৃস্টাব্দের মে মাসে জার্মান অধিকার থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই বিদ্রোহী লেখককে ইতালির পাহাড়ে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে।

সমাজজীবনের সর্বস্তরের মানুষই আলবার্তোর রচনায় স্থান পেয়েছে। বিলাস-ব্যসন-ব্যভিচারে ডুবে থাকা অভিজাত সম্প্রদায় থেকে শুরু করে ছুতোর, মুচি, পরিচারিকা, বারবনিতা—সকলকেই তিনি নিষ্ঠুর রূঢ়তা আর সূক্ষ্ম সহানুভূতির চেতনায় অপরূপ করে তুলেছেন, আবেগবিহীন নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় সুস্পষ্ট করে তুলেছেন ছোট ছোট মানুষের ক্রোধ আর করুণা, বাৎসল্য আর ঈর্ষা, প্রেম আর যৌন চেতনা।

দ্য উওম্যান অফ রোম, টু উওমেন, এ গোস্ট অ্যাট নুন—ইত্যাদি সার্থক উপন্যাসের স্রষ্টা আলবার্তো মোরাভিয়া ছোট গল্পও লিখেছেন অনেক এবং ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর অসামান্য দক্ষতা নিঃসন্দেহে প্রশ্নাতীত।

ঝোপঝাড়ের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাতে একটা পাইন গাছের ছায়ায় গাড়িটা রেখে ওরা বালিয়াড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে সমুদ্রের দিকে এগুতে লাগলো। তেতে ওঠা বালির ওপর দিয়ে মেয়েটি ওর স্বামী সার্জিয়োর আগে আগে মনের আনন্দে ছুটে যাচ্ছিলো, খানিকটা পেছন থেকে খাবারের ঝুড়ি আর সমুদ্রের ধারে বিছিয়ে বসার একটা চাদর নিয়ে সার্জিয়ো অনুসরণ করছিলো ওকে। হঠাৎ একটা বালিয়াড়ির পেছনে উধাও হয়ে গেলো মেয়েটি : ওকে এত খুশী খুশী মনে হওয়াতে সার্জিয়োর নিজেরও আনন্দ লাগছিলো—সে নিশ্চিত ছিলো বালিয়াড়ির চুড়োয় পৌঁছে সে দেখবে, ও ততক্ষণে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু চুড়োর দিকে তাকিয়ে সার্জিয়ো দেখলো, তার স্ত্রী থমকে দাঁড়িয়েছে এবং সমুদ্রসৈকত আদৌ জনহীন নয়, যেমনটি হবে বলে সে আশা করেছিলো। বালির বুকে গেঁথে থাকা কতকগুলো ডালপালার সামনে একদল মানুষ—দেখে মনে হয় অর্ধনগ্ন জেলের দল—এবং তাদের মধ্যে স্পষ্টই ফৌজি উর্দি পরা একটা লোক যেন বিব্রত অবস্থায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডালপালাগুলোর মাঝখানে সাদা মতো কি একটা জিনিসও যেন দেখা যাচ্ছে।

ধীর পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেলো সার্জিয়ো, ডালপালাগুলোর কাছে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি ?'

'একটা মরা মানুষ,' অসন্তোষের ভঙ্গিমায় জবাব দিলো ও।

সার্জিয়ো দেখলো, সূর্যের তাপে ডালপালাগুলো ইতিমধ্যেই শুকিয়ে এসেছে, বিবর্ণ পাতাগুলো নেতিয়ে পড়েছে চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা লম্বাটে দেহটার ওপরে। জাদুঘরে রাখা মিশরীয় শবাধারের কথা মনে পড়লো তার। চাদরটাতে মৃত মানুষটার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো স্পষ্ট করে ফুটে ওঠেনি, শুধু পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেহরেখাটা জেগে

রয়েছে। বোঝা যায়, কোন্ জায়গাটাতে মানুষটার হাঁটু দুটো। বোঝা যায়, ওর হাত দুটো বুকের ওপরে ভাঁজ করা রয়েছে, চিবুক পেছনের দিকে হেলানো। চাদরের বাইরে শুধুমাত্র চুল ছাড়া মানুষটার আব কিছুই দেখা যায় না। চুলগুলো বাদামী আর ঝলমলে, এখনও সতেজ। 'লোকটা ঘণ্টাখানেক আগে জলে ডুবেছে,' টুপি খুলে ভ্রূ থেকে ঘাম মুছে নিয়ে উর্দি-পরা পুলিস ইন্সপেক্টারটি বললেন। 'লোকটা কে, আমরা জানি না—ওর সঙ্গে কাগজপত্রও কিছু ছিলো না।'

মৃতদেহটার দিকে শেষবারের মতো একবার তাকিয়ে সার্জিয়ো স্ত্রীর সঙ্গে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলো।

সার্জিয়ো লক্ষ্য করলো, একটা অসন্তুষ্টির ভাব নিয়ে ওর স্ত্রী আস্তে আস্তে অগভীর জলের মধ্যে নেমে চলেছে—দুধারে দুলছে ওর বাহু দুটি, কবোষ্ণ স্রোতগুলোর মোকাবিলা করাব জন্যে ওব পেটটা সামনের দিকে এগুনো। ঝলমলে সূর্যটাব নিচে সমুদ্রের জল যেন ফুটছে বলে মনে হলো সার্জিয়োর। এ বছরে এটাই ওদের প্রথম সমুদ্রস্নান। ক্লারার শরীর এখন শীতল ও কঠিন শুভ্রতায় ভরা এবং সার্জিয়ো জানে, ওর ওই শুভ্র রঙ শীঘ্রই প্রচণ্ড লাল হয়ে উঠবে—কিছুতেই বাদামী হবে না। ক্লারার গডন সুন্দর নয়। নিতম্বের কাছটা সঙ্কীর্ণ, পা দুটো ভারি, ঘাড়টা সরু, কিন্তু মাথাটা বড়। অথচ ও রূঢ, গম্ভীর এবং সন্দেহজনক চরিত্রের নারী হওয়া সত্ত্বেও সার্জিয়ো পবম স্নেহে ওর দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলো, তাবপর ওকে ধরার জন্যে ছুটে গেলো সামনের দিকে। কিন্তু সামুদ্রিক লতায় পা বেঁধে যাওয়ার দরুন ক্লারার শরীরের ওপরেই উলটে পড়লো সে, ক্লারাকে ফেলে দিলো নিজের শরীরের আঘাতে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ক্লারা কর্কশ স্বরে বললো, 'সমুদ্রের মধ্যে আমি ঘোড়ার খেলা পছন্দ করি নে!'

'আমি দুঃখিত,' সার্জিয়ো বললো, 'আমি উলটে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'দয়া করে ফের অমন কোরো না,' ক্লারা স্রেফ ধমকে দিলো ওকে।

খানিকটা দমে গিয়ে সার্জিয়ো লক্ষ্য করলো, ক্লারা ওর কাছ থেকে দূরে সরে গেলো।···মাত্র ছ মাস হলো ওদের বিয়ে হয়েছে এবং বিয়েটা সুখের হয়নি। ওদের মধ্যে ভালো বনিবনা হয় না। কিন্তু সার্জিয়ো মনে করে, অজ্ঞাত কারণে ওদের এই বোঝাপড়ার অভাবটা আসলে জীবনেরই এক অভিনবত্ব এবং প্রতিদিনই এটাকে সে দূর করে দেবার আশা রাখে।

জ্বলন্ত সূর্যের নিচে স্বচ্ছ সুরুয়ার মতো অগভীর উষ্ণ জলে নিঃশব্দে, সতর্ক এবং চড়া মেজাজে, একসঙ্গে স্নান করলো ওরা। তবু সমুদ্র থেকে সুন্দর দেখালো উপকূলরেখার বিশাল ব্যাপ্তি। যতদূর চোখ যায়, চারদিক জনমানবশূন্য। একদিকে পরিত্যক্ত একটা প্রাচীন নজর-মিনার, অন্যদিকের বাঁক নেওয়া উপকূলে অরণ্যের মুকুট-পরা পাহাড়ী তীরভূমি। লোনা বাতাস বালি আর উত্তাপের মেঘে দিগন্ত ঢেকে রেখেছে। হলুদ বালিয়াড়ির ওধারে পাইনের অরণ্য কুয়াশা হয়ে মিশে গেছে তার সঙ্গে।

'চমৎকার, তাই না?' আচমকা স্তব্ধতা ভেঙে সার্জিয়ো বললো।

'আমার কাছে ভয়ঙ্কর লাগছে,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো ওর স্ত্রী।

'কিন্তু তুমিই তো এখানে আসতে চেয়েছিলে!'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে আর কি হলো? সেটা আমি ভুল করেছিলাম, ব্যস। জায়গাটা যে আদৌ সুন্দর নয়, সেটা কিন্তু এতে পালটায় না!'

নিরাশ হয়ে চুপ করে রইলো সার্জিয়ো—বুঝলো, সে যা-ই বলুক না কেন, তার স্ত্রী সেটাতেই তার উলটো কথা বলবে।

অবশেষে সমুদ্র থেকে উঠে এসে মৃতদেহটার খুব কাছাকাছি যে জায়গাটাতে ওরা ওদের পোশাকের ছোটখাটো স্তূপটা রেখে গিয়েছিলো, সেখানেই ফিরে এলো। সৈকতভূমি এখন একেবারে নির্জন—শুধু ওরা দুজন আর ডালপালার নিচে মৃতদেহটা ছাড়া কেউ কোথাও নেই। জেলের দল আর পুলিস ইন্সপেক্টারটিও চলে গেছে—চলে গেছে

বালিয়াড়িগুলো পেরিয়ে ওধারে কোথাও।

ক্লারা সারা মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে হাত-পা মুছছিলো। সার্জিয়ো বললো, 'আমরা আর একটু দূরে গেলে পারি না? অনেক তো জায়গা রয়েছে…একটা মরা মানুষের এত কাছাকাছি··'

তোয়ালেটা ছুঁড়ে ফেললো ক্লারা, 'মরা মানুষ আমাকে বিরক্ত করে না।'

'শুধু জ্যান্ত মানুষ…' সার্জিয়ো ঝুঁকি নেয় খানিকটা।

'সব সময় তুমি ঝগড়া করতে চাও কেন, বলো তো?' ক্লারার কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে। 'আমরা সমুদ্রের ধারে এসেছি আনন্দ করতে। কিন্তু তা নয়—সব সময় তোমার ঝগড়াঝাঁটি শুরু করতেই হবে। এখন তুমি আমাকে দিয়ে বলাতে চাইছো যে, তুমি আমাকে বিরক্ত করো।'

'বরং আমি চাই, তুমি তার উলটোটাই বলবে,' মরিয়া হয়ে বললো সার্জিয়ো।

'যাই হোক, আসল ঘটনাটা সত্যিই তাই·· তুমি আমাকে বিরক্ত করো। স্রেফ আমার কথার প্রতিবাদ করবে বলেই যখন তুমি তর্ক করতে শুরু করো, তখন যে-কোন মরা মানুষের চাইতেও তুমি আমাকে বেশি বিরক্ত করো।…এবারে খুশী হয়েছো তো?'

প্রতিকূলতার এহেন প্রকাশে বিহ্বল হয়ে চুপ করে গেলো সার্জিয়ো। ক্লারা নিচের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লো লম্বা হয়ে। ব্রাসিয়ার আর জাঙিয়ার বাঁধন খুলে উন্মুক্ত বুক আর পেট ডুবিয়ে দিলো তপ্ত বালির বুকে। তারপর খানিকটা স্থিত হয়ে অধীর কণ্ঠে শুধালো, 'আচ্ছা, কটা বাজে বলো তো?'

'কটা বাজে,' জিগেস না করে, ও 'আচ্ছা, কটা বাজে' বললো কেন? সামান্য অবাক হয়ে ভাবলো সার্জিয়ো। 'এগারোটা,' জবাব দিলো সে।

'হতে পারে না,' সঙ্গে সঙ্গে তীব্র স্বরে মুখর হয়ে উঠলো ক্লারা।

কোন কথা না বলে সার্জিয়ো তার ঘড়ি-পরা হাতটা ওর চোখের সামনে এগিয়ে ধরলো।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ক্লারার কণ্ঠস্বরে প্রায় বেদনার সুর। আবার বিস্মিত হলো সার্জিয়ো।

ডালপালাগুলোর আশ্রয়ের নিচে মরা মানুষটা রয়েছে বলে সার্জিয়োর গা-বমি-বমি করছিলো। এগিয়ে গিয়ে মানুষটাকে ঢেকে রাখা চাদরটা এক টানে তুলে ফেলার জন্যে এক গোপন ইচ্ছা অনুভব করছিলো সে। অন্য জায়গার চাইতে ওই ডালপালাগুলোর নিচে উষ্ণতা যেন আরও বেশি। লক্ষ্য করলে ওখানে যেন বাতাসের ঈষৎ চাঞ্চল্য দেখতে পাওয়া যায়—ঠিক যেন ধ্বংসের প্রথম নিঃশ্বাস। যুদ্ধে মৃতদেহ-গুলোর ওপরে ঘুরে বেড়ানো সবুজ আর সোনালী রঙের মাছিগুলোর কথা ভাবলো সে। সুতীব্র বিরক্তির এক অদম্য আবেগে সারা শরীর শিউরে উঠলো তার, একেবারে আচমকা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলো, 'আমি জানতে চাই, কেন এই মরা মানুষটার কাছাকাছিই আমাদের থাকতে হবে?'

মুখ লুকিয়ে রাখা বাহুর গহ্বর থেকে ক্লারা জবাব দিলো, 'তুমি তা হলে অন্য কোথাও চলে যাও—আমি এখানেই থাকছি।...ওঁর দিকে নজর রাখার মতো কেউ এখানে নেই, তাই আমি অন্তত থাকবো।'

অর্থাৎ, আর কিছুই করার নেই।...আকাশ থেকে সূর্যটা নিষ্ঠুর তাপ ঝরাচ্ছে, বালিতে তার তীক্ষ্ণ প্রতিফলন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। নিদারুণ বিক্ষুব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ অনড় হয়ে রইলো সার্জিয়ো। তারপর আর সহ্য করতে না পেরে সৈকত পেরিয়ে ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিলো। জলটা আগের চাইতে গরম বলে মনে হলেও, অনেকটা আরাম পেলো সে। ফের যখন দাঁড়ালো তখন দেখলো, তার স্ত্রীও উঠে পড়েছে—মরা মানুষটাকে ঢেকে রাখা ডালপালাগুলোকে ঘিরে সতর্ক-ভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে ও। দূর থেকে স্ত্রীর শারীরিক গড়ন দেখে নতুন করে আকৃষ্ট হলো সার্জিয়ো। এবং আচমকা ভাবলো, ওর সঙ্গে একটু প্রেমের কথাবার্তা বললে বেশ হয়। আমাদের বিবাহিত জীবন কেন এত

বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে ? ভাবলো সে। কেন ? এখন আমি ওর কাছে গিয়ে এমনভাবে ওকে তোষামোদ করতে শুরু করবো, যেন সবেমাত্র ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার···আর আজ সন্ধ্যার মধ্যে অবশ্যই ওকে জয় করে নেবো। নিজের মতলবে নিজেই মজা পেয়ে হাসলো সার্জিয়ো, আস্তে আস্তে উঠে এলো জল থেকে। মরা মানুষটার চারদিকে ঘোরা-ফেরা করে ওর স্ত্রী ইতিমধ্যে আবার পোশাক-আশাকের স্তূপটার কাছে গিয়ে নিচের দিকে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে। সার্জিয়োও ওর পাশে শুয়ে, এক হাতে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে, ফিসফিসিয়ে বললো, 'একটা চুমু দাও।'

'ওহ্, কি হলো তোমার ?' মাথা তুলে ক্লারা বললো, 'মাথাটাথা খারাপ হয়েছে নাকি ?'

'দাও···আমি কি তোমার কাছে একটা চুমুও চাইতে পারি না ?'

'না—এখন না এবং এখানে না।'

'আমরা কি স্বামী-স্ত্রী নই ?'

'কিন্তু এটা খোলা জায়গা। তাছাড়া আর যাই হোক, মৃতের প্রতি তোমার খানিকটা শ্রদ্ধা থাকা উচিত।'

'ওহ্, কি জ্বালা! আমি কি তোমাকে এখান থেকে দূরে সরে যাবার কথা বলিনি ?'

'আমি অন্য কোথাও যাচ্ছি না,' বেদনার্ত হলেও ক্লারার কণ্ঠস্বরে খানিকটা ক্রোধের রেশ। 'তুমি যাও···আমি এখানেই থাকবো।'

চিৎ হয়ে শুলো সার্জিয়ো এবং প্রায় কুড়ি মিনিট ঠিক অমনিভাবেই রোদ্দুরের মধ্যে চুপ করে শুয়ে রইলো। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো, সাড়ে বারোটা বাজে। 'কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয় ?' জোর করে কণ্ঠস্বরে উচ্ছলতা এনে খাবারের ঝুড়ির দিকে হাত বাড়ালো সে।

'কিন্তু এখনও তো সময় হয়নি,' হাতের গহ্বর থেকে ককিয়ে উঠলো ক্লারা—এবারে প্রায় অশ্রুরুদ্ধ ওর কণ্ঠস্বর। আগের বারের মতোই মুখে কিছু না বলে ওর চোখের সামনে কব্জিটা রাখলো সার্জিয়ো। ঘড়ি দেখে

ক্লারা বললো, 'তাহলে তুমি খেয়ে নাও। আমার খিদে নেই।'

প্যাকেট খুলে সার্জিয়ো সালামী ভরা একটা রুটি বের করে খেতে শুরু করলো আর সেই মুহূর্তেই বালিয়াড়ির চূড়ায় ছোট্ট একটা মিছিল দেখা গেলো। মিছিলের প্রথমে সেই পুলিস ইন্সপেক্টার, তারপর সম্ভবত দুজন স্ট্রেচারবাহক, তারপর কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ এবং সবশেষে এক-রাশ বাচ্চাকাচ্চা। বালির ঢাল বেয়ে মিছিলটা মরা মানুষটার দিকে এগুতে শুরু করলো। 'ওরা লোকটাকে নিয়ে যেতে আসছে,' মুখভর্তি রুটি আর সসেজ নিয়ে বললো সার্জিয়ো, তারপর সেও মৃতদেহটার দিকে এগিয়ে গেলো। ক্লারা তখন হুটোপুটি করে ব্রাসিয়ার এবং জাঙিয়া বেঁধে নিয়ে স্বামীকে অনুসরণ করলো।

ডালপালাগুলোর কাছে এসে মিছিলটা থমকে দাঁড়ালো। স্ট্রেচার-বাহী মানুষ দুজন গাছের ডাল ও কম্বল দিয়ে তৈরি স্ট্রেচারটা নিচে নামিয়ে রাখলো। ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত ইন্সপেক্টার নির্দেশ দিলেন, 'নে, এবারে হাত লাগা! ওই ডালপালাগুলোকে আগে তুলে ফ্যাল্। তার-পর দুজনে লোকটার পা আর দুজনে লোকটার হাত ধরে তুলে, ওকে স্ট্রেচারের ওপরে রাখ্।... নে নে, শুরু কর!'

'চাদরটা তুলে ফেলবো?'

'নাঃ, ঢাকা দেয়াই থাক।'

কৌতূহল জেগে ওঠায় সার্জিয়ো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগলো। তার হাতে তখনও সেই আধ-খাওয়া রুটি, এবং অস্পষ্টভাবে জিনিসটার অশোভনতা সম্পর্কে সে সচেতন। কিন্তু এখন ওটা ঝুড়ির মধ্যে রেখে আসার ব্যাপারে বড্ড দেরি গেছে, এত শীঘ্রি এক গরাসে ওটা গিলে ফেলাও যায় না। ওর স্ত্রী স্ট্রেচারবাহকদের কাছে উদ্বিগ্ন-ভাবে ঘোরাফেরা করছিলো, আচমকা তাদের একজনকেই কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করে বসলো, 'লোকটা কে, বলতে পারেন?'

লোকটা বালিতে পুঁতে রাখা ডালপালাগুলোকে প্রাণপণ প্রয়াসে টেনে তোলার চেষ্টা করছিলো। মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলো, 'তা

আমরা জানি না। লোকটার সঙ্গে কাগজপত্তরও কিছু নেই।'

'কিন্তু এখানে ও এলো কি করে?'

'ওই তো, ওর মোটরবাইকে···ওই ঝোপগুলোর কাছে রয়েছে।'

'হতভাগা ছোঁড়া,' স্ত্রীর হাবভাবে বিরক্ত হয়ে কথাটা না বলে পারলো না সার্জিয়ো।

'বোকামো কোরো না,' উঁচু গলায় জবাব দিলো ক্লারা। এ ধরনের একটা বিরূপ মন্তব্য শুনে একজন বাহক অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকালো। 'নে নে, হাত চালা!' ইন্সপেক্টাব হুকুম দিলেন। ছু ধারে ছুজন কবে চারজন লোক সাদা গাঁটরিটাকে তুলে স্ট্রেচারের ওপরে রাখলো। কিন্তু সেই অবকাশে মৃতের মাথাটা পেছন দিকে ঝুলে পড়লো, সরে গেলো চাদরের আবরণ। ওর মুখটা দেখতে পেলো সার্জিয়ো—ঘন রঙ, সুন্দর চোখ-মুখ, কিন্তু খানিকটা মামুলি, প্রায় ওর সমবয়সী।···ঠিক তখনই ক্লারা পোশাক-আশাকের স্তূপটার কাছে ছুটে গিয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

যেমনভাবে এসেছিলো ঠিক তেমনিভাবেই বালিয়াড়িটার দিকে চলে গেলো মিছিলটা—প্রথমে ইন্সপেক্টার, তারপর স্ট্রেচারবাহক ছুজন, তারপব শব-অনুগামী জেলেদের পুরুষ মেয়ে আর বাচ্চাকাচ্চার দল। সার্জিয়োর হাতে তখনও সেই রুটির টুকরো···ক্লারা বালির বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। স্ত্রীর কাছে এগিয়ে গিয়ে সে বললো, 'আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ঘটনাটা তোমাকে বিচলিত করে তুলেছে।···কিন্তু শত হলেও, লোকটা তো নেহাতই অজানা অচেনা!'

বাহুর গহ্বর থেকে ক্লারার হতাশ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'তুমি কক্ষনো কিছু বোঝো না···কোনোদিনও কিছু বুঝবে না!···ও অজানা অচেনা নয়!'

'তাহলে?'

'আমরা ছুজন ছুজনকে ভালোবাসতাম···আজ সকালবেলা আমি এখানে ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যাপারটা ঠিক করে নিয়েছিলাম···আর এখন ও একটা মরা মানুষ!'

সে ও আমি

আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার সামান্য কিছুদিন পরেই আমি নিজের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করি। চলে যাবার কারণ হিসেবে ও বলেছিলো, আমার নীরবতা ওকে ক্লান্ত করে তুলেছে। কথাটা সত্যি, ওর কাছে আমি চুপ করেই থাকতুম—যেমন থাকতুম অন্য সকলের কাছে। কিন্তু ওকে ভালোবাসতুম বলেই আমি চুপ করে থাকতুম। কারণ কাউকে ভালোবাসলে, কথার আর কোন প্রয়োজন থাকে না—তাই নয় কি? তখন শুধু ভালোবাসার পাত্রীটির কাছাকাছি থাকতে, তার দিকে তাকাতে, তার উপস্থিতি সমস্ত প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে ইচ্ছে হয়। ওর কাছে চুপচাপ হয়ে থাকার পর—হয়তো খানিকটা বেশি পরিমাণেই নিশ্চুপ হয়ে থাকার পর—ও যেতেই, যা বললুম, আমি নিজের কাছে বাচাল হয়ে উঠলুম। আমি একজন জুতো তৈরির কারিগর এবং জুতো তৈরির কাজে, সকলেই জানেন, পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়া দরকার। কারণ আর কিছু না হোক, চামড়ার কাজ—সূক্ষ্ম কাজ, তাতে ভুল হলে চলবে না। মানুষের পা ভুল মেনে নেয় না। কাজেই সেদিন সন্ধ্যেবেলা যখন বাড়িতে ফিরে এলুম, তখন আমার চোখে ধাঁধা, মাথার মধ্যে হাতুড়ি পেটানোর আওয়াজ, জুতোর তলিতে পোঁতার আগে মুখে গুঁজে রাখা পেরেকের খোঁচায় ঠোঁটে জ্বালা ধরানোর অনুভূতি। তখন আমি চাইছিলুম—কি আর বলবো—চাইছিলুম ছোট্ট এক টুকরো হাসি, একটু সহৃদয় কথা, কপালে একটি চুমু আর এক বাটি গরম সুরুয়া। তার বদলে কিছুই পেলুম না। শুধু অন্ধকারের মধ্যে রান্নাঘরে খাবার জলের কল থেকে টিপ টিপ করে জল ঝরার শব্দ।…যাকে আপনি ভালোবাসেন সে যখন আপনার কাছে থাকে, যখন আপনি জানেন যে আপনি ইচ্ছে হলেই তার সঙ্গে কথা

বলতে পারেন, তখন নীরবতা একটা চমৎকার জিনিস। কিন্তু সে নীরবতা যখন জোর করে আপনার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেটা একটা যন্ত্রণাবিশেষ। তাই আমার স্ত্রী ওর মার কাছে চলে যাবার পর আমি যখন রান্নাঘরে একা একা রাতের খানা তৈরি করলুম, তারপর একা একাই খুব ধীরেসুস্থে সেগুলো খেলুম—তখন কি করছি তা প্রায় না জেনেই, টেবিলের এক কোণে বসে আমি সরবে চিন্তা করতে শুরু করলুম।

প্রথম প্রথম যেসব কথা আমি ব্যবহার করতুম সেগুলো নেহাতই নৈর্ব্যক্তিক—আমাকে বা অন্য কাউকে উদ্দেশ করে বলা নয়। যেমন, 'বাড়িটা কি ঠাণ্ডা! ওহ্, কি শীত!' কিংবা, 'বাড়িটার বাইরের আর ভেতরের চালের মাঝখানে ইঁদুরগুলো যদি মনের আনন্দে নাচানাচি না করতো, তা হলে জল পড়ার টিপটিপে শব্দ ছাড়া এখানটাতে আর কোন আওয়াজই থাকতো না।' অথবা, 'বিছানাটা আজ সকাল থেকে অগোছালো হয়ে পড়ে আছে। থাক গে, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে —কাল গুছিয়ে ফেলবো।' এ সমস্ত কথা আমি সরবে, মাঝেমধ্যে খুবই উঁচু গলায় বলতুম। কথাগুলো তুচ্ছাতিতুচ্ছ, কিন্তু ওই জনহীন ঘর তিনটের মধ্যে আমার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুনে, আমি খুশীই হতুম।…

একদিন যথারীতি রান্নাঘরে বসে আমি বললুম, 'মদ জিনিসটা ভালো, মদ মানুষকে স্বস্তি দেয়। মাত্র এক লিটার মদ্যপান করলেই সমস্ত ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নিপাত্তা হয়ে যায়।'

আচমকা ঠিক তখনই—কি করে হলো জানি নে—শুনলুম, আমি উঁচু গলাতেই নিজেকে জবাব দিচ্ছি, 'গুগলিয়েলমো, তুমি একটি হতভাগ্য জীব এবং তুমি তা জানো। হ্যাঁ, মদ অবশ্যই সুখাদ্য—কিন্তু স্বস্তিদায়ক নয়। পুরো একটা ডেমিজন খেয়ে নিলেও তুমি তোমার বউকে ভুলতে পারবে না বা সে যে তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে, তাও ভুলতে পারবে না। হ্যাঁ, মদ ভালো জিনিস বটে। কিন্তু তুমি যাকে

ভালোবাসো, তার সঙ্গ আরও অনেক বেশি ভালো।'

কথাগুলোর সত্যতায় স্তম্ভিত হয়ে আমি বললুম—অর্থাৎ আমার প্রথম কণ্ঠস্বর বললো, 'তুমি ঠিকই বলেছো। কিন্তু সবই যখন বলা এবং করা হয়ে গেছে, তখন আমি আর কি করতে পারি? আমার বয়েস পঞ্চাশ—আমার স্ত্রী, যার বয়েস পঁচিশ, সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন আমার জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে, এমন আর একটি মহিলা আমি কোথায় খুঁজে পাবো? কাজেই এখন মদ ছাড়া আমার আর অন্য কিছু নেই, তাই নয় কি?'

'শোনো, দার্শনিকের মতো চাল দেখিয়ো না,' অন্য কণ্ঠস্বরটি বললো। 'তুমি ভালো করেই জানো, তুমি তোমার বউয়ের আশা পুরোপুরি ছেড়ে দাওনি।'

'কে বলেছে তোমাকে?' আমি জবাব দিলুম, 'আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি…সত্যিই ছেড়ে দিয়েছি।'

'কক্ষনো না,' সে বললো। 'আশা যদি ছেড়েই দিতে, তাহলে যখন-তখন যেখানে-সেখানে—এমন কি কলঘরে বা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করার সময়ও—শুধুমাত্র ওর চিন্তাতেই তুমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে না।'

তার মানে হলো এই যে, এখন থেকে আমার তুটো কণ্ঠস্বর—যার মধ্যে একটা আমার হয়ে কথা বলে, আর একটা বলে অন্য কারুর হয়ে—যেটা আমি, অথচ আমি নই। এইভাবে স্বগতোক্তি থেকে আমি কথোপকথনে চলে এলুম—অর্থাৎ নিজের সঙ্গে কথা বলা থেকে, নিজের সঙ্গে তর্ক করতে শুরু করলুম।

এই সমস্ত তর্ক-বিতর্ক সব সময়ে যে তর্ক হয়েই থাকতো, তা নয়। কখনো কখনো আমি আর সে সম্পূর্ণ একমতও হতুম। যেমন ধরা যাক, রাত্রিবেলা আমার বরাদ্দ দেড়-তু লিটার মদ টানার পর আমি শোবার ঘরে গিয়ে নিজেকে মজা দেবার জন্যেই আলমারির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ বিকৃত করতুম। ও তখন বলতো, 'তাহলে আবার দেখা

হলো।…তুমি মদ খাচ্ছিলে। তবু ভালো, বাড়িতে আছো—রাস্তায় নেই। এমন টানা টেনেছো যে এখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছো না! এই বয়সে…এ জন্যে তোমার লজ্জা হয় না?' অবিশ্যি আত্মপ্রসাদের ছোঁয়া না মিশিয়ে, ও এসব কথা বলতো না। এবং এই-ভাবে কম-বেশি মতৈক্যের মধ্যে বেশ কয়েকটা মাসই কাটিয়ে দিলুম আমরা। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা—সেদিন আমি স্বাভাবিকের চাইতেও বেশি, পুরো একটা বড় বোতল টেনে ফেলেছিলুম—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি যখন জিভটা বের করলুম, তখন হতভম্ব হয়ে দেখি আয়নার লোকটা তখনও গম্ভীর আর শান্ত…তার মুখটা খোলা নয়, জিভটাও বেরিয়ে নেই। বেশ খানিকক্ষণ করুণার দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'গুগলিয়েলমো, তোমার ওপরে আমার বিরক্তি ধরে গেছে।'

'কেন?'

'কারণ যুদ্ধ বা লড়াই চালাবার বদলে, তুমি নিজেকে সর্বনাশের দিকে এগুতে দিচ্ছো। বউকে হারিয়ে তুমি নিজের হাল ছেড়ে দিয়েছো, একটা পাঁড় মাতাল হয়েছো, এমন কি নিজের কাজের সম্পর্কেও ভালোবাসা খুইয়ে ফেলেছো।'

'এমন কথা কে বলেছে, আমি জানতে চাই।'

'আমি বলছি। পাড়া-প্রতিবেশীরা সকলেই জানে যে তুমি মদ খাও। লোকেরা তাদের জুতোর তলিগুলো নতুন করে তৈরি করাবার জন্যে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। তুমি এখন কি হয়েছো জানো? স্রেফ একটা ভূষিমাল।'

কথাটা শুনে আমার অস্বস্তি লাগলো। মাথা চুলকে বললুম, 'তাহলে আমার কি করা উচিত বলে তোমার মনে হয়?'

'তোমার স্ত্রীকে ফের বাড়িতে নিয়ে আসা উচিত। যখন দেখছো যে ওকে ছাড়া তোমার জীবনটা শেষ হতে চলেছে, তখন আবার ওকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করো। তুমি কি ওর স্বামী নও? ওকে সঙ্গে

রাখার অধিকার কি তোমার নেই ? তাহলে যাও, চটপট কাজে লেগে পড়ো।'

'কিন্তু সেজন্যে আমার কি করা উচিত ?'

'কি করা উচিত ? ভালো বললে যা হোক ! তোমার কি করা উচিত, তা তুমি ভালো করেই জানো !'

'না, সত্যি বলছি জানি না।'

সরাসরি আমার দিকে তাকালো লোকটা, 'ওকে বাড়িতে আনার জন্যে ভালো বা মন্দ যেমনই হোক একটা মতলব তোমাকে বের করতে হবে।'

কথাগুলো ও এমন একটা বিশিষ্ট স্বরভঙ্গিতে বললো, যা স্বীকার করতেই হয়, আমাকে ভয় পাইয়ে দিলো। বললুম, 'ভালোভাবে আমি চেষ্টা করে দেখেছি, তাতে কোন কাজ হয়নি। আর খারাপভাবে আমি কোন চেষ্টাই করতে চাই না।...আমি কোন খারাপ কাজ করতে রাজী নই।'

মনে হয়েছিলে, কথাগুলো আমি সঠিকভাবেই বলেছি—এমনভাবে বলেছি, যা নিঃসন্দেহে ওর মেনে নেওয়া উচিৎ কিন্তু ও মাথা নেড়ে রীতিমতো শাসানোর ভঙ্গিমায় বললো, 'বেশ, এ নিয়ে আমরা আবার কথা বলবো।' এবং তারপরেই আলটপকা আয়না থেকে উধাও হয়ে গেলো, আমি একা পড়ে রইলুম।

খুব দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ নিয়ে আমি শুতে গেলুম। কিন্তু আলোটা নেভাতেই হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে আবার সেই কণ্ঠস্বরটা বলতে শুরু করলো, 'এখন তুমি অনেক শান্ত হয়েছো, এখন আর তুমি মাতালও নও। তাই এখন বলছি, বউকে আবার ফিরে পাবার জন্যে তুমি কি করবে। আমাকে বাধা দিও না—আমার যা বলার আছে তা শেষ করা অব্দি চুপ করে শোনো।'

আমি ওকে বলতে বললুম, বললুম যে আমি শুনছি। এবং ও রসিকতা করার মতো বলে চললো যে, পরদিন সকালবেলা আমি

দোকানে গিয়ে আমার বাটালিখানা নেবো…তারপর স্ত্রীর কাছে গিয়ে বাটালিটা ওর নাকের সামনে ধরে, ওকে এই বলে সাবধান করে দেবো, 'হয় তুমি এক্ষুনি বাড়িতে চলো, নয়তো এটা দেখেছো ?…'

অন্ধকারের মধ্যে আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলুম, 'তুমি পাগল ! এ সমস্ত কথা বলাও অর্থহীন। এ কথা ঠিক যে আমি আমার বউকে ফিরে পেতে চাই। কিন্তু তার সঙ্গে ওকে ছুরি দিয়ে শাসানোর মধ্যে অনেক প্রভেদ। শেষ অব্দি অন্তত কয়েদখানায় গিয়ে আমি ঢুকতে চাই নে।'

'না,' সে বললো, 'কয়েদখানায় তুমি অবিশ্যি যেতে চাও না। কিন্তু তাহলেও, এখানে তুমি যে অবস্থায় রয়েছো কয়েদখানায় হয়তো তার চাইতে ভালোভাবেই থাকতে পারবে।'

'কি বলতে চাও তুমি ?'

'বলতে চাইছি যে, কয়েদখানায় তুমি অন্তত একা একা থাকবে না। সত্যি বলতে কি, তোমার হারাবার মতো কিছুই নেই। হয় তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে চলে আসবে—সেটা তোমার পক্ষে খুবই ভালো কথা। আর নয়তো সে আসবে না, তুমি তাকে ছুরিটা একটু ছুঁইয়ে কয়েদখানায় গিয়ে ঢুকবে—তাতে আর যা-ই হোক তুমি অন্য বন্দীদের সঙ্গী হিসেবে পাবে।'

'তুমি একটা উন্মাদ।'

'আমি উন্মাদ নই এবং তুমি তা জানো। গুগলিয়েলমো, তুমি এত বেশি একলা যে কয়েদখানার কথাতেই তোমার মুখে জল আসছে।'

আমি আর সহ্য করতে না পেরে বিছানায় উঠে বসলুম, 'এ ব্যাপারে কোন কথা বলাই অর্থহীন। এবারে চুপ করো—তোমার ওই শয়তান মুখটা বন্ধ করে আমাকে ঘুমোতে দাও।'

'আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি…তুমি যদি এ কাজটা না করো, তবে আমিই করবো।'

'আমি বলেছি, আমাকে ঘুমোতে দাও।'

'কাল সকালেই আমি কাজটা করবো।'

'চোপরাও!'

'তাহলে ওই কথাই রইলো।'

বিছানা থেকে ঝুঁকে আমি মেঝে থেকে এক পাটি জুতো তুলে নিলুম। তারপর ওই অবস্থাতেই অন্ধকারের মধ্যে সেটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিলুম। শয়তানটা নিশ্চয়ই সেটার পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলো। ভাঙচুরের আওয়াজ শুনে বুঝলুম, টানা আলমারির ওপরে রাখা চিনেমাটির কুঁজোটাতে আমি আঘাত করেছি।...তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগেই মনে হলো, নষ্ট করার মতো সময় আর নেই। তিনটে ঘরের কোনটাতেই লোকটার কোন চিহ্ন নেই। আমি যতক্ষণ বাড়িতে বসে কফি খেয়ে নিজেকে গরম করে তুলবো, ততক্ষণে সে খুব সম্ভব একছুটে আমার দোকানে গিয়ে (দুর্ভাগ্যক্রমে দোকানের চাবিটা তার কাছে, আমি নিজেই তাকে চাবিটা দিয়েছিলুম) বাটালিটা তুলে নেবে, আর তারপরেই আগুনে ঘি পড়বে। ঘটনাটা যে কি ঘটতে পারে তা চিন্তা করে, সত্যি বলছি, আমার মাংসপেশীগুলো কুঁকড়ে উঠলো। তাই কফির জন্যে আর অপেক্ষা না করে, হাত-মুখ না ধুয়ে বা দাড়ি না কামিয়ে, আমি কোন রকমে কোটটা গায়ে গলিয়ে আলুথালু চুলে ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলুম। তখন খুব সকাল, চারদিকে ঘন কুয়াশা—রাস্তাঘাট কুয়াশায় ভর্তি। মাত্র সামান্য কয়েকজন লোক কাজে যোগ দিতে চলেছে, নিঃশ্বাসের বাতাস হালকা মেঘের মতো হয়ে উড়ছে তাদের মুখের সামনে। আমার দোকানটা ভিকোলো-দেল-ফিউমে, ভিয়া রিপেত্তা ধরে পুরো রাস্তাটা আমি প্রায় ছুটতে ছুটতেই চললুম। মোড়টা ঘুরতেই খানিকটা দূর থেকে দেখি, দোকান থেকে ভীষণ চুপিসাড়ে বেরিয়ে আসছে সে—তারপর টাইবারের দিকে ছুটে চলে গেলো। নিজেকে নিজেই বললুম, 'লোকটা যে এক কথার মানুষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজটা ও করবে বলেছিলো, এখন তা করছে এবং

ওকে আমার থামাতে হবে।' ··

আমিও তাড়াতাড়ি দোকানে গিয়ে ঢুকলুম। ওর রাগটা যদি আমার দিকে ঘুরে আসে, তাই আমিও বাক্স থেকে একটা বাটালি তুলে নিলুম। তারপর কাছেই, যেখানে টেলিফোন ব্যবহার করার একটা খুপরি আছে, সেই পানশালাটায় গিয়ে ঢুকলুম। পানশালার লোকটা আমাকে চিনতো। আমাকে উদ্দেশ করে সে বললো, 'কফি হবে না. কফি বানাবার যন্ত্রটা এখনও চালু হয়নি।'

'নিকুচি করেছে কফির,' কাঁধ ঝাঁকালুম আমি। সত্যি কথা বলতে কি আমি এতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম যে, থানার টেলিফোন নম্বরটা খুঁজে বের করার জন্যে টেলিফোন-বইটার পাতা ওলটাতে গিয়ে আমার হাত কাঁপছিলো অবশেষে সেটা পেলুম, নম্বরটা ঘোরালুম··· একটা গলা জানতে চাইলো, আমি কি চাইছি। সব কিছু বুঝিয়ে আমি বললুম, 'আপনারা এক্ষুনি ওখানে চলে যান। লোকটা সশস্ত্র, তার কাছে একটা বাটালি রয়েছে।···এটা একেবারে জীবন-মরণের প্রশ্ন'

'লোকটার নাম কি?' অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বরটা জানতে চাইলো।

এক মুহূর্তে একটু ভেবে জবাব দিলুম, 'পালোম্বিনি···গুগলিয়েলমো পালোম্বিনি' এ নামটা আমার নিজেরও বটে···ঘটনাচক্রের এ এক আশ্চর্য মিল।

যাই হোক, টেলিফোনে আমাকে এই বলে আশ্বস্ত করা হলো যে যত শীঘ্র সম্ভব ওরা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে। আমি তখন পিয়াজা-দেল-পপোলোতে ট্যাক্সির সারির দিকে দৌড়ে গেলুম। কারণ এটা খুবই সম্ভব যে পুলিস হয়তো অনেক দেরি করে ওখানে গিয়ে পৌছবে। কাজেই আমার পক্ষে সেখানে চলে যাওয়াটাই সব চাইতে ভালো মতলব উঁচু গলায় ঠিকানাটা বাতলে দিয়ে আমি ট্যাক্সিতে লাফিয়ে উঠলুম। সেই সঙ্গে বললুম, 'দোহাই ঈশ্বরের, জলদি চলুন। এটা একটা বাঁচা-মরার ব্যাপার।' ট্যাক্সির চালক, সাদা চুলওয়ালা এক বৃদ্ধ, জানতে চাইলো ব্যাপারটা কি। আমি তাকে বললুম, 'পলোম্বিনি

নামে একটা লোক…একটা জুতো তৈরি করার কারিগর…একটা ছুরি নিয়ে এখন ট্যাক্সি হাঁকিয়ে তার বউয়ের কাছে চলেছে। বউ তাকে ছেড়ে চলে গেছে…সে ওকে খুন করতে চায়। লোকটাকে থামাতে হবে।'

'পুলিসকে জানিয়েছেন?'

'অবশ্যই!'

'কিন্তু আপনি এসব কথা জানলেন কি করে?'

'হয়ে হয়েছে…এক দিক দিয়ে পলোম্বিনি আর আমি, দুই বন্ধু। সে নিজেই আমাকে বলেছিলো।'

ট্যাক্সিচালক এক মুহূর্ত একটু চিন্তা করে বললো, 'এমন অনেক মানুষই আছে, যারা নিজেদের কঠিন মানুষ বলে ভান দেখায়। কিন্তু আসল সময়টা এলেই, তারা নরম হয়ে পড়ে

'আপনি ভুল করছেন, এ লোকটা সত্যিই সাংঘাতিক—আমি তাকে চিনি।'

কথা বলতে বলতে আমরা দ্রুতগতিতে নির্জন রাস্তাগুলো ধরে ভিয়া জুলিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম—আমার স্ত্রী সেখানেই থাকে। তারপর ট্যাক্সিটা যথাস্থানে এসে থামতেই, আমি গাড়ি থেকে নেমে এসে ভাড়া মিটিয়ে দিলুম। ট্যাক্সিচালক গাড়ি নিয়ে চলে গেলো। এধার ওধারে তাকিয়ে দেখলুম, যতদূর চোখ যায় রাস্তাটা একেবারে নির্জন। কিন্তু তখুনি দেখলুম, সেই খুনে গুণ্ডাটা আমার স্ত্রীর বাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। মনে পড়লো, আমার বৃদ্ধা শাশুড়ীঠাকরুন ধর্মের দিক দিয়ে ভীষণ গোঁড়া—প্রতিদিন এই সময়টিতেই উনি গির্জায় গিয়ে থাকেন। কাজেই ওদিকে আমার বউটি এখন একা ফ্ল্যাটে বিছানায় শুয়ে থাকবে—কারণ স্বভাবে ও আলসে, বেশি বেলা অব্দি ঘুমোতে ভালোবাসে। 'লোকটা যে ঠিক সময়টিই বেছে নিয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না,' ভাবলুম আমি। 'সমস্ত কথাই সে চিন্তা করে। …কিন্তু এখন আমাকে তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে, নয়তো এখানে রক্তপাত অবধারিত।'

অতএব আমি হুড়মুড় করে সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সিঁড়ির চারটে করে ধাপ একসঙ্গে পেরিয়ে, ঠিক সময়মতোই ওপরে উঠে এসে দেখি—লোকটা বন্ধ দরজায় জোর ধাক্কা মেরে চিৎকার করে বলছে, 'গ্যাস-মিটারের লোক, দয়া করে দরজা খুলুন।' দরজা খোলাবার যে কোন উপায়ের মতোই এটা সমান কার্যকরী।···আমি পেছনে সরে এলুম এবং একটু পরেই শুনতে পেলুম, ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে চটির শব্দ ভেসে আসছে। তারপরেই দরজাটা খুলে গেলো···আমি আমার স্ত্রীর ঘুম-ঘুম সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম—'মিটারটা রান্নাঘরে রয়েছে।'··· বদমাশ লোকটা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেই ভেতরে ঢুকে পড়লো, আমি তাকে অনুসরণ করলুম।

বারান্দাটা অন্ধকার। আমার স্ত্রীর ঘুমিয়ে সতেজ হয়ে ওঠা শরীরের উষ্ণ যৌবন-গন্ধ চিনতে পারলুম আমি—মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, আমি বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবো। পা টিপে টিপে সোজা বারান্দার অন্য প্রান্তে চলে এলুম, জানতুম সেখানেই ওর ঘর। ফের বিছানায় গিয়ে শোবার আগে দরজাটা ও সামান্য একটু খুলে রেখেছিলো। সেটা ধাক্কা মেরে খুলে আমি ভেতরে গিয়ে ঢুকলুম। ঘরটাও অন্ধকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুজনের শোবার মতো বিশাল খাট, বালিশের ওপরে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে থাকা ওর কালো চুলের রাশি আর পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়া ওর শরীরের নগ্ন শুভ্র কাঁধ দুটি আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলুম। সত্যি কথা বলতে কি, ওর কাঁধ দুটো দেখে আমার সেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেলো—যখন সকালবেলা চুপিচুপি কাজে বেরুবার সময় নিজের বাড়িতে আমি ওর ওই কাঁধ দুটোকে দেখতুম। সেই সব দিনগুলোকে ফিরে পাবার করুণ বাসনায় আমি এতই কাতর হয়ে উঠলুম যে তক্ষুনি বাটালিটা ফেলে দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে, চাদরের ওপরে মেলে রাখা ওর একটা হাত ধরে বললুম, 'লক্ষ্মীটি, সোনা আমার···তুমি আমার সঙ্গে ফিরে চলো। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না!'

আমি নিশ্চিত জানি, এমন একটা পরিস্থিতিতে আমার স্ত্রী আমার কথায় অবশ্যই রাজী হয়ে যেতো—যদি না সেই হতচ্ছাড়া শয়তানটা আচমকা ছুরি হাতে বিছানার উলটো দিকে এসে হাজির হয়ে, ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে ভয় দেখানোর মতো কণ্ঠস্বরে বলতো, 'তুমি এক্ষুনি আমার সঙ্গে ফিরে যাবে—নয়তো এটা দেখেছো ?'

তারপরে কি ঘটলো—কিভাবে আমি লোকটার হাত থেকে অস্ত্রটা ফেলে দেবার জন্যে প্রাণপণ লড়াই করলুম, কিভাবে আমার স্ত্রী ডাইনে-বাঁয়ে সমস্ত জিনিসপত্র উলটে ফেলে অর্ধনগ্ন অবস্থায় আর্ত চিৎকার করতে করতে ঘরের মধ্যে ছোটাছুটি করতে লাগলো, কিভাবে হঠাৎ একগাদা পুলিস হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো—আমি তা কিছুই বর্ণনা করতে চাই নে। আমি সাবধানী সুরে চিৎকার করে বললুম, 'লোকটা সাংঘাতিক, ওকে গ্রেপ্তার করুন! ওর ছুরি থেকে সাবধান !' কিন্তু পুলিসের লোকগুলো, সম্ভবত আমার হাতেও একটা ছুরি থাকার দরুন, তেমন কোন বাছবিচার করলো না। আমাকে পাকড়াও করে ওরা খাট থেকে টানতে টানতে বের করে নিয়ে এলো, নামিয়ে আনলো সিঁড়ি দিয়ে। যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিলো, আমি তার সবটুকু ঢেলে বারবার চিৎকার করে বললুম, 'আপনারা ভুল করছেন··আপনারা এই লোকটাকে গ্রেপ্তার করুন, আমাকে নয়।' কিন্তু আমাকে ওরা জোর করে পুলিসের গাড়িতে নিয়ে তুললো। চোখ তুলে যখন তাকালুম তখন দেখি, আমার ঠিক মুখোমুখি—দুটো পুলিসের মাঝখানে হাতকড়া পরা অবস্থায় বসে রয়েছে সে···মুখে বিদ্রূপের হাসি··· যেন বলছে, 'দেখলে তো, কি করলুম ?' ওকে দেখিয়ে আমি চিৎকার করে উঠলুম, 'ওই শয়তানটা আমার সর্বনাশ করেছে···ওই যে ওখানে—' আর তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললুম।

এখন আমি গদি-মোড়া একটা নির্জন ঘরে রয়েছি। ওরা বলে, ওরা আমার ওপরে নজর রেখেছে—কারণ ওদের আশঙ্কা, দুঃখ-বেদনায় আমার মনে চোট লেগেছে। আমি প্রতিবাদ করি না, কিন্তু নিজেকে

আমার বড় একা বলে মনে হয়। 'তাকে' ওরা রেজিনা কোয়েলি কয়েদখানায় নিয়ে গেছে। কাজেই এখন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি—সে রয়েছে কয়েদখানায়, আর আমি রয়েছি আতুরাশ্রমে। অর্থাৎ আমার একমাত্র সঙ্গীটিকেও আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।·· এখন আমার আর কেউই নেই···চিরদিন আমাকে মুখ বন্ধ করে নিশ্চুপ হয়েই থাকতে হবে।



আমার চাইতে ওর ক্ষমতা ছিলো বেশি। যতবার আমার সঙ্গে কোন মেয়ের পরিচয় হয়েছে, আমি প্রতিবারই রিগামন্তির সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছি আর রিগামন্তি যথারীতি আমার কাছ থেকে মেয়েটিকে ফুসলে নিয়েছে। সম্ভবত আমি ওকে দেখাতে চাইতাম যে মেয়েদের ক্ষেত্রে ও যতখানি সফল, আমার সফলতাও ঠিক ততখানি। অথবা ওর সম্পর্কে আমি হয়তো খারাপ কিছু ভাবতে পারতাম না এবং ওর পূবাপর বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও আমি ওকে বন্ধু হিসেবে দেখার অভ্যেসের কাছে হার স্বীকার করতাম। জিনিসটা ও যদি আর একটু মার্জিত, আর একটু ভদ্রসঙ্গত উপায়ে করতো—তাহলে আমি হয়তো সেটাকে আরও সহজভাবে মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু ওর আচরণ ছিলো প্রচণ্ড অপমানকর, যেন ব্যাপারটাতে আমার আদৌ কিছু এসে যায় না। ও এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলো যে আমার উপস্থিতিতেই ও মেয়েটির সঙ্গে প্রেমালাপ করতো, আমার নাকের ডগাতেই দেখা-সাক্ষাতের দিনক্ষণ স্থির করতো।... এসব ক্ষেত্রে যা হয় তা সকলেই ভালোভাবে জানেন, অধিকতর ভদ্র আচরণবিশিষ্ট মানুষটিই প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ায়। নিজের সুবিধেজনক কাজগুলো গুছিয়ে নেবার ক্ষেত্রে রিগামন্তির কাছে ন্যায় নীতি বলতে কিছু ছিলো না। অন্য দিকে আমিই ঝগড়া-বিবাদের আশঙ্কায় নিঃশব্দে সরে দাঁড়াতাম এবং এ-ভাবেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তরুণীটির সম্পর্কে শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ করতাম। দু-একবার আমি এর প্রতিবাদও জানিয়েছি, কিন্তু সে নেহাতই মিনমিনেভাবে—কারণ নিজের অনুভূতিগুলোকে আমি ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারি না। ভেতরে ভেতরে আমি যখন রাগে টগবগ করে ফুটছি, তখন বাইরে কিন্তু ঠাণ্ডা হয়েই থাকি—তাই কেউ ভাবতেও পারে

না যে আমি রেগে গেছি। রিগামন্তি আমাকে কি জবাব দিয়েছিলো, জানেন? বলেছিলো, 'দোষ তুমি নিজেকে দাও, আমাকে নয়। কোন মেয়ে যদি আমাকে বেশি পছন্দ করে তার মানে হচ্ছে, জিনিসটা কি করে বাগে আনতে হয় তা তোমার চাইতে আমি বেশি করে ভালো জানি।' এ কথাটা যতখানি সত্যি, রিগামন্তি আমার চাইতে দৈহিক দিক দিয়েও বলবান—সে কথাটাও তেমনি সত্যি।

ছোট্ট করে বলতে গেলে, রিগামন্তি আমার সঙ্গে চার-পাঁচবার এ ধরনের চালাকি করার পর আমি সমস্ত প্রাণমন দিয়ে ওকে এমন ঘৃণা করতে শুরু করলাম যে, যে পানশালায় আমরা দুজনে কাজ করতাম সেখানে আমি ওর দিকে পাশ ফিরে অথবা পেছন ফিরে দাঁড়াতাম—যাতে ওকে দেখতে না হয়। এমন কি আমি যখন ওর সঙ্গে কাউন্টারের পেছনে রয়েছি এবং একই খদ্দেরকে দুজনে মিলে পরিবেশন করছি, তখনও তাই। ও আমার কি ক্ষতি করেছে, ইতিমধ্যে আমি তা চিন্তা করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। শুধু ওর সম্পর্কে ভাবতাম, ভাবতাম ও কি ধরনের মানুষ এবং অনুভব করতাম, আমি ওকে আর সহ্য করতে পারছি না। ওর গাঁট্টাগোঁট্টা বোকাটে মুখ, তাতে নিচু কপাল, আর কুতকুতে চোখ, বিরাট বাঁকা নাক, পুরু ঠোঁট আর সামান্য গোঁফ—সব কিছুকেই আমি ঘৃণা করতাম। ঘৃণা করতাম শিরস্ত্রাণের মতো ওর মাথায় লেপটে থাকা কালো চকচকে চুলগুলোকে, যার দুটো দীর্ঘ গুচ্ছ কপালের ধার থেকে শুরু করে ঘাড়ের পেছন অব্দি চলে গেছে। আর ঘৃণা করতাম ওর রোমশ হাত দুটোকে, কফি বানানোর যন্ত্রে কাজ করার সময় যে দুটোকে ও সদম্ভে জাহির করতো। ওর নাকটা আমাকে আকর্ষণ করতো সব চাইতে বেশি। নাকটা মোটা, বাঁকা, ফুটোর কাছ দুটোতে চওড়া, লালচে মুখের মাঝখানটাতে একেবারে ফ্যাকাশে, যাতে মনে হয় নাকের হাড় যেন চামড়াটাকে জোর করে টেনে রেখেছে। প্রায়ই আমি ঠিক ওর নাকটাতে একটা ঘুষি বসিয়ে দেবার কথা, আমার মুঠোর নিচে নাকের হাড়টা ফেটে যাওয়ার শব্দ শোনার কথা চিন্তা

করতাম। কিন্তু সে শুধু স্বপ্নই। কারণ আমি ছোট্টখাট্টো রোগা পাতলা মানুষ, রিগামন্তি এক আঙুলেই আমাকে শুইয়ে দিতে পারে।

ওকে খুন করার কথাটা আমি কবে থেকে প্রথম চিন্তা করতে শুরু করেছিলাম, জানি না। হয়তো যেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজনে মিলে 'সার্থক অপরাধ' নামে একটা অ্যামেরিকান ছবি দেখতে গিয়েছিলাম, সেদিন থেকেই। সঠিকভাবে বলতে গেলে, আমি প্রথমটাতে ওকে সত্যি সত্যি খুন করতে চাইনি···শুধু কল্পনা করেছি, খুন করতে হলে আমার হাবভাব কেমন হওয়া উচিত। রাত্রে ঘুমোবার আগে, সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠার আগে আর হ্যাঁ—দিনের বেলাতেও পানশালায় যখন কিছুই করার থাকতো না, রিগামন্তি কাউন্টারের পেছনে টুলের ওপরে বসে তেল-চকচকে মাথাটা নুইয়ে খবরের কাগজ পড়তো—তখন কথাটা চিন্তা করে আমি খুব আনন্দ পেতাম। ভাবতাম, 'এবারে বরফ ভাঙার নোড়াটা দিয়ে আমি ওর মাথায় বাড়ি বসিয়ে দেবো।' কিন্তু আসলে ভাবনাটাই সার। এ যেন কাউকে ভালোবেসে সারাদিন ধরে তাকে চিন্তা করার মতো—প্রেমিকাকে নিয়ে যা করতে ইচ্ছে হয়, বলতে ইচ্ছে হয়, সেসব কথা কল্পনা করার মতো। শুধু আমার ক্ষেত্রে প্রেমিকার স্থান নিলো রিগামন্তি আর অন্যেরা যেখানে চুম্বন সোহাগের কথা ভেবে আনন্দ পায়, আমি সেখানে সে আনন্দ পেতে লাগলাম ওর মৃত্যুর সম্পর্কে স্বপ্ন দেখে।

আরও মজার কথা হচ্ছে, এ ব্যাপারটাতে আনন্দ পেতাম বলে আমি প্রতিটি খুঁটিনাটিসহ এর একটা কাল্পনিক পরিকল্পনাও ছকে ফেলেছিলাম। কিন্তু ছকে ফেলার পরে, সেটকে বাস্তব রূপ দেবার একটা প্রলোভন আমার মধ্যে জেগে উঠলো। এবং এই প্রলোভনটা এতই জোরালো যে, আমি নিজেকে বেঁধে রাখার চেষ্টা থামিয়ে কাজে লাগার জন্যে মনস্থির করে ফেললাম। কিন্তু আসলে আমি হয়তো আদৌ মনস্থির করিনি—যখন আমার ধারণা ছিলো যে আমি স্বপ্ন-রাজ্যেই বিচরণ করছি তখন হঠাৎ দেখলাম, কাজটার মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়েছি। অর্থাৎ বলতে গেলে, ঠিক একটা প্রেমে পড়া মানুষের

মতো কি করছি সে বিষয়ে প্রায় কোন খেয়াল না করেই, আমি সব কিছু একেবারে স্বাভাবিক, আয়াসহীন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও করার মতো করে যাচ্ছিলাম।

অতএব দু পেয়ালা কফির ফাঁকে ফাঁকে আমি ওকে বলতে শুরু করলাম যে, একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। এতদিন যে সব সাধারণ মেয়েকে আমার পছন্দ হয়েছে এবং আমার কাছ থেকে যাদের ও কেড়ে নিয়েছে, এ মেয়ে মোটেই তেমন নয়। এ মেয়েটি রিগামন্তিকে ভালো করেই দেখেছে এবং তাকে ছাড়া ও আর কাউকেই চায় না। এই ঐকান্তিক প্রেমের বিষয়ে প্রতিবারই নতুন কিছু যোগ করে করে আমি একটা সপ্তাহ, দিনের পর দিন, কথাটা ওর কাছে পুনরাবৃত্তি করে চললাম। এমন ভাব দেখালাম যেন ওকে আমি হিংসে করছি। প্রথমটাতে ও নির্বিকার ভান দেখানোর চেষ্টা করলো। বললো, 'সে যদি আমাকে ভালোবাসে, তাহলে তো এখানেই আসতে পারে। না হয় তাকে এক পেয়ালা কফি খাইয়ে দেবো।'

কিন্তু শীঘ্রিই ওর স্নায়ুগুলো ঢিলে হতে শুরু করলো। মাঝে মাঝেই রসিকতার ভান করে জিগেস করতে লাগলো, 'বলো দেখি, ওই মেয়েটির কথা।···সে কি এখনও আমাকে ভালোবাসে ?'

'অবশ্যই বাসে,' আমি জবাব দিতাম।

'কি বলে ও ?'

'বলে তোমাকে ওর ভীষণ আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।'

'কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে ? আমার মধ্যে ও আকর্ষণের কি দেখলো ?'

'সব কিছুই—তোমার নাক, তোমার চুল, তোমার চোখ, তোমার মুখ, কফির যন্ত্রটা নিয়ে তোমার কাজ করার ধরন—সব।'···আসলে ওর ওইসব অঙ্গগুলোকেই আমি ঘৃণা করতাম, শুধু ওগুলোর জন্যেই আমি ওকে খুন করে ফেলতে পারতাম···কিন্তু এমন ভান করতাম যেন ও-গুলোই আমার কল্পিত মেয়েটির মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমার জবাব শুনে রিগামন্তি হাসতো, গর্বে ফুলে উঠতো। স্পষ্টই বোঝা যেতো,

ওর বুদ্ধিহীন মস্তিষ্কে ওই মেয়েটির চিন্তা ছাড়া, দ্বিতীয় কোন চিন্তা নেই। মেয়েটির সঙ্গে ওর দেখা করার ইচ্ছে, কিন্তু ওর অহঙ্কার আমার কাছে সে কথা বলতে বাধা দিতো।

অবশেষে একদিন রিগামন্তি রেগেমেগে বললো, 'ছ্যাখো বাপু, হয় তুমি আমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দাও, আর নয়তো ওই নিয়ে বকবক করা বন্ধ করো।' আমি ঠিক এই কথাগুলোর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। তাই অবিলম্বে পরদিন সন্ধ্যাবেলায় সাক্ষাৎকারের দিন ঠিক করে ফেললাম।

আমার মতলবটা ছিলো খুবই সহজ। দশটার সময় আমাদের দোকান বন্ধ হয়, কিন্তু দোকানের মালিক চিরদিনই সাড়ে দশটা অব্দি দোকানে বসে হিসেবনিকেশ করেন। কাছেই ভিতেরবো রেলপথের পাঁচিলটার পাশে একটা জায়গায় আমি ওকে নিয়ে যাবো। বলবো, মেয়েটি ওখানেই অপেক্ষা করবে। সওয়া দশটার সময় ওখান দিয়ে একটা ট্রেন যায়। আমি তখন সেই আওয়াজটার সুযোগ নিয়ে, কিছু দিন আগে পিয়াজা ভিত্তেরিয়ো থেকে কিনে আনা একটা 'বেরেত্তা' দিয়ে রিগামন্তিকে গুলি করবো। তারপর দশটা বেজে কুড়ি মিনিটের সময় ভুল করে ফেলে আসা একটা পুলিন্দা নিয়ে আসার ছল করে আবার দোকানে ফিরে যাবো, কাজেই দোকানের মালিক তখন আমাকে দেখতে পাবেন। যে বাড়ির দরোয়ান রাত্রের জন্যে আমাকে একটা চারপেয়ে ভাড়া দেয়, তার ঘরে বড়জোর রাত সাড়ে দশটার মধ্যেই আমি গিয়ে শুয়ে পড়বো। এই পরিকল্পনার কিছুটা অংশ আমি সিনেমা থেকে নকল করেছিলাম, বিশেষ করে অপরাধের সঙ্গে ট্রেন যাওয়ার যোগাযোগটা। খুব সম্ভব কেউই আমাকে অপরাধী বলে ধরতে পারবে না। কিন্তু তবু ঘৃণা প্রকাশের পথ করতে পারার তৃপ্তি আমার থাকবে। এবং আমি অনুভব করলাম, এই তৃপ্তির জন্যে কঠিন পরিশ্রম করতেও আমি প্রস্তুত।

পরের দিনটা শনিবার বলে আমরা খুব ব্যস্ত রইলাম এবং এটা

ভালোই হলো। কারণ এর অর্থ, রিগামন্তি মেয়েটির সম্পর্কে আমার সঙ্গে কোন কথা বলতে পারলো না। আর আমিও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে সময় পেলাম না। দশটার সময় যথারীতি আমরা লিনেনের জ্যাকেট খুলে, মালিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, অধেক নামানো দরজার তলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পানশালাটা যে এভিন্যুর ওপরে, সেটা অ্যাকুয়া অ্যাসিটোসার দিকে চলে গেছে। ভিতেরবো রেলপথ এখান থেকে মাত্র এক পা দূরে। কাছের টিলাটার ওপরে গার্ডেন অফ রিমেম-ব্রান্স থেকে শেষ যুগলটিও ততক্ষণে চলে গেছে। অন্ধকার রাজপথে গাছগুলোর নিচেও কেউ নেই। এখন এপ্রিল মাস, বাতাস ইতিমধ্যেই স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। যদিও চাঁদটা এখন দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আকাশ ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছে।

এভিন্যু ধরে আমরা হেঁটে চললাম। রিগামন্তি যথারীতি তার স্বভাব-মতো মহা উৎসাহে আমার পিঠ চাপড়ে দিতে লাগলো। আর আমি শক্ত হয়ে, বুকের ওপরে হাত দুটো রেখে, উইণ্ড জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে রাখা পিস্তলটা চেপে রইলাম। মোড়ের কাছে এসে এভিন্যু ছেড়ে আমরা রেলপথের পাঁচিলের ধার দিয়ে যাওয়া ঘাসের পথে গিয়ে উঠলাম। পাঁচিলটার জন্যে অন্য জায়গার চাইতে এ জায়গাটাতে অন্ধকার বেশি এবং এটাও আমি আমার হিসেবের মধ্যে ধরে রেখেছিলাম। রিগামন্তি আগে আগে হাঁটছিলো, আমি ওর পেছনে। একটা আলোকস্তম্ভ থেকে অদূরে নির্দিষ্ট জায়গাটাতে পৌঁছে আমি বললাম, 'মেয়েটা ওর জন্যে আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে বলেছে···দেখবে'খন, এক্ষুনি এসে পড়বে।' রিগামন্তি সেখানে দাঁড়িয়েই একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'পানশালার পরিচারক হিসেবে তুমি বেশ ভালো···কিন্তু মেয়েমানুষের দালাল হিসেবে তুমি একেবারে অতুলনীয়।' আগের মতো সেই একই ধরনের অপমানকর কথাবার্তা ওর।

জায়গাটা আশ্বস্ত হবার মতোই নির্জন। পেছন দিক থেকে উঠে আসা চাঁদের আলোয় আমাদের পায়ের নিচে বিছিয়ে থাকা সমস্ত

সমতল অঞ্চলটা আলোকিত হয়ে রয়েছে—শুধু সাদা কুয়াশার পাতলা একটা আড়াল, আর এখানে-সেখানে কিছু ঝোপঝাড় আর ছোটখাটো ঢিবিগুলোর আবছা মূর্তি। মাঝখান দিয়ে ঘুরে ঘুরে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া টাইবার নদীটাকে রূপোর মতো দেখাচ্ছিলো। স্যাঁতসেঁতে কুয়াশায় আমার ভেতরটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে বলে মনে হলো। রিগামন্তির চাইতে বরং নিজের সুবিধের জন্যেই বললাম, 'মেয়েটা অবিশ্যি ঘড়ি ধরে একেবারে ঠিক ঠিক সময়মতো আসতে পারবে না। ও চাকরি করে, মনিবটির বেরিয়ে যাওয়া অব্দি ওকে অপেক্ষা করতে হবে।'

রিগামন্তি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, 'না না, ওই তো সে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, একটি মহিলার কালো ছায়া রাস্তা ধরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে :

পরে শুনেছিলাম, খদ্দের ধরার জন্যে ওই ধরনের মেয়েমানুষরা ওই জায়গাটাতে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তখন আমি তা জানতাম না। তাই সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ভেবে বসলাম যে, মেয়েটা আমার কল্পনা করে নেওয়া নয়—আসলে সত্যি সত্যি ওর অস্তিত্ব আছে। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ আস্থা নিয়ে রিগামন্তি মেয়েটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, আমিও স্বয়ংক্রিয়-ভাবে ওকে অনুসরণ করলাম। মেয়েটি যখন মাত্র কয়েক পা দূরে তখন ও অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে এসে পৌঁছতেই আমি ওকে দেখতে পেলাম। আমাকে প্রায় আঁতকে দিয়েছিলো মেয়েমানুষটা। ওর বয়েস অন্ততপক্ষে নিশ্চয়ই ষাট, অদ্ভুত পাগলাটে চোখ দুটোর বড় বড় কালো রঙের বলয়, মুখে পাউডারের গাঢ় প্রলেপ, ঠোঁট দুটো টকটকে লাল চুলগুলো বাতাসে উড়ছে, আর গলায় কালো রঙের একটা ফিতে বাঁধা! এ ধরনের মেয়েরা সব চাইতে অন্ধকার জায়গাগুলোই পছন্দ করে, যাতে ওদের ভালোমতো দেখা না যায়। বোঝা মুশকিল, এই সমস্ত বুড়ো-হাবড়া মেয়েমানুষগুলো কি করে এ বয়সেও খদ্দের ধরার ফন্দি আঁটতে পারে। ওদিকে রিগামন্তি ওকে ভালো করে দেখার আগেই যথারীতি

নিজস্ব নির্লজ্জ প্রথায় জিগেস করে বসেছে, 'সিনোরিনা, আপনি কি আমাদেরই আশা করছিলেন ?'

মেয়েমানুষটিও সমান নির্লজ্জভাবে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, তা বটেই তো !'

তারপর পরিষ্কারভাবে ওকে দেখেই রিগামন্তি নিজের ভুলটা বুঝতে পারলো। এক পা পেছিয়ে এসে আমতা আমতা করে বললো, 'ইয়ে হয়েছে···আমি দুঃখিত···মানে, আজ সন্ধ্যায় আমি ঠিক···তবে এই যে আমার বন্ধু রয়েছে—'

পাশের দিকে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে রিগামন্তি দেয়ালের ধার ঘেঁষে উধাও হয়ে গেলো। বুঝতে পারলাম, ও ভেবেছে ওই সমস্ত সুন্দরী মেয়েদের পরে এ ধরনের একটা রাক্কুসীর কাছে ওকে গছিয়ে দিয়ে আমি নিজের প্রতিহিংসা মেটাতে চেয়েছি। আর এও বুঝলাম যে আমার সার্থক অপরাধটা স্রেফ উবে যাচ্ছে। মেয়েমানুষটার দিকে তাকিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কার্নিভালের মুখোশের মতো ভেংচানো গোছের হাসি হেসে মেয়েমানুষটা বললো, 'হ্যাঁগো সোনার চাঁদ, আমাকে একটা সিগারেট দেবে ?'

মেয়েমানুষটার জন্যে, নিজের জন্যে, এমন কি···এমন কি রিগামন্তির জন্যেও আমার দুঃখ হলো। কত ঘৃণাই না আমার মনে জমে উঠেছিলো, কিন্তু এখন সে সবই কেটে গেছে। দু চোখ ভরে জল এলো আমার। ভাবলাম, মহিলাকে ধন্যবাদ—ও আমাকে খুনী হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। বললাম, 'আমার কাছে সিগারেট নেই। কিন্তু এই যে ···আপনি এটা নিন—এটা বিক্রি করলে আপনি সব সময়েই হাজার খানেক লির্‌্যা পেয়ে যাবেন।' তারপর বেরেত্তাটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে আমিও পাঁচিলের ঢালের দিকে একটা লাফ মেরে এভিন্যুর দিকে ছুট লাগালাম। সেই মুহূর্তে রাতের অন্ধকারে লাল ফুলকি ছড়িয়ে বগির পরে বগি আলোকিত জানলা নিয়ে, ভিতেরবোর ট্রেনটা চলে গেলো। থমকে দাঁড়িয়ে আমি ট্রেনটার দূরের দিকে চলে যাওয়া লক্ষ্য করলাম,

মিলিয়ে না যাওয়া অব্দি কান পেতে সেটার আওয়াজ শুনলাম, তারপর শেষ পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে গেলাম।

পরদিন পানশালায় রিগামন্তি বললো, 'আমি কিন্তু জানতাম যে কোথাও একটা কিছু ফন্দি রয়েছে! তা সে যাকগে, রসিকতাটা ভালোই হয়েছিলো।' ওর দিকে তাকিয়ে আমি অনুভব করলাম, ওকে আমি আর ঘৃণা করি না, যদিও ও ঠিক সেই আগের মতোই রয়েছে—সেই কপাল, সেই চোখ নাক চুল, কফি বানানোর যন্ত্রে কাজ করার সময় সেই রোমশ হাত দুটোর সেই একই ধরনের সদম্ভ প্রদর্শনী। আচমকা নিজেকে আমার অনেক হালকা বলে মনে হলো, যেন পানশালার দরজায় পর্দা উড়িয়ে নেওয়া এপ্রিলের বাতাস বয়ে গেলো আমার ভেতর দিয়ে। বাইরের টেবিলে রোদ্দুরে বসে থাকা দুজন খদ্দেরকে পরিবেশন করার জন্যে রিগামন্তি আমার হাতে দু পেয়ালা কফি তুলে দিলো। পেয়ালা দুটো নিতে গিয়ে আমি নিচু গলায় বললাম, 'আজ সন্ধ্যায় আসবে? আমি অ্যামেলিয়াকে আসতে বলেছি···'

কফির ছিবড়েগুলো কাউন্টারের তলায় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রিগামন্তি নতুন করে কফি মেপে নিলো, যন্ত্রটা থেকে খানিকটা বাষ্প ছাড়লো, তারপর এতটুকুও তিক্ততা না দেখিয়ে সহজভাবে বললো, 'দুঃখিত, আজ সন্ধ্যায় তো আমি পারবো না···'

পেয়ালা দুটো নিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম এবং অনুভব করলাম, রিগামন্তি যে সন্ধ্যাবেলা আসছে না, অন্য সমস্ত মেয়েদের মতো ও যে অ্যামেলিয়াকেও আমার কাছ থেকে চুরি করে নিতে যাচ্ছে না—সে জন্যে আমি হতাশ হয়ে উঠেছি।

সকলেই জানে, প্রেম হঠকারী। আমাদের দুজনের মধ্যে কে প্রথমে ওই কুখ্যাত রাস্তাটাতে দেখা করার কথা তুলেছিলো? গুইলিয়ানো। আমি পিয়াজার কথা বলেছিলাম, আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে জায়গাটা দূরে নয়। কিন্তু গুইলিয়ানো তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলো, ওখানে গেলে আমার বাবা বা মা আমাদের দেখে ফেলতে পারে। তাই বদনাম থাকলেও, এভিন্যুতেই দেখা করা ভালো। সত্যি কথা বলতে কি গুইলিয়ানো বলেছিলো, ওখানে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো মেয়েমানুষদের ভেতর থেকে কেউ আমাকে নজর করে দেখবে না—ওদের একজন বলেই ধরে নেবে। এমন একটা বিদঘুটে মন্তব্যে তেমন খেয়াল না করে আমি তক্ষুনি ওর কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ আমার কাছে, গুইলিয়ানো কোন ভুল করতে পারে না। তাই এখন এই এভিন্যুতেই আমি অপেক্ষা করছি ওর জন্যে।

সত্যি বলতে কি, এ জন্যে আমার অনুতাপ হচ্ছিলো। আমার নস্যি রঙের ছোট্টখাট্টো সুন্দর গাড়িটা থেকে মাত্র দু পা দূরে, ভোঁদড়ের লোমে তৈরি দামী কোটটা জড়িয়ে ধরে, আমি একমনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। রাস্তাটা খুব চওড়া, আর ভীষণ অন্ধকার। হয়তো এ অন্ধকার এখান দিয়ে যেন কি খুঁজতে খুঁজতে যাওয়া শ্লথগতি গাড়িগুলোর চোখ-ধাঁধানো আলোরই প্রতিফল। গাড়িগুলো হেড-লাইট জেলে রাস্তার ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা বড় বড় প্লেন-গাছগুলোর গুঁড়ির আড়ালে কি যেন খোঁজে, মাঝে মাঝে একটা গাড়ি থমকে দাঁড়ায়, আর সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষায় শুয়ে বসে থাকা দু-তিনটে মেয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। গাড়িটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওরা জানলা দিয়ে ভেতরের দিকে মাথা গলিয়ে দেয়, কথাবার্তা সারে।

তারপর ওদের মধ্যেই একটা মেয়ে দ্রুত পায়ে গাড়ির উলটো দিকের দরজার কাছে এগিয়ে যায়, মুহূর্তের জন্যে হেডলাইটের আলোয় মেয়েটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই খোলা দরজা দিয়ে চালকের পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটা। গাড়িটা তখন আবার চলতে শুরু করে। কিংবা হয়তো কোন মেয়েই গাড়িতে ওঠে না—হয়তো দর বড্ড বেশি, নয়তো পছন্দ হয় না মেয়েটাকে। হতাশ হয়ে গাড়িটা আস্তে আস্তে চলে যায় তখন।

এমন একটা জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছিলো বলে আমার বিরক্ত লাগছিলো। কারণ গুইলিয়ানো যথারীতি আসতে দেরি করছিলো। তাছাড়া আমাকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে—আমিও একটা প্লেন গাছের পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম—গাড়ির চালকরা ইতিমধ্যেই আমার কাছে গাড়ি থামাতে শুরু করেছিলো। এও কি সম্ভব, যে ওরা আমার আর ওই মেয়েমানুষগুলোর মধ্যে কোন প্রভেদই বুঝতে পারছিলো না? এ কথা সত্যি যে, এই এভিন্যুতে আমার অপেক্ষা করার কারণটা ওদের মতোই 'প্রায় এক'—আমিও একজন পুরুষমানুষের জন্যে অপেক্ষা করছি। কিন্তু ওই 'প্রায়' কথাটার মধ্যে একটা গোটা পৃথিবী রয়েছে এবং এ ধরনের মারাত্মক ভুল এড়ানোর জন্যে আমার দিকে একবার নজর করে তাকানোই যথেষ্ট। অথচ তারা কেউই সেভাবে দেখছিলো না। হয়তো রাস্তার মেয়েগুলোর তুলনায় আমাকে একটু আলাদা দেখে ভুল করে ভাবছিলো যে, তারা এমন একটা মেয়ের দেখা পেয়েছে যে নেহাতই ফূর্তি করার জন্যে এ কাজ করছে, অথবা এই হয়তো প্রথমবার। তাই একটা আলোকে ঘিরে জটলা পাকানো অসংখ্য পোকার মতো গাড়িগুলো চারদিক দিকে সশব্দে ছুটে আসছিলো আমার দিকে—দু পাশ থেকে অথবা সামনে থেকে হেডলাইটের জোরালো আলো আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিলো, যেন নগ্ন করে তুলছিলো আমাকে। একজন আমাকে গাড়িতে ঢুকতে বলে দরজা খুলে দিলো, একজন সুস্পষ্ট ভঙ্গিমায় ইশারা জানালো, আর একজন

ঠিক কুকুরকে ডাকার মতো করে শিস দিলো আমার উদ্দেশ্যে। বিচলিত হয়ে আমি একটা সিগারেট ধরালাম, কিন্তু ব্যাপারটা আমন্ত্রণের মতো দেখাতে পারে ভেবে তক্ষুনি সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপর হতাশ মোটর আরোহীদের বিবিধ বিদ্রূপ মন্তব্যের মাঝখান দিয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম খানিকটা।

কিন্তু অবস্থাটা এখন আগের চাইতেও ঘোরালো হয়ে উঠলো। তিন-চারটে মেয়ে বোধহয় খদ্দেরের অপেক্ষাতেই লুকিয়ে ছিলো, আচমকা তারা যেন কোত্থেকে হাজির হয়ে আমাকে ঘিরে ধরলো। ওরা সকলেই মোটামুটি আমার বয়সী, পোশাক পরিচ্ছদ (যদি আদৌ সেগুলোকে পোশাক বলা যায়) এমন যাতে দেখাবার মতো সব কিছু এবং তার চাইতেও খানিকটা বেশি কিছু দেখানো যায়। খাটো ঝুলের স্কার্ট আরও ওপরের দিকে তোলা, গভীর করে কাটা জামার গলা আরও নিচের দিকে টেনে নামানো—পা আর বুক খোলা। কিন্তু এসবের কোথাও যেন সত্যিকারের ছেনালিপনা নেই, সবই এত স্বাভাবিক যে মনে হবে যেন দোকানের জানলায় জিনিসপত্তর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ওদের মধ্যে একটি দিব্যি সুন্দরী মেয়ে—মেয়েটির কালো চোখের ওপরে কপালে কালো ঝালর বাঁধা, পুরুষ্টু লাল ঠোঁট—রীতিমতো আক্রমণের ভঙ্গিমায় আমাকে জিগেস করলো, এত গুমোট আবহাওয়ায় আমি একটা লোমের কোটের মধ্যে কি করছি। আর একটি লম্বা পাতলা চেহারার মেয়ে—চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে—জানালো, দু ঘণ্টা ধরে সে এখানে রয়েছে, কিন্তু কিচ্ছু লাভ হয়নি। তৃতীয় একজন—মুরগীর মতো গোল গোল চোখ, মুরগীর ঠোঁটের মতো বাঁকা নাক আর মাথায় কোঁকড়ানো সোনালী চুলের বোঝাওয়ালা একটি মেয়ে আরও এতটা এগিয়ে এলো যে আমাকে বিশ্বাস করে বলে বসলো, আমি ওর এক বন্ধু, কোন এক আগাথার একেবারে জীবন্ত প্রতিমূর্তি—যাকে নাকি কিছুদিন আগে এখান থেকে কাছেই একটা গর্তের মধ্যে শ্বাস বন্ধ করে খুন হওয়া অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো।

হয়তো কালো ঝালরওয়ালা মেয়েটি খেয়াল করিয়ে দেবার জন্যেই লোমের কোটটা এতক্ষণে আমার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিলো। তাই কোটটা খুলে হাতের ওপরে রেখে, আমি এখান থেকে সরে পড়ার মতলবে গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, গাড়ির মধ্যে চালকের আসনে কে যেন বসে রয়েছে! মেয়েটা আসলে রাস্তার অসংখ্য মেয়েমানুষগুলোর মধ্যেই একজন—বিরাট একটা লাল-রঙা মুখ, মখমলের মতো কালো দুটো কুতকুতে চোখ আর মাথায় ফাঁপিয়ে তোলা সাদা চুলের শিরস্ত্রাণ।

বললাম, 'গাড়িটা আমার।'

যেন খোঁপার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কাতেই মেয়েটি একটুও না নড়ে জবাব দিলো, 'এখন গাড়ির মধ্যে আমি রয়েছি।'

'এক্ষুনি বেরিয়ে এসো।'

'পাগল? আমি সে কথা স্বপ্নেও ভাববো না।'

স্পষ্টতই ওই রাস্তায় অপেক্ষা করার জন্যে, আমার চরিত্রও পালটে গিয়েছিলো। সাধারণত আমি ভদ্র এবং শান্ত। কিন্তু এখন আচমকা আমি হিংস্র হয়ে উঠলাম—হাত বাড়িয়ে বড়-লালমুখো পুতুলটার চুল আঁকড়ে ধরে, আমি ওকে গাড়ি থেকে টেনে বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কর্কশ সুরে একটা চিৎকার তুলে, আমার হাতে চুল ধরে থাকা অবস্থাতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলো মেয়েটা। কিন্তু বেরিয়ে এসেই ও একটু নিচু হলো এবং যেমন করেই হোক আমার চুল আঁকড়ে ধরার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। গোল হয়ে দাঁড়ানো বাজারে মেয়ে-মানুষ আর তাদের সন্ধানে আসা বদমাশ লোকগুলোর মাঝখানে আমাদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেলো। দুজনেরই আলুথালু অবস্থা, দুজনেই হাঁফাচ্ছি, দুজনেই হিংস্র, একজনের আঙুল ছুটে আসছে অন্য-জনের চুলের মধ্যে—আর ওদিকে সবাই উল্লাসে চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে আমাদের। আমার প্রতিপক্ষটি অবশ্য সব সময়েই চুল নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলো। তাছাড়া পাতলুন পরে থাকার জন্যে আমি

ছিলাম অনেক স্বচ্ছন্দ আর চটপটে, কিন্তু খাটো আর সঙ্কীর্ণ স্কার্টের জন্যে মেয়েটার তৎপরতা ব্যাহত হচ্ছিলো বারবার।

শেষ পর্যন্ত আমিই ওকে হারিয়ে দিলাম। ওকে মাটিতে ফেলে, আমার একটা হাঁটু ওর বুকের ওপরে তুলে দিলাম। তারপর ওর কান দুটো ধরে হিংস্র এবং নির্দয়ভাবে ওর মাথাটা এমনভাবে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম, যাতে ওর বড়সড় লাল মুখটা সামনের কাদাভর্তি গর্তটার মধ্যে গুঁজে দেওয়া যায়। কিন্তু ঠিক তখনই থাবার মতো একটা হাত আমার কাঁধ ধরে, আমাকে ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো। তাকিয়ে দেখি, একটা ভীষণ অবাঞ্ছিত মানুষ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—যে কিনা এইমাত্র একটা লাল রঙের স্পোর্টস গাড়ি থেকে নেমে এসেছে। লোকটা বেঁটে, বিরাট জুলফি, নাকটা লাল, ধূর্ত দুটো চোখ, আর মাথায় টাক। হিস্, হিস্, হিস্! নলখাগড়া অথবা চাবুকের মতো দেখতে কোন একটা জিনিস বাতাস কেটে প্রথমে সামনের দিকে আমার দুই উরুতে, তারপর পেছন দিকে, তীব্র আঘাত করলো। তারপরেই গুণ্ডাটা বিনা বাক্যব্যয়ে আমার ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে সেটা খুললো, টাকাপয়সাগুলো তুললো, তারপর সেগুলো নিজের পকেটে রেখে, চলে গেলো। ব্যাগটা সে মাটির ওপরে ছুঁড়ে ফেলেছিলো, আমি নিচু হয়ে সেটা তুলে নিলাম। কিন্তু লোমের কোটটা বৃথাই খোঁজাখুঁজি করলাম, সেটা ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সামনে আর পেছনে যেখানে চাবুকের আঘাত লেগেছিলো, সেখানে আমি জ্বলে যাবার মতো যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। আমার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছিলো। কিন্তু সেই বাষ্পের আবরণের ভেতর দিয়েই অবশেষে দেখলাম, গুইলিয়ানোর গাড়িটা এগিয়ে আসছে …থামছে।

আগের মতো সেই মেয়েগুলোই—কপালে ঝালর আঁটা সেই ঘন রঙের মেয়েটা, মুরগীমুখো সেই স্বর্ণকেশী, উড়ু-উড়ু চুলের সেই রোগা-পাতলা মেয়েটা—তক্ষুনি গাড়ির জানলার দিকে ছুটে গেলো। অন্য-

দিকে আমি কিন্তু পেছিয়েই রইলাম। কারণ একটা জিনিস, এই মেয়েমানুষগুলোর সঙ্গে আমি নিজেকে একত্রে মেশাতে চাইছিলাম না। তাছাড়া গুইলিয়ানো যখন আমার জন্যেই এখানে এসেছে, তখন ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করাও অর্থহীন। কিন্তু তারপরেই এমন একটা ব্যাপার ঘটলো, যা আমি আগে থেকে ভাবতেও পারিনি। গুইলিয়ানো ঝালরপরা মেয়েটাকে ইশারা করলো, মেয়েটাও দ্রুতপায়ে গাড়িটার উলটো দিকের দরজার কাছে এগিয়ে গেলো।

এক লাফে সামনে এগিয়ে এসে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'এই! কি করছো তুমি? ও আমার প্রেমিক।'

'তার মানে? কি বলতে চাইছো তুমি? ও আমাকে পছন্দ করেছে।'

মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে এমন অঙ্গভঙ্গি করলো, যেন বললো, আমি একটা পাগলী। তারপর গাড়িতে উঠে গুইলিয়ানোর পাশে গিয়ে বসলো। গাড়িটা চলতে শুরু করলো এবং উধাও হয়ে গেলো।

আতঙ্কিত এবং বিপর্যস্ত হয়ে আমি আবার প্লেন গাছটার কাছে ফিরে গেলাম। উড়ু-উড়ু চুলের লম্বা লিকলিকে মেয়েটা আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলো, 'এ লোকটা হয়নি, তো কি হয়েছে—অন্য কেউ হবে। আমার দিকে তাকিয়ে ছাখো। আমি ঝাড়া দু ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করে রয়েছি।'

আমি কোন জবাব দিলাম না। এখন আমার লোমের কোটটা নেই, গাড়ি নেই, টাকাপয়সাও কিছু নেই। উপরন্তু ওই নোংরা অপদার্থ মেয়েটার জন্যে গুইলিয়ানোও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমার শরীরের একটা দিক কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে রয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই যে গাড়িটা প্রথমে থামলো, আমি তাড়াহুড়ো করে সেটার মধ্যেই গিয়ে লাফিয়ে উঠে বসলাম—এমন কি চালকের দিকে একবার ভালো করে তাকিয়েও দেখলাম না।

কিন্তু শহরতলির দিকে যেতে যেতে চোখের কোণ দিয়ে লোকটাকে লক্ষ্য করে, আমি যা করেছি তার জন্যে অনুতাপ হলো। লোকটা কুৎসিত, এত কুৎসিত যে দেখে ভয় লাগে। মাথার পাতলা হয়ে আসা কালো চুলগুলো সাদা খুলিটার গায়ে লেপটে রয়েছে, চোখ দুটো কোটরগত, কপালটা উঁচু, নাকটা থ্যাবড়া, ঠোঁট লালচে, চোয়ালটা ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে। ঠিক যেন একটা মড়ার মাথা। মনে হলো, আমাকে একটা অজুহাত খুঁজে বের করতেই হবে—তারপর লোকটা গাড়ি থামালেই আমি নেমে পড়বো। কিন্তু সেই মুহূর্তেই খুলিটা আমার দিকে ফিরে জিগেস করলো, 'কি নাম তোমার ?'

'আমার নাম ক্লেলিয়া।'

'বয়েস কত ?'

'কুড়ি বছর।'

'ক্লেলিয়া, তোমাকে আমার একটা কথা বলার আছে।'

'কি ?'

'আমি যখন গাড়ি থামিয়েছিলাম, তখন তোমাকে ভালো করে দেখিনি।'

'তাতে কি ?'

'এখন তোমাকে ভালোমতো দেখছি।'

'বেশ, তারপর ?'

'স্বীকার করতেই হবে, তুমি ঠিক আমার পছন্দমতো মেয়ে নও।'

'তার মানে. কি বলতে চাইছো তুমি ?'

'মানে, তোমাকে আমার ভালো লাগছে না।'

আমি আহত হলাম। সাধারণত সকলে মনে করে, আমি সুন্দরী। একটা হীন রুচির ক্রোধ আমার ভেতরে ফেটে পড়লো, অথচ আমার এ ধরনের রাগ হতে পারে বলে আমি জানতাম না। বেচারা মড়ার মাথাটাকে আমি অপমানের ধারায় একেবারে অতিষ্ঠ করে তুললাম। আমি তখন দুর্দমনীয়, শয়তানে ভর করা মেয়েমানুষ—আমার আচরণ

বেহায়া এবং আশ্চর্যজনক হলেও, পেশাদার মেয়েদের মতো। আতঙ্ক-গ্রস্ত হতভাগা মানুষটা তখন আমার হাতে কিছু টাকা গুজে দিয়ে আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। টাকাটা আমি নিলাম বটে, কিন্তু লোকটার উদ্দেশ্যে চিৎকার করা বন্ধ করলাম না। লোকটা তখন গাড়ি ঘুরিয়ে আবার আমাকে আগের জায়গায় নিয়ে এলো।

অতএব আবার আমি সেই পুরনো প্লেন গাছটার কাছে ফিরে এলাম। এবারে আমার নিজেকে রাস্তার অন্য মেয়েদের মতো ঠিক একই রকমের বলে মনে হচ্ছিলো। দু ঠোঁটের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ঝুলিয়ে মাথা টান করে আমি গর্বিত ভঙ্গিমায় এগিয়ে গেলাম। ঠিক যেন বিধি-নিষেধ না মানা একটা বেলজ্জ, বেপরোয়া মেয়ে। মেয়েদের দলটার দিকে এগিয়ে যেতেই যে মেয়েটাকে দেখতে পেলাম, সে সেই কপালে কালো ফেট্টি বাঁধা মেয়েটা—যে গুইলিয়ানোর সঙ্গে চলে গিয়েছিলো। মেয়েটা যেন আমার সমপর্যায়ের—এমনি ভঙ্গিতে জিগেস করলাম, 'কি, কেমন হলো?'

'লোকটা অদ্ভুত ধরনের—আমাকে ক্লেলিয়া বলে ডাকবেই।'

একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি আমাকে দিবাস্বপ্ন থেকে জাগিয়ে তুললো। আমি গুইলিয়ানোর গাড়িতে, ওর পাশেই বসে আছি। গাড়িটা শহরতলির সরু একটা গলিতে এসে থেমেছে। তাজা ফুরফুরে হিমেল বাতাস জানলা দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকছে। অন্ধকারের মধ্যেও একটা সাদা রঙের খামার বাড়ি, গাছগাছালি, মাঠ-প্রান্তর—সব কিছু আমি আলাদা করে চিনতে পারছি।

'তোমার কি হয়েছে, আমাকে দয়া করে বলবে?' গুইলিয়ানো জানতে চাইলো।

আমি কোন জবাব দিলাম না। হাতব্যাগটা খুলে দেখলাম, টাকা-পয়সা যথাস্থানেই রয়েছে। আমার গায়ে লোমের কোট। শরীরে এতটুকুও কাদার চিহ্ন নেই। কিছুই হারায়নি—আমি যথারীতি সেই

শান্তশিষ্ট ক্লেলিয়াই রয়েছি।

'চাবুকটা,' বিড়বিড় করে বললাম।

'কি ? কোন্ চাবুক ?'

'তুমি আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলে, আর…'

'আমি দুঃখিত, গাড়ির জটে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি তোমার কি হয়েছে বলো তো ?'

'কিছু না, শুধু মুহূর্তের বিভ্রান্তি। এখন সে সব কিছু কেটে গেছে।'

মিলনপিয়াসী

ভিয়া দি ভিলিনির চৌত্রিশ নম্বর বাড়ির পাঁচতলায় আসবাবপত্রে সাজানো পাঁচ ঘরের একটা ফ্ল্যাট মেয়াদি চুক্তিতে ভাড়া দেওয়া হবে— বিজ্ঞাপনটা পড়ার পর থেকে আমি সেটার সম্পর্কে চিন্তা করা থামাতে পারছিলাম না। তাই হোটেল থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়িতে চেপে সেখানে গিয়ে হাজির হলাম।

ভিয়া নমেনতানার মোড় ছাড়িয়ে দশ মিনিটের মধ্যেই ভিয়া দি ভিলিনিতে পৌঁছে গেলাম। বাড়িটা খানিকটা পুরনো। লোহার দরজায় লতাগাছ, আর লাল কিংবা সাদা রঙের ওলিয়্যানডার ফুল। যে বাড়িটার সামনে গাড়ি থামালাম, সেখানে আমি তিনটে বছর স্ত্রীকে নিয়ে বাস করেছিলাম।···গাড়ি থেকে নেমে বারান্দার মতো সরু ছোট্ট বাগানটার অন্য প্রান্তে সদর দরজাটা অব্দি হেঁটে গেলাম। পাঁচতলার ঘন্টি বাজানোর বোতামে চাপ দেবার একটু পরেই পরিচিত শব্দ তুলে ছোট্ট একটা দরজা নিজে থেকে খুলে গেলো। মেঝেতে সাদা-কালো ছক কাটা পুরনো হলঘরটাতে গিয়ে ঢুকলাম আমি, তারপর মাথা নুইয়ে হাতল ধরে ধরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম।

দোতলা, তিনতলা, চারতলা। চারতলার পরে দ্বিতীয় সারি সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে চোখ তুলে তাকাতেই, সব চাইতে ওপরের ধাপ-টাতে আমার জন্যে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা মহিলার পা তুটো দেখতে পেলাম। দীর্ঘ, মামুলি আর অবর্ণনীয় রকমের খুশীয়াল বড়সড় তুটি পা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই জিগেস করলাম, 'এই ফ্ল্যাটটাই ভাড়া দেওয়া হবে কি?'

সব চাইতে ওপরের ধাপটাতে উঠে এসে মুখোমুখি হলাম আমরা, তুজনে তাকালাম তুজনার দিকে। ও এখনও ঠিক সেই আগের মতোই

রয়েছে—সবুজ ঝিলমিলে দুটি চোখ, ফর্সা কৃশ মুখ, ভীষণ লাল দুটি ঠোঁট, আর কাঁপানো বাদামী চুলের নরম দুটি ঢেউ। এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো ও—ঠিক ততক্ষণ, যতক্ষণে ও ঠিক করে নিতে পারে, আমি যে অভিনয়ের প্রস্তাব করেছি ও সেটা মেনে নেবে কিনা। তারপর বললো, 'হ্যাঁ, এটাই।'

'আমাকে নিজেব পরিচয়টা জানাবাব অনুমতি দিন—আমার নাম লরিনি।'

'আমার নাম ডোরা।'

'ডোরা—কি?'

'ডোরা মরেত্তি।'

এটা ওর কুমারী জীবনের নাম। আমাকে ও ফ্ল্যাটটাতে নিয়ে গেলো। তারপর দীর্ঘ পেশীবহুল পা দুটিতে ঘূর্ণি তুলে ঘুরে দাঁড়িয়ে, শুভ্র একখানা হাত তুলে বললো, 'এটা বাইরের ঘর।'

'কি চমৎকার আসবাবপত্র! আপনি নিজেই কি এগুলো পছন্দ করেছিলেন নাকি?'

'না না। আমি এগুলোর সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমার স্বামীই এগুলো পছন্দ করেছিলেন।'

'আপনি কি বিবাহিতা?'

'আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।'

আমাকে পথ দেখিয়ে বারান্দা ধরে এগিয়ে চললো ও। ওর পরনে হালকা সবুজ রঙের হাতাবিহীন একটা জামা, খাটো ঝুল আর সঙ্কীর্ণ ঘেরের ধূসর স্কার্ট। দরজা খুলে ও ভেতরে ঢুকলো না, এক পাশে সরে দাঁড়ালো—যাতে আমি ভেতরে যেতে পারি।

'এটা শোবার ঘর,' বললো ও।

পুরনো জিনিসপত্রের দোকানে ঘুরে ঘুরে আমি একটা একটা করে আসবাব কিনে ঘরটা সাজিয়েছিলাম। পেছন দিকে লোহার ঢেউ তোলা খাটটা স্পেইন দেশীয়। কুর্সি, পোশাকের আলমারি, কাঠের দেরাজ—

সবই এক ধরনের। জানলাগুলোতে লাল রঙের পর্দা। লক্ষ্য করলাম, ঘরটাতে অব্যবহারের চেহারা। গদিগুলো গোল করে গোটানো।

'আপনি এখানে ঘুমোন না?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'না, এ সমস্ত পুরনো আবর্জনাগুলোকে আমি মোটেই সহ্য করতে পারি নে। এখন কোন ঝি-চাকর নেই বলে, আমি ওদের ঘরেই ঘুমোই।'

এগিয়ে গিয়ে জানলাটা খুলে দিলাম। তারপর এখানে থাকার সময় যেমন করতাম, ঠিক তেমনি করে পাশের বাড়ির বাগানে বিশাল ম্যাগনোলিয়া গাছটার দিকে তাকালাম। ও আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। হালকা হাতে আলগোছে আমার হাতটা ছুঁয়ে বললো, 'কি সুন্দর বাগান, তাই না? বাগানটা আমার নয়, কিন্তু প্রায় যেন সে রকমই।'

আচমকা প্রশ্ন করে বসলাম, 'স্বামীর সঙ্গে আপনার ছাড়াছাড়ি হলো কেন, সিনোরা মরেত্তি?'

দু চোখে খুশির আলো নিয়ে আমার দিকে তাকালো ও, 'কত কিছুই না আপনার জানার ইচ্ছে! কিন্তু সেটা আপনি জানতে চাইছেন কেন, বলুন তো?'

'তা ধরুন, নিছক কৌতূহল।'

'যদি সত্যিই জানতে চান তবে বলি, চারিত্রিক অসঙ্গতির জন্যে।'

এমন নিবিড় আত্মপ্রসাদের সঙ্গে সূত্রটা ও উচ্চারণ করলো, যাতে আমার হাসি পেয়ে গেলো। তবু জেদ ধরে শুধালাম, 'তাতে করে আপনি সঠিকভাবে কি বলতে চাইছেন?'

'বলতে চাইছি যে, আমার স্বামী আর আমি—আমরা দুজনে একেবারে আলাদা ধাঁচের মানুষ। কম বেশি হলেও আমি শ্রমিক-শ্রেণীর মেয়ে। আর ও এসেছে এমন একটা পরিবার থেকে, যে পরিবারের সকলেই ডাক্তার আর অধ্যাপক। আমি অশিক্ষিত, আর ও পড়াশুনো ছাড়া কিছুই করতো না। আমি নাচ, খেলাধুলো আর খোলা

বাতাসের জীবন ভালোবাসতাম—ভালোবাসতাম যা কিছু আনন্দ আর প্রাণময়, তার সব কিছুকে। কিন্তু ও ছিলো শান্ত, ঘরকুনো, মনোযোগী পাঠক, মানুষ-বিদ্বেষী আর হাঁড়িমুখো পণ্ডিতমশাই।'

'হ্যাঁ, বুঝলাম। কিন্তু কখনো কখনো শুধু মাত্র স্বভাব-চরিত্র আলাদা হবার জন্যেই…'

'তা ছাড়া আরও কিছু আছে।'

'সেটা কি?'

'আমি আশা করেছিলাম, বিয়ে হলে ও আমাকে শিক্ষিত করে তুলবে। সুন্দর জিনিস বলতে ও যা কিছু জানে, তা সবই আমাকে শেখাবে। অথচ ও আশা করতো আমি ওর জন্যে রান্নার কাজ করবো, ঘর-গেরস্থালী সামলাবো, সাধারণ চাকরবাকরের মতো খাটবো। তাই শেষ অব্দি কিছুতেই আমাদের মিল হলো না।'

'আচ্ছা! তা সব কিছু শেষ হলো কিভাবে?'

'খুব বিশ্রীভাবে।'

জানলা ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ও বললো, 'আমি ওর ঝি-চাকর হিসেবে কাজ করি, ও যে শুধু তাই-ই চাইতো—তা নয়। ও আমাকে বিশ্বাস করাতে চাইতো যে, আমি শুধু ওই সব কাজেরই উপযুক্ত। সমস্ত দিন গানের ধুয়ার মতো ও আমাকে কি বলতো, জানেন?'

'কি?'

'বলতো, বোকা—তুমি একটা আস্ত বোকা। তুমি সুন্দরী, কিন্তু বোকা। আমার বোকা সোনাটা, আমি কত্ত ভালোবাসি তোমাকে!'

'তাহলে আপনার স্বামী আপনাকে ভালোবাসতেন?'

'বাসতো। ভালোবাসতো না, সে কথা আমি বলছি না। কিন্তু সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কেউ আপনাকে বোকা বলে ডাকছে শুনলে…'

মাথায় একটা বিশ্রী ধরনের ঝাঁকুনি তুললো ও, যেন অসহ্য রকমের

একটা উৎকট বাড়াবাড়ি বোঝাতে চাইলো। তারপর অন্য একটা ঘরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার স্বামীর পড়াশুনো করার ঘর।'

আমিও ঘরের ভেতরে তাকালাম, 'ওহ্, কত বই! আপনার স্বামী এগুলো নিয়ে যাননি কেন?'

'জানি না। যাবার সময় বলে গিয়েছিলো, এখানকার কিছুই ও চায় না...আসবাবপত্র, বই—কিছুই না। সবই আমার জন্যে রেখে যাচ্ছে। বলেছিলো, এখন থেকে ও আসবাবপত্র আর বই ছাড়াই হোটেলে বসবাস করবে।'

'আপনার স্বামী কি করেন?'

'খবরের কাগজে লেখেন।'

'সাংবাদিক?'

'না, সাংবাদিক নন—সমালোচক। খবরের কাগজে উনি সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ লেখেন।'

'আপনি...আপনি সে প্রবন্ধগুলো পড়তেন?'

'না। আমি সেগুলো পড়ি, ও তা চাইতোও না। বলতো আমি বোকা মূর্খ—আমি ওসব বুঝতে পারবো না। ছাপা হয়ে বেরুবার পর আমি সেগুলোকে কেটে, আঠা দিয়ে খাতায় সেঁটে রাখতাম।'

'আপনার স্বামী কি খুব বেশি পড়াশুনো করতেন?'

'বেশি মানে? সব সময়েই পড়তো। ওখানে, জানলার কাছে ওই আরামকুর্সিটাতে বসে, দিনভর শুধু পড়তো। বিছানায় শুয়েও পড়তো—এক পাশে বই, আর এক পাশে আমি।'

'আপনার স্বামীর বয়েস কত ছিলো?'

'খুব একটা বেশি বয়েস না—ছত্রিশ। কিন্তু এমন ভাবসাব করতো, যেন ওর নব্বুই বছর বয়েস। আমি যখন বোঝাতাম যে আমি একটু আদর-টাদর পেতে চাইছি, তখন ও আমাকে কি বলতো জানেন?'

'কি বলতো?'

'বলতো, ও সমস্ত বোকা বোকা ভাবসাব বন্ধ করো।'

ফের দরজা বন্ধ করে পাশের ঘরের দরজাটা খুললো ও, 'এটা খাবার ঘর।'

এ ঘরটা আমি আসবাবপত্র দিয়ে ফ্রান্সের প্রভাংস প্রদেশীয় কেতায় সাজিয়ে ছিলাম। শোবার ঘরের মতো এ ঘরটা দেখেও আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, এটাও ব্যবহার করেনি ও।

'আপনি এখানে খাওয়াদাওয়া করেন না?'

'না, এই ঘন রঙের আসবাবগুলো আমার মন খারাপ করে দেয়। আমি রান্নাঘরেই খাই। তাছাড়া এ ঘরটা আমাকে আমার বিয়ের সমাপ্তির কথা মনে করিয়ে দেয়।'

'কেন?'

ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে এক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে রইলো ও। তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি আমাদের কোন রাঁধুনী ছিলো না, শুধু বাঁধা সময়ের একটা ঠিকে ঝি ছিলো। রাঁধুনী ছিলাম আমি। যদিও নিজের মুখে বলছি, কিন্তু আসলে আমি সত্যিই খুব ভালো রাঁধুনী। আর আমার স্বামীও গোঁ ধরে রেখে-ছিলো, রান্নাটা আমাকেই করতে হবে। একদিন সকালবেলায়—সেটা ছিলো শুক্রবার—আমি একটু বিশেষভাবে মাছের ঝোলটা রান্না করে-ছিলাম। ও বসেছিলো ওখানটাতে, টেবিলের মাথায়—আর খেতে খেতেই যথারীতি নিজের গ্লাসের সঙ্গে একটা বই হেলান দিয়ে রেখে পড়ছিলো। একসময় মুখ না তুলেই বললো, 'মাছের ঝোলটা সত্যি ভারি চমৎকার হয়েছে, ডোরা।' তাই শুনে হঠাৎ আমার কি হলো জানি না, আমি টেবিলের ঢাকনাটা দু হাতে ধরে পুরো ঝোলটা ওর মুখে ছুঁড়ে দিলাম।'

'সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'তারপর?'

'তারপর আমরা এর একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করালাম আর তাতেই

আসল সত্যটা বেরিয়ে এলো। ওকে বললাম, কোন শর্তেই আমি আর ওর সঙ্গে থাকতে চাই না। আমি আবার বাবা-মার কাছে ফিরে যাবো। তখন ও আমাকে মিনতি করে বললো, যাতে এখানকার আসবাবপত্র, বই-টই আর অন্য সমস্ত কিছু নিয়ে আমি এ ফ্ল্যাটেই থাকি। তারপর নিজে একটা স্যুটকেসে সামান্য কটা জিনিস নিয়ে হোটেলে চলে গেলো।'

'সেই থেকে তাঁর সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়েছে?'

'না। এক বছরের ওপরে হয়ে গেছে, আর দেখা হয়নি। মাঝে মাঝে ভাবি, এখনও কি ও সেই আগের মতোই আছে, নাকি বদলে গেছে।'

'সে বিষয়ে আপনার কি মনে হয়?'

'আমার ধারণা, ও এখনও সেই একই রকমের আছে। বদলে যাওয়া মোটেই সহজ নয়।'

'যদি তিনি বদলে গিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি কি আবার তাঁকে গ্রহণ করবেন?'

'কে জানে!'

খাবার ঘরের দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলো ও। তারপর বারান্দার শেষ প্রান্তে গিয়ে আর একটা ছোট্ট দরজা খুললো, 'এটা ঝিয়ের ঘর। আমি এখন এখানেই ঘুমোই।'

ঘরটা এত ছোট যে খাটটাই প্রায় সমস্তটা জায়গা জুড়ে রেখেছে। ওর নীল রঙের হালকা রাত্রিবাসটা উঁকি মারছে বালিশের তলা থেকে। চটিজোড়া মেঝেয়, খাটের কাছে পাপোষের ওপরে রয়েছে। আরামকুর্সির গায়ে একটা তোয়ালে, আর তোয়ালের ওপরে সদ্য-কাচা একজোড়া মোজা। আচমকা ও একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো—ঘাড়ের নিচে হাত রেখে খাটের ওপরে চিত হয়ে শুয়ে পড়লো। নির্লজ্জ এক চপলতা ঝিলমিলিয়ে উঠলো ওর সবুজ চোখ দুটিতে। বললো, 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি, সিনোর লরিনি?'

'বলুন—'

'আপনি কি বিবাহিত?'

'আমিও বিচ্ছিন্ন, আপনার মতো।'

'তবু ভালো। দেখুন, আপনি যদি ফ্ল্যাটটা নেবেন বলে মনস্থ করে থাকেন, তবে আমি একটা শর্ত প্রস্তাব করতে চাই।'

'সেটা কি?'

'আপনি এই ছোট্ট ঘরটা আর পাশের স্নানঘরটা আমাকে ছেড়ে দেবেন, আর রান্নাঘরটাও ব্যবহার করতে দেবেন। তার বদলে আমি আপনাকে রান্নাবান্না করে দেবো, ঘরদোর গুছিয়ে রাখবো—বলতে গেলে, সমস্ত বাস্তব ব্যাপারগুলোরই ভার নেবো।'

'অর্থাৎ অন্য ভাষায়, আপনি আমার চাকরের কাজ করবেন বলে প্রস্তাব দিচ্ছেন।'

'আপনি যদি ব্যাপারটা সেভাবে বলতে চান—তাহলে তাই।'

'কিন্তু আপনি না বললেন, আপনার স্বামী আপনাকে দিয়ে তাঁর চাকরের কাজ করাতে চাইতেন বলেই আপনি তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করে নিয়েছেন?'

'কিন্তু আমার স্বামীর চাইতে আপনি আলাদা—আপনার বোধশক্তি অনেক বেশি, আপনি অনেক সহৃদয়, অনেক হাসিখুশি। আপনার ক্ষেত্রে আমি নিজের ইচ্ছেতেই চাকর হিসেবে খাটবো।'

ও তাকিয়েছিলো আমার দিকে। উচ্ছ্বাসময়, প্রলুব্ধকর ভঙ্গিমা। বাহুর ঊর্ধ্বাংশ ওপরের দিকে তোলা, হাত দুটি ঘাড়ের নিচে। বললাম, 'প্রস্তাবটা আকর্ষণীয়। তাহলে এমনি করা যাক—ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখবো এবং আসছে কাল সকালে আপনাকে আমার জবাবটা জানাবো।'

সেই মুহূর্তে খাটের কাছে রাখা টেবিলটা থেকে দূরভাষ বেজে উঠলো। গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নিয়ে ও কথা বলার অংশতে হাত চাপা দিয়ে বললো, 'জবাবটা তাহলে এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে।...আচ্ছা, আমি

যদি দরজা অব্দি আপনার সঙ্গে না আসি, আপনি কিছু মনে করবেন কি?'

'একটুও না।'

আমি বেরিয়ে এলাম। কিন্তু সিঁড়িতে পা দিয়েই বুঝলাম, টুপিটা হলঘরে ফেলে এসেছি। বিশেষ কিছু না ভেবেই ফিরে এলাম, পকেট থেকে ফ্ল্যাটের চাবি বের করে দরজা খুললাম। টুপিটা টেবিলের ওপরেই ছিলো। সেটা নিতেই দূরভাষে বলতে থাকা ডোরার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'সিসিলিয়া, মাত্র কয়েক মিনিট আগে কে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো, অনুমান কর···'

আর কিছু শুনলাম না। টুপিটা নিয়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে এসে, নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

প্রথমে আমার বয়েসটা লক্ষ্য করুন—পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস অব্দি আমি আমার দিদি, জামাইবাবু এবং তাদের মেয়ে আগাতিনার সঙ্গে একত্রে থাকতাম। আমার দিদি এলভিরার বয়েস তখন আটত্রিশ আর আগাতি-নার আঠারো। বিশেষ করে, আমরা সবাই আমার মা'র সঙ্গে একত্রে থাকতাম বলে, ওই সময় অব্দি এটাই ছিলো আমার ঘর-সংসার। তার-পর মা মারা গেলেন। কিন্তু মা যতদিন ছিলেন ততদিন ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলোর চাইতে সংসারের কথা আমাদের কাছে এত বড় বলে মনে হতো যে, মা'র মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন পরেই আমি যখন বিয়ে করবো বলে ঠিক করলাম, তখন সত্যি সত্যিই গভীরভাবে আমি ভাবতাম যে আমার স্ত্রীকে এ বাড়িতে নিয়ে এসে আগের মতোই ওদের সঙ্গে একত্রে থাকবো। আমরা ছিলাম সত্যিকারের এক সংসারের মানুষ। দিদিকে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম, জামাইবাবু ছিলেন আমার সত্যিকারের বন্ধু, আর আগাতিনাকে আমি আমার নিজের মেয়ের মতোই দেখতাম। আগাতিনার চুলগুলো ঘন কালো, মুখখানা ফ্যাকাশে, আর কালো চোখ দুটি ভীষণ গম্ভীর। ষোল বছর বয়েস অব্দি ও ছেলেমানুষটিই ছিলো, তারপর কয়েক বছরের মধ্যে একেবারে পরিপূর্ণ মহিলা হয়ে উঠলো। ওকে আমি চোখের সামনে বড় হয়ে উঠতে দেখেছি—খানিকটা সে জন্যে, আর খানিকটা ওর বিচক্ষণ শান্ত ভদ্র এবং সুন্দর স্বভাবের জন্যে —আগাতিনাকে আমি বিশেষভাবে স্নেহ করতাম। সম্ভবত বাবা-মার চাইতে ও আমাকে বিশ্বাস করতো বেশি এবং আমিও সময়ে অসময়ে মামা-ভাগ্নী হিসেবে ওর সঙ্গে দুটো কথাবার্তা বলার মধ্যে কোন দোষ দেখতে পেতাম না—বিশেষ করে যেহেতু ও বুদ্ধিমতী এবং বয়েসের তুলনায় ওর পর্যবেক্ষণ শক্তি ওমন্তব্য প্রায়ই আমাকে অবাক করে দিতো।

কিন্তু তারপর মা মারা গেলেন, আমি বিয়ের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম। সংক্ষেপে বলতে গেলে, মা'র মৃত্যুর এক বছর পর বিয়ে করে আমি বুঝতে পারলাম—আমার পুরনো সংসার-জীবন শেষ হয়ে গেছে। অথবা এ কথাও বলা যায় যে, এবারে আমার একটা নিজস্ব সংসার-জীবন গড়ে তোলার সময় এসেছে। অতএব আমি ওদের ছেড়ে চলে এলাম। ওরা থাকতো ভিয়া তুসকোলানাতে, আমি চলে এলাম শহরের আর এক প্রান্তে—নিরোর সমাধিস্থানের কাছে। ওদের ছেড়ে চলে আসতে আমার দুঃখ লাগছিলো, কিন্তু ভেবে দেখলাম যে এটা এখুনি করা দরকার। তা-ছাড়া জামাইবাবুর সঙ্গে অংশীদারিত্বে ভিয়া কাজিয়ায় আমি যে গ্যারাজটা নিয়েছিলাম, সেটা আমার নতুন বাড়ি থেকে সামান্য একটু দূরে। আগা-তিনা আর এলভিরা অবিশ্যি আমার স্ত্রীকে সংসার পাততে সাহায্য করে-ছিলো এবং তারপর থেকে প্রায়ই, বেশির ভাগ রোববারগুলোতে, আমরা পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ চালিয়ে যেতে লাগলাম।

বস্তুত, নতুন বাড়িতে আসার তিন মাস পরে এক রোববারই সকাল বেলায় দিদি আমাকে টেলিফোন করে তক্ষুনি ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে বললো। বললো, আমার সঙ্গে ও কথা বলবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, কি হয়েছে। ও তখন 'আগাতিনা...' বলে শুরু করেই থেমে গেলো। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আগাতিনা? আগাতিনার কি হয়েছে?' ও তাড়াতাড়ি জবাব দিলো, 'কিচ্ছু না, কিছু হয়নি। টেলিফোনে আর বেশি বলতে পারছি না। তুই এলে, বলবো।'

অতএব স্ত্রীকে বললাম যে, আমাকে এলভিরার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে হবে। তারপর মোটর-সাইকেলে লাফিয়ে উঠে ভিয়া কাজিনা, ভিয়া ফ্লামিনিয়া, করসো, কলোজিয়াম এবং সান গিয়োভান্নি ধরে ভিয়া তুসকোলানায় গিয়ে পৌঁছলাম। শহরের দরজার বাইরে সরকারী বাগানের মতো বিরাট চত্বর আর সিঁড়িগুলোতে 'এ' থেকে 'এফ' অব্দি নম্বর দেওয়া যে বিশাল হলদে রঙের বাড়িগুলো রয়েছে, আমার ভগ্নীপতি তারই এক-টাতে থাকেন। বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক আমাকে চিনতো, আমি তার কাছে

মোটর সাইকেলটা রেখে 'বি' লেখা সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় গিয়ে হাজির হলাম। এলভিরা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিলো, যেন আমার জন্যে ও দরজার পেছনেই অপেক্ষা করছিলো। আমার বোনটি লম্বা, শক্ত-সমর্থ চেহারা। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই দেখলাম, ও একেবারে ভেঙে পড়েছে …চোখ তুটো ফ্যাকাশে আর ক্লান্ত, বয়েস যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। ও আমাকে খাবার ঘরে নিয়ে গেলো, যেটাকে ওরা বৈঠকখানা হিসেবেও ব্যবহার করে। তারপর বসেই, আচমকা বললো, 'আগাতিনা আত্ম-হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো।'

'তার মানে…সত্যি সত্যি চেষ্টা করেছিলো?'

'হ্যাঁ, ঘুমের বড়ি খেয়ে। অবিশ্যি সাংঘাতিক কিছু হয়নি। হাস-পাতালের লোকেরা বললো, ও তক্ষুনি বাড়িতে ফিরে আসতে পারে। এখন বিছানায় শুয়ে রয়েছে।'

'কিন্তু কেন ও অমন কাজ করলো?'

'ঈশ্বর জানেন। আমাদের ও কিছুই বলবে না…কথাই বলে না। ওর বাবা অনেক চেষ্টা করেছে, রাগারাগি করেছে—কিন্তু কোন কাজ হয়নি। আমি তোকে আসতে বললাম, কারণ ও তো তোকে খুব বিশ্বাস করে…তাই তোকে হয়তো বলবে।'

আমি এমন অবাক হয়ে গেলাম যে সরবে চিন্তা করার মতো বললাম, 'কিন্তু এত লোক থাকতে আগাতিনা…আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না!'

'কিন্তু ঘটনাটা তাই,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো এলভিরা। 'ও আমাকে এত ভাবিয়ে তুলেছে যে আমি ঘুমোতে পর্যন্ত পারি না। তুই যা, গিয়ে ছাখ যদি ব্যাপারটা কিছু বের করতে পারিস।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো এলভিরা, আমি ওকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম বারান্দা দিয়ে। আগাতিনার ঘরের কাছে এসে ও দর-জাটা খুলে, মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে বললো, 'তোমার মামু আলেজান্দ্রো এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।' আগাতিনা কি জবাব দিলো

আমি শুনতে পেলাম না। কিন্তু আমার দিদি মাথাটা বাইরে বের করে এনে, আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে সায় জানালো। যেন বললো, 'ঠিক আছে, তুই ভেত্তরে যেতে পারিস। গিয়ে ছাখ—আমাদের সাহায্য করার জন্যে যা কিছু করা যায়, করিস।' আমি আমার সবটুকু সাহস একত্র করে তুললাম, কারণ হঠাৎ নিজেকে আমার ভীষণ বিব্রত বলে মনে হলো—যেন এ ব্যাপারটা আগাতিনাকে নিয়ে নয়, সম্পূর্ণ অপরিচিতা কাউকে নিয়ে। তারপর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

ঘরটা ছোট, দেয়ালের লাগোয়া লম্বালম্বি করে একখানা খাট পাতা। অন্য প্রান্তে একটা জানলা, তার সামনে টেবিল আর একখানা কুর্সি। বিছানায় বসেছিলো আগাতিনা···পিঠের কাছে গোটা দুত্তিন বালিশ, হাত দুটো নিস্তেজভাবে দু ধারে ছড়ানো। চুলগুলো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিলো ওর মুখের চারধারে। গরমের দিন বলে ওর পরনে হাতাকাটা একটা রাত্রিবাস, সেই সঙ্গে অর্ধশায়িত শরীরের ওপরে শুধু একটা চাদর টানা। ওর মুখের বিবর্ণতা আমাকে চমকে দিলো···গভীর ক্লান্ত, ম্লান মুখ—কিন্তু তা দৈহিক দিক দিয়ে অসুস্থ মানুষের ম্লানিমা নয়। ওতে অবসন্নতা আর পূর্ণতার ইঙ্গিত—যার জন্যে আমার আবার মনে হলো, আমি যেন এক অপরিচিতার কাছে এসে হাজির হয়েছি। তারপর নিজেকেই মনে করিয়ে দিলাম, শত হলেও আমি ওর আলেজান্দ্রো মামু, ও আমার ছোট্ট সোনা ভাগ্নী আগাতিনা। আমাকে যে ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে সে জন্যে সযত্ন প্রয়াসে নিজেকে তৈরি করে ঘরে ঢুকে, আমি বিছানায় ওর পাশে গিয়ে বসলাম। খানিকটা উচ্ছ্বাসভরে বললাম, 'এ সব কি ব্যাপার, আমি জানতে চাই আগাতিনা। এবারে কিন্তু আমি সত্যি সত্যি তোমার ওপরে রাগ করেছি।···তুমি জানো, আমি তোমাকে চিনতে পর্যন্ত পারিনি?' নিজের পিতৃসুলভ কণ্ঠস্বরের অযথার্থতা সম্পর্কে আমি তক্ষুনি সচেতন হয়ে উঠলাম, কিন্তু তার কারণ ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই নিজেকে সামলে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে ওর ফ্যাকাশে গালটিতে আদর করতে লাগলাম।

কিন্তু শীগ্রিই হাতটা সরিয়ে নিলাম—যেন হাতটাতে ছ্যাঁকা লেগেছে। বুঝতে পারলাম, আমার এ ধরনের আচরণ একেবারে বেমানান।...

আগাতিনা এতক্ষণ অচঞ্চল গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো আমার দিকে। এবারে প্রায় কঠোর সুরে প্রশ্ন করলো, 'তোমাকে কে বলেছে, মামুসোনা?'

'তোমার মা। কিন্তু আমি জানতে চাই, তুমি কেন অমন করেছিলে।'

'অথচ মাকে আমি বিশেষ করে বলে রেখেছিলাম, যাতে তোমাকে এ কথাটা না বলে,' সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ সুরে জবাব দিলো আগাতিনা।

ওর কথায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করে আমি বলে চললাম, 'তুমি কি জানো যে তোমার বয়েস আঠারো বছর? আর তার মানেটা কি, তা তুমি জানো? তার মানে, এখনও তোমার সামনে সারাটা জীবন পড়ে রয়েছে। তুমি যা করেছো তা হচ্ছে—খেতে বসে, ধরো শুধু খিদে বাড়ানোর পানীয়টুকু খেয়ে, সব কিছু খাওয়া হয়েছে মনে করে উঠে যাওয়া। জীবনের কতটুকু জানো তুমি? সামান্য একটু ডাঁটাচচ্চড়ি আর ছোট্ট একটুকরো শুয়োরের মাংস শুধু খেয়েছো, এখনও ভালো স্বাদের অনেক বেশি জিনিস তোমার খাওয়া বাকি। তবু এত শীগ্রি তুমি সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলে?'

জীবনের সঙ্গে খাবার টেবিলের এ হেন তুলনাটা—যেটা বিব্রত অবস্থায় প্রথমে আমার মনে এসেছিলো, সেটা আরও খানিকক্ষণ চালিয়ে আমার বলার ইচ্ছে ছিলো যে, প্রায় খাওয়া শুরু করার আগেই ও টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু হঠাৎ, বুদ্ধিদীপ্ত গভীর দৃষ্টির সঙ্গে এক বিচিত্র মনোযোগ মিশিয়ে ও আমাকে লক্ষ্য করছে বুঝে আমি বিভ্রান্ত হয়ে, যেন লজ্জা পেয়েই প্রসঙ্গটা শেষ করে বললাম, 'আমি জানতে চাই, কেন তুমি তা করেছিলে।'

কথাটা বলে আমি বিছানায় পড়ে থাকা ওর একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিলাম। ও বাধা দিলো না। সত্যি কথা বলতে কি, আমার

যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে আমার হাতে ওর আঙুলের সামান্য একটু চাপও যেন আমি অনুমান করলাম। ও তাকিয়েছিলো আমার দিকে। লক্ষ্য করলাম, অশ্রুবিন্দুতে ও চোখ দুটি ঝিলমিল করছে। মনে হলো আমি যা জানতে চাইছিলাম, এবারে ও সত্যি সত্যি আমাকে তা বলবে। তবু বললাম, 'আমি তোমার মামুসোনা—আর তুমি তো জানো, আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। আমার সঙ্গে তুমি খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারো।...বলো, কেন তুমি অমন করেছিলে? তোমার মা দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছে, তোমার বাবাও উদ্বিগ্ন। তুমি তাঁদের এমন একটা অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলে রাখতে পারো না। তোমার জন্যে যদি কিছু করার থাকে, তবে তাঁরা তা নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু তুমি যদি কিছু না বলো, তবে তা করবেনই বা কেমন করে?'

'ওঁরা আমার জন্যে কিছুই করতে পারবেন না,' শেষ অব্দি নিচু গলায় জবাব দিলো আগাতিনা।

'তা হলে আমি...তুমি যদি শুধু আমাকে একটু বলো, তাহলে আমিও চেষ্টা করে দেখবো যদি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

'তুমিও কিছু করতে পারবে না।'

প্রথমেই যে কারণটার কথা আমার মনে হয়েছিলো, এখন সেটাই ফের মনে পড়লো। প্রেম। নিজের মনেই বললাম, ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়লে বাবা-মা'রাই সব চাইতে শেষে তা বুঝতে পারেন: মনে হলো, সারা দিন ঘরে বসে থাকলেও একটা মেয়ে জানলা দিয়ে প্রেম চালিয়ে যেতে পারে। প্রেমের জন্যে যারা আত্মহত্যা করে তাদের ধারণা, কেউ তাদের জন্যে কিছু করতে পারে না এবং মূলত কথাটা সত্যি। তাই সাবধানে প্রশ্ন করলাম, 'যাকে ভাবপ্রবণতার ব্যাপার বলা যায়, তোমার কাজের পেছনে তেমন কোন কারণ ছিলো কি? মানে...তুমি কি প্রেমে পড়েছিলে?'

কেন জানি না, আমি একটা সংক্ষিপ্ত অস্বীকার আশা করেছিলাম। কিন্তু ও যেন খানিকটা ঢিলেঢালা এবং অহেতুক দীর্ঘভাবে জবাব দিলো,

'না, না—সত্যি তা নয়। তাছাড়া প্রেমে পড়বোই বা কার সঙ্গে? তুমি তো আমাকে জানো...' কথা থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসলো আগাতিনা।

সহসা বুঝতে পারলাম, কেন আমি অতটা বিব্রত বোধ করছিলাম। জানার চেষ্টা করলেও, আসলে আমি মনেপ্রাণে সত্যিকারের কারণটা জানতে চাইনি।...তবু অনিচ্ছাসত্ত্বে হলেও ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি নিশ্চিত, যে তুমি আমাকে সত্যি কথা বলছো?'

'কেন আমি তোমাকে সত্যি কথা বলবো না?'

'তা জানি না...বাবা-মাকে তো বলতে না।'

'তুমি...তুমি অন্য জিনিস। তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলবো।'

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। ওকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো, কেন আমি 'অন্য জিনিস' এবং আমি কোন্ ধরনের 'জিনিস'। কিন্তু এবারে আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো না। প্রচণ্ড আলোড়ন আর অস্বস্তি নিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম...জানলার কাছে গিয়ে বাইরের চত্বরের দিকে তাকালাম। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে, কি করছি তা প্রায় না বুঝেই, একটা সিগারেট ধরালাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেলো আগাতিনা অসুস্থ, তাই তক্ষুনি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার ধূমপান করাটা তোমার হয়তো পছন্দ হচ্ছে না, তাই না?'

লক্ষ্য করলাম, খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলো আগাতিনা। ওর চোখ দুটিতে এখন আর অশ্রু নেই, শুধু নরম সোহাগে ভরা। তারপর স্খলিত কণ্ঠে, দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো এক আশ্চর্য সুরে ও বললো, 'না না, তুমি খাও। আমি মোটেই কিছু মনে করবো না।'

এবারে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম, কিন্তু সেটা নিয়ে চিন্তা করা থামাতে পারলাম না। সহজাত প্রবৃত্তিবশেই স্থির করলাম, এতক্ষণ যদি আমি ওকে দিয়ে আসল ব্যাপারটা বলাবার চেষ্টা করে থাকি, তাহলে এখন যথাসম্ভব চেষ্টা করবো যাতে ও সেটা আমাকে না বলে। তাই জানলার কাছে দাঁড়ানো অবস্থাতেই, যাতে ওর মুখের দিকে আমাকে

তাকাতে না হয় সে জন্যে দরজাটার দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে, আস্তে আস্তে বললাম, 'আগাতিনা, তুমি যা করেছিলে তা কেন করেছিলে আমি জানি না। কথাটা তুমি যখন আমাকে বলতে চাও না, তখন আমিও সে জন্যে জোর করতে চাই না। কিন্তু তোমার বোঝা উচিত যে, তোমার মতো এই বয়সে আত্মহত্যা করার পেছনে কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। বুঝতে পেরেছো?'

'হ্যাঁ, মামুসোনা।'

এক মুহূর্ত নীরবতার পর আমি আবার বলতে লাগলাম, 'তুমি যখন ওই কাজটা করেছিলে, তখন তুমি কি তোমার বাবা মা'র কথা—যাঁরা তোমাকে এত ভালোবাসেন, যাঁরা তোমার কাছ থেকে নিশ্চয়ই অত বড় একটা আঘাত পাবার যোগ্য নন—তাঁদের কথা একবারও ভাবোনি? তুমি কি ভেবে গ্যাখোনি যে, ঈশ্বর না করুন তুমি যদি সফল হতে, তাহলে তুমি তাঁদের জীবন দুটোও একেবারে ধ্বংস করে ফেলতে? কারণ তুমি তো জানো আগাতিনা, তাঁরা তোমার মুখ চেয়েই বেঁচে আছেন···তুমি ছাড়া তাঁদের আর কেউ নেই!'

'হ্যাঁ, মামুসোনা।'

শুধু 'হ্যাঁ, মামুসোনা' ছাড়া যেন আর কোন জবাব নেই—ভাবলাম আমি। মুখ বিকৃত করে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেললাম মেঝের ওপরে। তারপর পায়ে করে সেটা চেপে দিয়ে বললাম, 'আমি উপদেশ-টেশ বড় একটা দিতে পারি না। কিন্তু তোমার কাছে আমি শুধু একটি জিনিস চাইছি। তুমি আমাকে কথা দাও, অমন কাজ আর কক্ষনো করবে না।'

'কথা দিলাম, মামুসোনা।'

'আর কথা দাও—যে কারণের জন্যে তুমি ওই কাজ করতে গিয়েছিলে, তা যা-ই হোক না কেন, সে কথা তুমি আর কক্ষনো চিন্তা করবে না···কোন দিনও না। রাজী?'

এবারে আগাতিনা কিছু বললো না, কিন্তু আমিও সেজন্যেই ওর দিকে তাকালাম না। অনুভব করছিলাম, ওর চোখ দুটি আমার দিকে

তাকিয়ে রয়েছে—আমি তাকাতে চাইছিলাম না সেদিকে। অবশেষে বললাম, 'এবারে চলি, এখন আমার বাড়ি যাওয়া উচিত। তুমি বলেই আমার এখানে আসার ইচ্ছে হয়েছিলো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এ সব কোনদিন না ঘটলে আমি বরং দূরেই থাকতাম।'

জানলার কাছ থেকে সরে এসে আমি ফের ওর বিছানার কাছটিতে দাঁড়ালাম। ত্বজনে তাকালাম ত্বজনের দিকে। মনে হলো, যেমন করেই হোক আবার ওর মুখের রঙ ফিরে এসেছে। এখনও যেন আগের চাইতে অনেক কম অবসন্ন আর কম ক্লান্ত। বাস্তবিক, এখন ও আবার আমার ভাগ্নী আগাতিনা হয়ে উঠেছে—যাকে এতদিন আমি কত ভালোবেসেছি! তাই আরও একটু বেশি স্নেহের সুর মিশিয়ে বললাম, 'তুমি তো ভালোই আছো—এবারে উঠে পড়ো তো! যতক্ষণ তুমি বিছানায় থাকবে, ততক্ষণ তোমার মা ত্বশ্চিন্তা করবে। কোন কাজ-টাজ করো গে, মনটাকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করো। আর একটা কথা বলছি, শোনো—' একটু হাসলাম আমি, 'যদি এখনও তেমন কেউ না থাকে, তাহলে অল্পবয়সী কোন ছেলেকে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে বিয়ের ঠিকঠাক করে ফ্যালো।'

ত্বজন ত্বজনের দিকে তাকিয়ে শেষবারের মতো হাসলাম, তারপর হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দিদি বারান্দায় আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে উদ্বিগ্ন সুরে জিজ্ঞেস করলো, 'তোকে কিছু বলেছে?'

'আমাকে কিছুই বলবে না।' বললাম, 'তবে ত্বশ্চিন্তা কোরো না। ওটা তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে আমি বিশ্বাস করি না। ওটাকে কি বলা যায়?…স্রেফ বয়সের ধর্ম।'

'হ্যাঁ, ওর বয়েসটাই তো খারাপ!' এলভিরা উদগ্রীব হয়ে উঠলো, 'কিন্তু ও আমাদের এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলো…এমন হবে তা কে কবে ভেবেছে…অমন শান্তশিষ্ট মেয়ে…'

আরও সামান্য কিছুক্ষণ আমি দিদির কাছে রইলাম। শেষটাতে মনে

খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি—সব কিছুতেই তেতে ওঠা ধাতু, ঘাম আর ধুলোর গন্ধ। গরমে মানুষের মেজাজও গরম হয়, তার অর্থ মানুষ ঝগড়াটে হয়ে ওঠে। বড়লোকরা তখন ইচ্ছে হলে তিনটে বা চারটে ঘর পরে, ফ্ল্যাটের অন্য প্রান্তে চলে যেতে পারে। কিন্তু গরিবকে তেল-তেলে পিরিচ আর নোংরা গ্লাসের মধ্যে সার্ডিন মাছের মতোই গাদাগাদি করে থাকতে হয়, নয়তো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয়।

এমনি এক গ্রীষ্মের দিনে পুরো সংসারটার সঙ্গেই আমার তুমুল ঝগড়া হয়ে গেলো। বউয়ের সঙ্গে হলো, কারণ ঝোলটা লবণপোড়া আর প্রচণ্ড গরম ছিলো। শালার সঙ্গে হলো, কারণ সে আমার বউয়ের পক্ষ নিয়েছিলো—এবং আমার মতে তার সে অধিকারই নেই, কারণ সে নিজে বেকার এবং আমার ওপরেই নির্ভর করে রয়েছে। শালীর সঙ্গে হলো, কারণ ও আমার হয়ে লড়েছিলো এবং তাতে আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম—কারণ আমি জানতাম, আমার প্রেমে পড়েছে বলে এটা ও নেহাতই ছেনালীপনা করছে। মায়ের সঙ্গে হলো, কারণ মা আমাকে ঠাণ্ডা করে তুলতে চেষ্টা করেছিলো। বাবার সঙ্গে হলো, কারণ বাবা এসবে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, উনি শান্তি মতো খাওয়াদাওয়া করতে চান। এমন কি আমার পুঁচকে মেয়েটার সঙ্গেও হলো, কারণ বেচারী কান্নায় একেবারে ফেটে পড়েছিলো।···তাই আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে, কুর্সি থেকে জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে, আমি সহজ ভাষায় বললাম, 'শুনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকের ওপরে আমার বিরক্তি ধরে গেছে। অতএব অক্টোবর মাসে, যখন ঠাণ্ডা পড়বে, তখন অব্দি বিদায়।' এই বলে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। বউ বেচারী আমার পেছন পেছন ছুটে এসে, রেলিঙ ধরে নিচের দিকে ঝুঁকে চিৎকার করে জানালো যে আজ শশার স্যালাড হয়েছে—যা আমি ভীষণ ভালোবাসি। ওকে সেটা খেয়ে নিতে বলে আমি রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

আমরা ভিয়া অস্টিয়েন্সে বাস করি। রাস্তা পার হয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আমি লোহার সেতুটার দিকে এগিয়ে গেলাম, যার খুব কাছেই

রোমের নদী-বন্দর। তখন বেলা ত্নটো, দিনের সব চাইতে গরম সময়। আকাশটা যেন ঘুষি খেয়ে কালশিরা-পড়া চোখের মতো নীল। সেতু-টাতে পৌঁছে, সেটার পেরেক বসানো লোহার বেস্টনিটা ধরে আমি ঝুঁকে দাঁড়ালাম। তেতে রয়েছে বেস্টনিটা। পাড়ঘাটার বিশাল ঢালু পাঁচিলের মাঝখানে বন্দী হয়ে টাইবার একেবারে নিচে পড়ে রয়েছে—ঠিক যেন একটা খোলা নর্দমা, তেমনি ঘোলাটে রঙ। আগুনে পোড়া বাড়ির কঙ্কালের মতো গ্যাসোমিটার, গ্যাস ফ্যাক্টরির চুল্লি, গবাদি পশুর ভোজ্য সবুজ শস্য সংরক্ষণ করে রাখার বায়ুবিহান সাইলো মিনার, পেট্রল ট্যাঙ্কের অসংখ্য নল, বিত্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ছুঁচলো ছাদ—সব কিছু দিগন্তরেখাকে এমনভাবে ঢেকে রেখেছে যে মনে হয় এটা যেন রোম নয়, উত্তর দিকের কোন শিল্পনগরী। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমি টাইবারের দিকে তাকিয়ে রইলাম—ছোট্ট, হলদে রঙের টাইবার··· পাড়ঘাটার কাছে সিমেণ্টের থলে বোঝাই একটা বজরা। ভেবে হাসি পেলো যে, নানা আকৃতির জাহাজে বোঝাই জেনোয়া আর নেপলস বন্দরের মতো এই পুঁচকে নদীটাও নিজেকে একটা বন্দর বলে জাহির করে। এই ছোট্ট বন্দরটা থেকে সত্যি সত্যি পালাতে চাইলে আমি হয়তো ফিউমিসিনোতে চলে যেতে পারতাম, সেখানে বসে সমুদ্রের দৃশ্য দেখতে দেখতে মজা করে মাছ ভাজা খেতে পারতাম। যাই হোক, অবশেষে আমি আবার চলতে শুরু করলাম—সেতু পেরিয়ে এগুতে লাগলাম নদীর অন্য পাড়ে ছড়িয়ে থাকা খোলা গ্রামের দিকে। যদিও কাছাকাছি থাকি, কিন্তু এ অঞ্চলটাতে আমি কোন দিনই আসিনি—কোথায় চলেছি, তাও আমি জানতাম না। প্রথমটাতে একটা রাস্তা ধরেই হাঁটছিলাম, এখানে-সেখানে আবর্জনা ছড়িয়ে থাকা ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে গেলেও আসলে সেটা অ্যাসফল্ট বিছানো রাস্তাই বটে। তারপরে রাস্তাটা একটা মেঠো পথ হয়ে গেলো, আবর্জনাগুলো উঁচু হয়ে উঠলো ছোটখাটো টিলার মতো। বুঝতে পারলাম, সমস্ত রোমের জঞ্জাল যেখানে এনে ফেলা হয়, আমি দৈবক্রমে ঠিক সেখানটাতেই

এসে হাজির হয়েছি। কোথাও একফালি সবুজ চোখে পড়ে না—চোখ-ধাঁধানো আলোয় আবর্জনার কটু দুর্গন্ধের সঙ্গে শুধু নোংরা কাগজের টুকরো, মরচে-ধরা টিন, বাঁধাকপির ডাঁটি আর অন্যান্য জঞ্জাল ছাড়া কিছুই নেই এখানে। আমি আত্মহারা আর হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম—যেন আমার আর সামনে এগুবার বাসনা নেই, অথচ সেই সঙ্গে ফিরে যাবারও কোন ইচ্ছে নেই। ঠিক তক্ষুনি শুনলাম, কুকুরকে ডাকার মতো করে কে যেন 'আঃ…আঃ' করে ডাকছে।

কুকুরটা কোথায় থাকতে পারে দেখার জন্যে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। কোথাও কোন কুকুর নেই, যদিও এ রকম আবর্জনাময় অঞ্চলই বেওয়ারিস কুকুরদের পক্ষে সঠিক জায়গা। তাই আমাকেই কেউ ডেকেছে মনে করে, যে দিক থেকে ডাকটা এসেছিলো আমি সে দিকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, আবর্জনার স্তূপের পেছনে করোগেটের লোহায় ছাওয়া ছোট্ট একটা নুয়ে-পড়া খুপরি রয়েছে, যেটা আমি আগে লক্ষ্য করিনি। সাদা চুলের একটা বাচ্চা মেয়ে—হয়তো বছর আষ্টেক বয়েস—দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমাকে হাত তুলে ডাকছিলো। আমি ওর দিকে তাকালাম। মেয়েটির মুখটা ফর্সা, নোংরা, চোখের কোলে বড়-সড় মেয়েদের মতো লালচে দাগ। চুলগুলো খড়ের টুকরো আর ধুলোয় বোঝাই বলে, মাথাটাকে মনে হয় যেন বুরুশ লাগানো একটা ফোলানো বেলুন। ওর পোশাকটা খুবই সরল—একটা চটের থলিতে চারটে ফুটো করে নেওয়া হয়েছে, দুটো হাত আর দুটো পায়ের জন্যে। আমি ঘুরে দাঁড়াতেই মেয়েটা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি ডাক্তার?'

'না,' আমি জবাব দিলাম। 'কেন? তোমার কি ডাক্তারের দরকার?'

'ডাক্তার হলে তুমি একটু ভেতরে এসো,' মেয়েটি বললো, 'আমার মা'র অসুখ।'

আমি যে ডাক্তার নই, সে কথা মেয়েটাকে আর বোঝাবার চেষ্টা করতে ইচ্ছে করছিলো না। তাই খুপরিটার ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম।

প্রথমটাতে মনে হলো, আমি নিশ্চয়ই ক্যামপো দি ফিওরির কোন হাত-ফেরতা জিনিস বিক্রির দোকানে ঢুকে পড়েছি। সমস্ত জিনিসপত্রই ঘরের মধ্যে ঝুলছে—পোশাক-আশাক, মোজা, জুতো, গৃহস্থালীর বাসন-কোসন, কম্বল—সব কিছু। তারপর বুঝলাম, এগুলো এদেরই জিনিস…কোন আসবাবপত্র নেই বলে দেয়ালে পেরেক গেঁথে ঝুলিয়ে রেখেছে। ওই ঝুলন্ত বস্তুগুলোকে এড়াবার জন্যে আমি যখন মাথা নুইয়ে এদিক সেদিকে গিয়ে মেয়েটার মাকে খুঁজছি, তখন মেয়েটা আমাকে প্রায় একটা চোরা ভঙ্গিমাতে এক কোণে একটা কাঁথা-কাপড়ের স্তূপ দেখিয়ে দিলো। কাছে গিয়ে দেখি, ওই কাঁথা-কাপড়ের স্তূপটা একটা মাত্র জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে—অন্য চোখটা একগুচ্ছ ধূসর চুলে ঢাকা। মেয়েমানুষটাকে দেখে আমি স্রেফ হতভম্ব হয়ে গেলাম—ওকে দেখতে একটা বুড়ীর মতো, কিন্তু যে কেউই বুঝবে আসলে ওর বয়েস বেশি নয়।

আমাকে দেখেই ও বলে উঠলো, 'তাহলে ফের আমাদের দেখা হলো।'

বাচ্চাটা তাই শুনে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লো, যেন এটা কোন মজাব দৃশ্যের সূত্রপাত। তারপর মাটিতে উবু হয়ে বসে কতকগুলো খালি কৌটো নিয়ে খেলতে শুরু করলো।

'সত্যিই আমি তোমাকে চিনি না,' আমি বললাম। 'কিন্তু তোমার কি হয়েছে? এই বাচ্চাটা কি তোমার মেয়ে?'

'অবশ্যই…তোমারও মেয়ে।'

বাচ্চাটা মাথা নুইয়ে নিজের মনে ফের হেসে উঠলো। আমি ভাবলাম এ সমস্ত নিশ্চয়ই রসিকতা। তাই জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, হয়তো ও আমার মেয়ে। কিন্তু অন্য কারুর মেয়েও বটে।'

'না।' মেয়েমানুষটা মেঝে থেকে অর্ধেক উঠে, আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'ও তোমার মেয়ে, আর কারুর নয়।…তুমি একটা অলস, কুঁড়ে, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া কাপুরুষ।'

এ সব অপমানজনক কথাবার্তা শুনে বাচ্চাটা প্রাণ খুলে হাসতে শুরু করলো, যেন ঠিক এমনটিই হবে বলে ও আশা করেছিলো। রীতি-মতো অপমানিত বোধ করে আমি বললাম, 'সাবধান হয়ে কথা বলো। আমি তো আগেই বলেছি, আমি তোমাকে চিনি না।'

'তুমি আমাকে চেনো না, না?…তুমি আমাকে চেনো না, কিন্তু ঠিক ফিরে এসেছো।…যদি আমাকে না-ই চেনো, তাহলে বাড়ির রাস্তা চিনলে কি করে?'

'দায়িত্ব এড়ানো কা-পুরুষ…কা-পুরুষ…' বাচ্চাটা নিচু গলায় সুর করে বলতে শুরু করলো।

খানিকটা গুমোট গরম আর খানিকটা অস্বস্তির জন্যে আমি তখন ঘামতে শুরু করেছি। বললাম, 'আমি এ দিক দিয়েই যাচ্ছিলাম।'

'এই হাঁদাটা', মেয়েমানুষটা বাচ্চাটার দিকে ফিরে বললো, 'আমাকে ব্যাগটা দে।' বাচ্চাটা দেয়াল থেকে নোংরা, ভাঙা, কালো মখমলের একটা হাতব্যাগ নামিয়ে এনে ওকে দিলো। ব্যাগ থেকে একটুকরো কাগজ বের করে মেয়েমানুষটা বললো, 'এই যে বিয়ের প্রমাণ-পত্র… এলভিরা প্রোয়েত্তি এবং এরনেস্তো রাপেল্লি।…তুমি কি এখনও এটা অস্বীকার করো, এরনেস্তো রাপেল্লি?'

ব্যাপারটাতে আমি চমকে উঠলাম, কারণ সত্যিই আমার নাম এর-নেস্তো। খানিকটা বিব্রত হয়ে বললাম, 'কিন্তু আমি রাপেল্লি নই।'

বাচ্চা মেয়েটা তখন গুনগুন করে গান করছে, 'এরনেস্তো…এর-নেস্তো।' মেয়েমানুষটা উঠে দাঁড়ালো। আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম —ধূসর চুল, অসংখ্য বলিরেখা এবং দাঁতের সম্পূর্ণ অভাব সত্ত্বেও এটা স্পষ্ট যে, ওর বয়েস তিরিশের বেশি নয়।

'তুমি রাপেল্লি নও?' কোমরে হাত রেখে ও আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'তুমি রাপেল্লি…আমি ঈশ্বর আর মানুষের কাছে শপথ করে বলছি, তুমি রাপেল্লি

'এবারে বুঝতে পারছি, তুমি ঠিক সুস্থ নেই।' বললাম, 'কিছু যদি মনে না করো তো আমি এবার যাই।'

'একটু দাঁড়াও, এত তাড়াতাড়ি নয়—'

ইতিমধ্যে বাচ্চাটা মহা আনন্দে আমাদের ঘিরে নাচতে শুরু করেছে। মেয়েমানুষটা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ফের বলতে শুরু করলো, 'এরনেস্তো, সেই মহান এরনেস্তো···যে বউ-বাচ্চা ফেলে রেখে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো, একটা বছর যাকে আর দেখা যায়নি।···এই একটা বছর, যখন তুমি ছিলে না, তখন এই বাচ্চাটা আর আমি···আমরা কিভাবে বেঁচে থেকেছি জানো?'

'জানি না', আমি রূঢ় স্বরে বললাম, 'এবং জানতে চাইও না।··· যেতে দাও আমাকে।'

'ওকে বলে দে,' চিৎকার করে ও বাচ্চাটাকে বললো, 'ওকে বলে দে আমরা কিসের ওপরে বেঁচে রয়েছি···বলে দে তোর বাপকে—'

'দয়ার ওপরে,' এবারে বাচ্চাটা আমার কাছাকাছি এসে উচ্ছল ভঙ্গিমায় টানা-টানা সুরে বললো।

স্বীকার করতেই হয়, আমি তখন সত্যি সত্যি মুশকিলে পড়েছি বলে মনে করতে শুরু করেছি। আমার নাম এরনেস্তো, আমিও বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি এবং আমারও বউ-মেয়ে আছে—ঘটনাচক্রের এই সব কটা মিল আমার মধ্যে একটা বিচিত্র অনুভূতি জাগিয়ে তুললো। মনে হলো আমি যেন আর আমি নেই—অথচ সেই একই সঙ্গে আমি আমিই রয়েছি, কিন্তু স্বাভাবিকের তুলনায় খানিকটা আলাদাভাবে। ইতিমধ্যে মেয়েমানুষটা আমার দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা দেখে ঠিক আমার নাকের সামনেই চিৎকার করতে শুরু করেছে, 'যে সমস্ত পুরুষমানুষ বউ বাচ্চা ফেলে রেখে পালায়, তাদের কি হয় জানো? তাদের কয়েদখানায় ঢোকানো হয়···বুঝেছো, বদমাশ কোথাকার? কয়েদ···'

এবারে আমি ভয় পেতে শুরু করলাম এবং কোন কথা না বলে কেটে পড়ার মতলবে দরজার দিকে ফিরলাম। কিন্তু দোরগোড়ার কাছ

থেকে আর একজন তখন আমাদের দিকে তাকিয়েছিলো—রোগা-পাতলা আর একটি মেয়েমানুষ···গরিব কিন্তু পোশাক-আশাক দিব্যি পরিচ্ছন্ন। আমার হতভম্ব অবস্থা দেখে সে বললো, 'ওর কথায় কান দেবেন না···ওর ধারণা যে পুরুষমানুষকেই ও দেখতে পায়, সে-ই ওর স্বামী। আর ওই বাঁদর মেয়েটা স্রেফ ওর মার চিৎকার শুনে মজা পাবার জন্যে যে-ই বাড়ির কাছ দিয়ে যায় তাকেই বদমাইশি করে ভেতরে নিয়ে আসে।···দাঁড়া ডাইনি ছুঁড়ি, তোকে আমি দেখাচ্ছি···' যেন বাচ্চাটাকে চড় মারবে বলেই মেয়েমানুষটা হাত তুললো। কিন্তু বাচ্চাটা চট করে ওকে এড়িয়ে গিয়ে, আমাকে ঘিরে নাচতে শুরু করলো—মনের আনন্দে বারবার বলতে লাগলো, 'তুমি বিশ্বাস করেছো? করোনি? ···তুমি বিশ্বাস করে—ছো···তুমি ভয় পেয়ে—ছো···তুমি ভয় পেয়ে—ছো।'

'এলভিরা, ইনি তোমার স্বামী নন,' পাতলা মেয়েমানুষটি শান্ত গলায় বললো। সঙ্গে সঙ্গে যেন কথাটার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে, এলভিরা ঘরের একটা কোণে গিয়ে উবু হয়ে বসে পড়লো। আমি যেখানে ছিলাম আমাকে সেখানেই রেখে, অন্য মেয়েমানুষটিও খুপরির ভেতরে ঢুকে পড়লো। তারপর পেছন দিকে গিয়ে একটা রান্নার স্টোভ সাফ-সুফো করতে শুরু করলো। আমাকে ও বুঝিয়ে বললো, 'আমিই ওকে কিছু খেতে-টেতে দিই। এ কথা সত্যি যে ওরা দয়া-ধর্মের ওপরেই বেঁচে রয়েছে। কিন্তু ওর স্বামী পালিয়ে যায়নি···মারা গেছে···'

যথেষ্ট হয়েছে মনে করে আমি পকেট থেকে একটা একশো লির্যার নোট বের করে বাচ্চাটাকে দিলাম। বাচ্চাটা ধন্যবাদ-টন্যবাদ না দিয়েই সেটা নিয়ে নিলো। আমি তখন খুপরি থেকে বেরিয়ে, মেঠো পথ পেরিয়ে আবার সেই অ্যাসফল্ট বিছানো রাস্তাটাতে গিয়ে উঠলাম। তারপর সেতু পেরিয়ে ফিরে এলাম ভিয়া অস্টিয়েন্সে। খুপরির ভেতরকার গরমের পরে নিজের বাড়িতে ফিরে মনে হলো যেন ঠাণ্ডা একটা নকল গুহায় এসে ঢুকলাম। এবং যদিও আমাদের সামান্য কটি আসবাব সবই খুবই নগণ্য

ধরনের, কিন্তু ওই হতভাগ্য জীব দুটি যেভাবে পেরেকের গায়ে ওদের ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো ঝুলিয়ে রাখে—তার তুলনায় এগুলো অনেক ভালো। রান্নাঘরের টেবিল ইতিমধ্যে সাফ করা হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আমার গিন্নী আমার জন্যে কিছুটা শশার স্যালাড আলাদা করে রেখে দিয়েছিলো—সেটা ও বের করে দিলো। কয়েকটা রুটি দিয়ে সেগুলো খেতে খেতে আমি লক্ষ্য করলাম, ও সিঙ্কের কাছে দাঁড়িয়ে থালা ছুরি আর কাঁটা-চামচগুলো ধুয়ে রাখছে। আমি উঠে গিয়ে চুপিচুপি ওর ঘাড়ে একটা চুমু দিলাম, অতএব আমাদের শান্তি স্থাপন করা হয়ে গেলো।

কয়েক দিন পরে আমি স্ত্রীকে ওই খুপরির গল্পটা বললাম এবং তারপর ঠিক করলাম, ফের ওখানে গিয়ে দেখবো ওই বাচ্চা মেয়েটার জন্যে কিছু করা যায় কি না। এখন আমার আর এরনেস্তো রিপেল্লি বলে ভুল হওয়ার কোন ভয় নেই। কিন্তু বিশ্বাস করবেন? আমি সেই খুপরি, সেই মেয়েমানুষটা, সেই বাচ্চাটা—কাউকেই খুঁজে পেলাম না। এমন কি অন্য যে রোগা-পাতলা মেয়েমানুষটি ওদের রান্না করে দিয়েছিলো, তাকেও না। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চোখ-ধাঁধানো রোদ্দুরে আবর্জনার স্তূপের মধ্যে আমি ঘুরে বেড়ালাম, তারপর হার স্বীকার করে ফের বাড়িতে ফিরে এলাম। আমার ধারণা, আমি নিশ্চয়ই সঠিক রাস্তাটা খুঁজে বের করতে বিফল হয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী বলে, ওকে ত্যাগ করার চিন্তায় বিবেক-দংশন থেকে আমি নিজেই ওই কাহিনীটা কল্পনা করে নিয়েছিলাম।

ঘুমের বড়ির শিশিটা তুলে নিয়ে, আমি তার পুরোটাই জলের গ্লাসের মধ্যে খালি করে ফেললাম। গ্লাসটা আমার খাটের পাশে ছোট্ট টেবিল-টার ওপরে রয়েছে। কতগুলো বড়ি ছিলো শিশিটাতে ? বেশ কয়েকটা —কোথাও না থেমে একবারে আমাকে নন্দনকাননে নিয়ে যাবার লম্বা রাস্তাটা পাড়ি দেবার পক্ষে যথেষ্টের চাইতেও বেশি। বড়িগুলোর গলে যাওয়া লক্ষ্য করছিলাম আমি। গ্লাসের নিচে সামান্য খানিকটা সাদা তলানি পড়েছিলো আর একরাশ ছোট ছোট বুদবুদ ভেসে উঠেই ফেটে যাচ্ছিলো তক্ষুনি। ঠিক সেই মুহূর্তে দূরভাষটা বেজে উঠলো। গলা শুনে বুঝলাম, মাগদা—আমার গোলগাল প্রিয় বান্ধবী। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'তুমি আমাকে বিদায় জানাবার জন্যে ঠিক সময়টিতেই টেলি-ফোন করেছো।'

'কেন ?'

'আমি এক্ষুনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম।'

মাগদা এমন একটি মানুষ যে কোন দিনই কোন কিছু[illegible] অবাক হয় না। হয়তো সে জন্যেই আমরা পরস্পরের বন্ধু। আমি নিজে সর্বদা সব কিছুতেই অবাক হই। যা আমাকে অবাক করে, মূলত সেটা তেমন কিছু নয়—তার অস্তিত্বটাই সব। যেমন ধরা যাক: একটা পাথরের মুখোমুখি হয়ে আমি থমকে দাঁড়াই, অপার বিস্ময়ে ডুবে যাই। 'পাথর' বলে একটা জিনিস থাকবে, এটা কি করে সম্ভব ? অন্য দিকে মাগদার কাছে পাথর শুধুমাত্র পাথরই—ব্যাস। বস্তুত এখন ও যেন আমার কথা শুনতেই পায়নি, এমনি অনমনীয়ভাবে বলতে লাগলো, 'আমি তোমাকে যা বলার জন্যে টেলিফোন করছি তা হচ্ছে, ওরা সবাই এখানে আমার ফ্ল্যাটে রয়েছে এবং সবাই তোমাকে আশা করছে।'

'কে কে আছে?'

'জুলিয়াস সিজার, লিয়োনার্দো দা ভিনচি, দান্তে আলিঘেরি, জুসেপ্পি গ্যারিবলদি আর নেপোলিয়ন।'

আমি যেন রসিকতাটা দেখতে পাচ্ছি না, এমনি ভান করে জবাব দিলাম, 'ঠিক আছে, আমি তৈরি হয়ে আসছি।'

গ্রাহযন্ত্রটা নামিয়ে রেখে যে চাদরটা গত দুদিন ধরে আমার শরীর-টাকে জড়িয়ে রেখেছিলো, বেশ খানিকটা কষ্ট করে সেটার আবরণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলাম। মেঝেতে পা ফেলতেই আমার পোষা ড্যাক্‌শুনড কুকুর জেন আমাকে ঘিরে লাফাতে শুরু করলো। আট-চল্লিশ ঘণ্টা অন্ধকারে অচল অবস্থায় কাটাবার পর হতভাগা জন্তুটা আশা করেছিলো, আমি ওকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি। 'না জেন, না।' বললাম, 'তুমি লক্ষ্মী কুকুর হয়ে শুয়ে থাকো।' তারপর জন্তুটাকে শান্ত করার জন্যে ট্রেতে পড়ে থাকা শেষ বিস্কুটটা ওকে খেতে দিলাম। দুদিন ধরে জেন আর আমি শুধু চা আর বিস্কুটের ওপরেই রয়েছি। ড্যাক্‌শুনডটা মোটা-মুটি আমার চাইতে বেশিই খেয়েছে। কিন্তু আমি এতটুকুও অসুস্থতা অনুভব করিনি, বরং ঠিক তার উলটোটাই।...স্নানঘরে ঢুকে ধারাযন্ত্রটা ঘুরিয়ে দিলাম, চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম উষ্ণ জলের ধারার নিচে। জলগুলো যখন ঘাড়ের ওপরে ছিটকে পড়ছে, তখন বিদ্যুৎ চমকের মতো আমি একটা বিচিত্র নকশা দেখতে পেলাম—যা আমি নিজের শরীরে আঁকবো। ছবিটা একেবারে স্পষ্ট, নকশাটার প্রতিটি খুঁটিনাটি আমি বিশদভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম, যেন ইতিমধ্যেই আমি সেটাকে এঁকে ফেলেছি।

ধারাযন্ত্র বন্ধ করে, গা মুছে, নগ্ন অবস্থাতেই বিছানায় গিয়ে বসলাম। তারপর প্রসাধনী পেন্সিলের বাক্সটা নিয়ে পেটের ওপরে নকশাটা আঁকতে শুরু করলাম। নাভিটাকে আঁকলাম একটা চোখের মতো, তাতে নীল মণি আর কালো ভুরু। তারপর আস্তে আস্তে সমস্ত পেট জুড়ে চোখটাকে ঘিরে দিলাম লাল নীল সবুজ আর হলুদ রঙের সম-

কেন্দ্রিক ঢেউ-দোলানো আরবীয় নকশা দিয়ে। আরবীয় নকশাটার পেছনে, যেন সমুদ্র-ঢেউয়ের পেছনে, আঁকলাম একজন ভারতীয় ঋষির মুখ। ঋষির চোখ একটা—যেটা আমার নাভি, বাঁকা নাকে দুটো বিশাল গর্ত—যা আমার পেটের ভাঁজ, এবং বিশাল একজোড়া কালো গোঁফ ও সরু দাড়ি—যা আমার যৌনকেশের গোপন ত্রিভুজ। পেট শেষ করে এবারে আমি বুকের দিকে এগুলাম। কালো পেন্সিল দিয়ে পাঁজরের ওপরে কতকগুলো দাগ টেনে দিলাম, ঠিক মধ্যযুগীয় প্রলয়-নৃত্যে মৃত্যুর চেহারার মতো। তারপর বুক। যদিও আমি সাপের মতো নরম ও ছিপছিপে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার স্তনদুটি মাই-খাওয়ানো আয়াদের মতো বিশাল। এ ধারে একটা, ও ধারে একটা—দুটো লম্বাটে নিটোল স্তন যেন বিশাল দুটো কুমড়ো। ইচ্ছে ছিলো ওদের ওপরে বেশ কয়েকটা হাত এবং পা সহ দুটো নৃত্যরত বিষ্ণুমূর্তি আঁকবো, স্তন-বৃন্ত দুটি হবে হাত-পাগুলোর কেন্দ্রভূমি। কিন্তু চিন্তা করে স্থির করলাম, এখন অতশত আঁকার সময় নেই। তাই খানিকটা সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ায় স্তন দুটোর একটাতে সবুজ অন্যটাতে লাল রঙ চড়িয়ে দিলাম, সেই সঙ্গে স্তনবৃন্ত দুটির একটি হলো লাল অন্যটি সবুজ। গোটাকতক নীল এবং লাল রঙের গ্রন্থি এঁকে হাত দুটোর কাজ ঝটিতি সেরে নিলাম। তারপর বাঁ হাতে আঁকলাম একটা হলদে রঙের বিস্ময়বোধক চিহ্ন আর ডান হাতে রক্তবর্ণের জিজ্ঞাসা চিহ্ন। এবারে মুখের দিকে এগুলাম। পাউডার মাখলাম প্রায় ধূসর রঙের, বিনা রুজে। কয়েকটা কালো রঙের বলয় এঁকে চোখ দুটোকে করে তুললাম কোটরাগত। ভাগ্যিস আমার চুল-গুলো লম্বা, এবং খোলাই থাকে। তাই শুধু দু-একবার ব্রাশ চালাবারই প্রয়োজন ছিলো।···ড্যাক্‌শুন্‌ড্‌টা এতক্ষণ যেন ভাবাবেশভরে আমার দিকে তাকিয়েছিলো। আমি ওকে যে শেকলটা পরিয়ে বেড়াতে নিয়ে যাই, এবারে বেচারী জন্তুটা সেটা মুখে নিয়ে আমার কাছে এসে হাজির হলো। শেকলটা ওর মুখ থেকে খুলে নিয়ে আমি ওকে একটু আদর করে চাপড়ে দিলাম, তারপর পোশাক পরতে শুরু করলাম।

প্রথমে পরলাম কালো মখমলের একটা পাতলুন। পাতলুনের পায়ের ঘের ছুটো বিশাল চওড়া, কিন্তু কোমরটা নিচু—ফলে আমার ছবি আঁকা পেটটা খোলাই রইলো। লাল রঙের বিরাট বগ্‌লস্‌ লাগানো হলদে চামড়ার একটা কোমরবন্ধনীও পরলাম। তারপর সোনালী তারা-বসানো স্বচ্ছ একটা কালো ব্লাউজ বেঁধে নিলাম বুক ছুটোর নিচে। ফলে অর্ধেক সবুজ আর অর্ধেক লাল স্তন ছুটো যেন প্রাচুর্যে আরও উপচে উঠলো। গলায় ঝোলালাম পাঁচ ছড়া হার—যেগুলোর দাম সামান্য, কিন্তু দার্শনিক গুরুত্ব অনেক। হিমালয়ের কোলে বড়সড় একটা গ্রাম থেকে হারগুলো আনা হয়েছিলো। যে ছেলেটি আমাকে ওগুলো এনে দিয়েছিলো, সে ওখানে ছু মাস ছিলো এবং ন্যাবারোগে আক্রান্ত হয়েছিলো। আঙুলে পরলাম আমার বিখ্যাত আংটিগুলো, প্রতি আঙুলে তিনটে করে। ওগুলোর মধ্যে একটাতে ডিম্বাকৃতি একটা ফ্যাকাশে লাল রঙের পাথর, তাতে রামধনুর মতো সবুজের ঝিলিক। সবশেষে ব্লাউজের ওপরে পরে নিলাম বেগনি মখমলের একটা ঢিলে অঙ্গাবরণ।

কিন্তু মুশকিল হলো কুকুরটাকে নিয়ে। ওটাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইছিলাম না। কারণ বিশেষ করে মাগদার ওখানে, একটা সন্ধ্যে কিভাবে শেষ হতে পারে, তা কেউই জানে না। এমন কি জেনকে আমি হারিয়েও ফেলতে পারি। তাই ওকে লেজ নাড়তে নাড়তে আমার সঙ্গে দরজার দিকে এগুতে দেখে কঠোর গলায় বললাম, 'না জেন, তুমি লক্ষীটি হয়ে এখানে থাকো। কোন কারণেই ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ো না।' কিন্তু দমটা বৃথাই নষ্ট হলো, হোটেলের হলঘরে ঢুকতেই জেনের হিংস্র চিৎকার শুনতে পেলাম। বাড়ির মালিকটা একটা বিচ্ছিরি ধরনের মানুষ—মাথায় জলচর কুটপাখির মতো টাক, কবর খননকারীদের মতো মুখ আর সেপাইদের মতো মোটা গর্দান। কোত্থেকে জানি না, হঠাৎ উনি ছুম করে হাজির হয়ে বললেন, 'সিনোরিনা, এ কিন্তু সত্যিই চলবে না। এখন রাত একটা, আর আপনার কুকুরটা চেঁচামেচি করে বাড়ি সুদ্ধ

সবাইকে জাগিয়ে দিচ্ছে। যান—ওকে গিয়ে থামান, নয় তো···' লোকটার দিকে দ্রুত হাত-টাত নেড়ে বললাম, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে ··আপনি দয়া করে আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন।'···ফিরে গিয়ে ঘরের দরজাটা খুলে দেখি, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কুকুরটা করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যে জলের মধ্যে খানিকক্ষণ আগেই ঘুমের বড়িগুলো গুলেছিলাম, তার থেকে একটা বড় অংশ আমি একটা পিরিচে ঢাললাম। তারপর সেটার সঙ্গে একটু দুধ আর তিন প্যাকেট চিনি মিশিয়ে দিলাম। ক্ষুধার্ত কুকুরটা পরম বিশ্বাসে তক্ষুনি সেটা চেটেপুটে খাবার জন্যে ছুটে এলো এবং আমি সেই সুযোগে টুক্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাড়ির মালিককে বললাম, 'দেখবেন, এখন ওটা আর চেঁচাবে না।'

এক লাফে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম। নিজেকে আসনের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে বললাম, 'মাগদার বাড়িতে চলো।' ট্যাক্সির চালক জিগেস করলো, 'মাগদা কে?' আমি অধৈর্য হয়ে উঠলাম, 'মাগদা কে—মানে? আমরা কি এখনও সেই অবস্থায় রয়েছি নাকি? পৃথিবীতে কেউই কিছু নয়। তবু তুমি জানতে চাইছো বলেই বলছি, মাগদা আমার সব চাইতে প্রিয় বান্ধবী।' হোটেলের মালিক বাদে আমি সবাইকেই 'তুমি' করে কথা বলি। কিন্তু এমন অনেক মানুষই আছে, যারা সেটাকে ভালোবাসার 'তুমি' বলে ভুল করে। ট্যাক্সি-চালকটি এদের মধ্যেই একজন। সত্যি সত্যি লোকটা আমার দিকে বিস্ময় এবং খানিকটা ধূর্ততার দৃষ্টিতে এক ঝলক তাকিয়েও নিলো। তারপর জিগেস করলো, 'তা, সে থাকে কোথায়?' রাগে আমি লোকটার দিকে হাত নাচিয়ে বললাম, 'গাড়ি চালিয়ে সোজা চলো, শেষটাতে পৌঁছে মাগদার দেখা পাবে।' আসল কথা হচ্ছে, আমি ওর ঠিকানাটা ভুলে গিয়েছিলাম। আর একটা জিনিস ভুলে গেলে মানুষ সেটা মনে করার জন্যে কি-ই বা করতে পারে? গাড়ির চালক ঘন রঙের একটি যুবা পুরুষ, দেখতে মোটেই মন্দ নয়। লোকটা এবারে হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে

রইলো—যেন সত্যি সত্যি ভাবতে লাগলো, মাগদা কোথায় থাকে। তারপর আমাকে খুশী করার আগ্রহে দ্রুত ইঞ্জিন চালু করে গিয়ার চাপালো এবং আমরা চলতে শুরু করলাম।

রাস্তার প্রতিটা বাঁকে আমাকে আসনের এপাশে ওপাশে ছুঁড়ে ফেলে ট্যাক্সিটা সশব্দে এগিয়ে চলছিল আর আমি মনে করার চেষ্টা করছিলাম, সামান্য কিছুক্ষণ আগেই কোন্ কারণে আমি নিজেকে খুন করতে চাইছিলাম। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তেই আমি আসতে পারছিলাম না। তবে প্রধান কারণটা হয়তো এই যে: তিনদিন আগে আমি মাগদাকে বলেছিলাম, আমি ওই কাজটা করতে চাইছি। কিন্তু এই কারণটা—বলতে গেলে প্রধান কারণটা—আমি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। আপাত-দৃষ্টিতে এটা অবশ্যই একটা দার্শনিক ব্যাপার। কারণ আজকালকার দিনে মানুষ দার্শনিক উদ্দেশ্যেই বেঁচে থাকে এবং তাই মারাও যায়। আমি মাগদার ওখানে যাবো, নাচবো—ধরা যাক ভোর পাঁচটা অব্দিই নাচবো—তারপর হোটেলে ফিরে এসে ঘুমের ওষুধ খাবো। অর্থাৎ আমার মৃত্যুটা স্থগিত রইলো মাত্র।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্যাক্সিটা থামলো। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমরা শহরতলিতে পৌঁছে গেছি। কোন আলোকস্তম্ভ নেই, একটা বেড়া ঝোপ, কিছু গাছগাছালি আর আর গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ফর্সা হয়ে ওঠা একটা আঁকাবাঁকা গলি। ট্যাক্সি-চালক গাড়ি থেকে নেমে পেছনের দরজাটা খুললো এবং আমার পাশে বসে স্পষ্টতই আমাকে অপমান করার উদ্দেশ্যে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোকটা আমার গায়ের সোনালী তারা-আঁকা স্বচ্ছ ব্লাউজটা ধরে এক-টানে ছিঁড়ে ফেললো এবং সেই সঙ্গে কটিবন্ধের বগ্‌লস্‌টাও খুলে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো। আমিও প্রাণপণে লোকটাকে বাধা দিতে লাগলাম এবং শেষটায় হাঁটু দিয়ে ওর পেটে এক গুঁতো মেরে ট্যাক্সির অন্য ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তারপর শান্তভাবেই বললাম যে মাগদার বাড়িতে পৌঁছে সে-ও ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে ওখানে

গিয়ে উঠতে পারে, এক পাত্র মদ পান করতে পারে, নাচতে পারে এবং আমাদের সঙ্গে থাকতেও পারে। সিসিলিয়ার নিজস্ব কোন বাড়ি নেই, ওকে সব সময়েই পাওয়া যায়। কাজেই সে যদি ওকে কোথাও ঘুমোবার জায়গা করে দিতে পারে, তবে সিসিলিয়া তার সঙ্গেই শোবে। সিসিলিয়া যদি না হয়, তাহলে অন্য কেউ শোবে। আমার কথা শুনে লোকটা একটা বিচ্ছিরি দৃষ্টিতে তাকালো—তেড়ে আসার আগে ষাঁড় যেমন করে তাকায় ঠিক তেমনি। তারপরেই আক্রমণ করলো। চুল ধরে আমাকে হিড়হিড় করে বাইরে টেনে নামিয়ে, এক লাফে ফের ট্যাক্সিতে উঠে বসে, পূর্ণ গতিতে গাড়ি চালিয়ে দিলো।

কালশিরে-পড়া, ধূলিধূসরিত অবস্থায় আমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুরো গলিটা পেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর একটা বেড়ার ওপরে বসে ঠিক করলাম, প্রথমেই যে সাধারণ জিনিসটার দিকে আমার চোখ পড়বে, নিবিড় প্রচেষ্টায় আমি নিজেকে সেটার সঙ্গে অভিন্ন করে তুলে, শান্ত হয়ে উঠবো। নালার বেড়া-ঝোপে বাতিস্তম্ভের আলোয় খুব সাধারণ একটা ফুল—এক ধরনের একটা হলদে ডেইজী—ফুটে ছিলো। সেটার দিকে তাকিয়ে আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনটাকে একাগ্র করে নিজেকে এতখানি বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম যে সমস্ত পৃথিবীটাই আমার কাছে অপরিচিত এবং বহুদূরবর্তী হয়ে উঠলো। ফুলটা প্রথমে বাধা দিলো—একটা নিচ, বুর্জোয়া উপায়ে আমার তুলনায় ওর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ভিন্নতা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলো। অর্থাৎ ওর পাঁপড়ির রঙ, পাতার আকৃতি, শিকড়ের দৈর্ঘ্য—সমস্ত কিছুই ওর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, যা আমার সঙ্গে ওর অভিন্ন হয়ে ওঠার পথে অমোঘ অন্তরায়। আমি আমার প্রচেষ্টার গাঢ়তা দ্বিগুণ করে তুললাম, ফুলটাকে ঘিরে ফেললাম আমার ভালোবাসা দিয়ে। তারপর, খুব আস্তে আস্তে হলেও, ডেইজীটা আত্মসমর্পণ করলো। ক্রমশ অনুভব করলাম, আমি ফুল হয়ে যাচ্ছি আর ফুলটা আমি হয়ে যাচ্ছি। শেষটাতে এই অভিন্নতা এত

গভীর হয়ে উঠলো যে, আমার সামনে এসে যে সমস্ত অসংখ্য গাড়িগুলো থমকে দাঁড়াচ্ছিলো এবং যথারীতি 'যাবে নাকি?' কিংবা 'কত চাই?' অথবা 'দক্ষিণা কত?' ইত্যাদি ইত্যাদি বোকা বোকা প্রশ্ন করছিলো—আমি তাদের প্রায় লক্ষ্যই করছিলাম না।

ইতিমধ্যে দিন হয়েছে, গাছের সারির পেছনে দামী পাথরের মতো ঝলমলে সূর্য জেগে উঠেছে। এদিকে আমি অনুভব করলাম, ঠাণ্ডায় আমি অসাড় হয়ে উঠেছি। তাই ঠিক করলাম, এবারে অভিন্ন হওয়ার ধ্যানটা ভঙ্গ করবো। ফুলটা থেকে আমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলাম, ফুলটা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলো আমার কাছ থেকে। আচমকা আমরা আবার আলাদা হয়ে গেলাম। এখন আমি একটা সাধারণ মেয়ে, বেড়ার ওপরে বসে রয়েছি। ফুলটাও একটা সাধারণ ফুল, বেড়া-ঝোপে ফুটে রয়েছে। নিজেকে ভীষণ আড়ষ্ট আর নিঃশেষিত বলে মনে হচ্ছিলো আমার, কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে একটা গাড়ি থামাবার জন্যে হাত তুললাম। ব্রেকের তীক্ষ্ণ শীৎকার তুলে গাড়িটা তক্ষুনি থমকে দাঁড়ালো। চালকের আসনে মাঝবয়সী একজন সন্ন্যাসিনী, তাঁর পাশে আর একটি সন্ন্যাসিনী—একজন বয়স্কা মহিলা। পেছনের আসনে তৃতীয় এক সন্ন্যাসিনী—বলতে গেলে নেহাতই ছেলেমানুষ—পরিষ্কার ফর্সা মুখ, চোখ দুটি নীল। আমি ওঁর পাশে উঠে বসতেই গাড়িটা ফের চলতে শুরু করলো। বয়স্কা সন্ন্যাসিনী আমার ঠিকানাটা জানতে চাইলেন। তারপর মুখটা না ঘুরিয়েই জিগেস করলেন, 'এই সকাল সাতটার সময় তুমি ওই বেড়ার ওপরে বসে কি করছিলে, মাগো?'

'একটা ডেইজীর সঙ্গে নিজেকে এক করে তুলছিলাম।'

জবাব শুনে আমার পাশে বসে থাকা অল্পবয়সী সন্ন্যাসিনীটির মুখ যেন হাসি চাপার প্রচেষ্টাতেই লাল হয়ে উঠলো। বয়স্কা সন্ন্যাসিনী জানতে চাইলেন, 'ওভাবে উঠে বসেছিলে কেন?'

'কি ভাবে?'

'অর্ধনগ্ন অবস্থায়, রঙচঙ মেখে?'

'মাগদার সঙ্গে গিয়ে দেখা করার জন্যে।'

'মাগদা কে?'

আচমকা আমি ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'মাগদা, আমি নিজে, ওই ফুলটা, আপনারা তিনজন—আমরা সবাই এক। কি সমস্ত বোকা-বোকা প্রশ্ন! এখনও কি আপনারা ওই অবস্থায় রয়েছেন?'

'সে যাই হোক, এভাবে নিজের শরীরটা প্রকাশ্যে খুলে রেখে তুমি ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করছো।'

অল্পবয়সী সন্ন্যাসিনীটি এই সময়, যেন বয়স্কা সন্ন্যাসিনীর ইচ্ছা পূরণ করার জন্যেই, আমার ঢিলে অঙ্গাবরণের প্রান্তটা ধরে আমার পেট এবং বুক—যা সত্যি সত্যি অর্ধনগ্ন ছিলো—তা ঢেকে দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু আমি ওঁকে থামিয়ে দিয়ে উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে বললাম, 'আমি আমাকে ঢাকবো না, আপনারাই আপনাদের ঢাকনা খুলবেন। খুলে ধরুন আপনাদের বুক, পেট আর পেছন। ছুঁড়ে ফেলুন ওই কালো ঘোমটার আড়াল, নগ্ন করে দেখান নিজেদের। ফুল, গাছ, ঘোড়া, পর্বত—এরা কি পোশাক পরা? আপনারা ঈশ্বরের কথা বলেন, কিন্তু নিজেদের তাঁর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখেন। এবারে আমি আপনাদের পোশাকের আড়াল খুলে নেবো। হ্যাঁ, আমি ছিঁড়ে ফেলবো ওই বিচ্ছিরি বোরখাগুলোকে।'

অতএব তৎক্ষণাৎ ওই সন্নাসিনী এবং আমার মধ্যে এক ধরনের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। আমি ওঁর পোশাক খুলে ফেলার চেষ্টা করছিলাম, আর উনি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন আমাকে বাধা দেবার। কিন্তু উনি যথেষ্ট শক্তিমতী, অন্তত আমার চাইতে বেশি শক্তি রাখেন। তাই খুব শীঘ্রিই উনি আমাকে কায়দা করে ফেললেন। হাল ছেড়ে দিয়ে আমি ওঁর কোলেই মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম·· আধো ঘুম আধো তন্দ্রায় আমার দু চোখ জড়িয়ে এলো। সেই অবস্থাতেই অনুভব করলাম ওঁর হালকা হাতখানি আমার কপালে সোহাগের স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে, বিলি কাটছে আমার চুলগুলোতে। তারপর গাড়িটা থামলো। অল্পবয়সী

সন্ন্যাসিনীটি আমাকে গাড়ি থেকে নেমে আসতে সাহায্য করলেন, আর অন্য দুজন আমাকে না দেখার ভান করলেন। আমি দেখলাম, হোটেলের সামনে পাশ-পথের ওপরে আমি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি। হোটেলের লিফটে ঢুকে দরজাটা টেনে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠতে শুরু করলো লিফটটা।

হোটেলের দীর্ঘ, অন্ধকার, আর কটুগন্ধময় বারান্দাটাতে গিয়ে পৌঁছলাম। ঘরের দরজাটা খুলে প্রথমেই যা দেখলাম তা হচ্ছে ড্যাক্‌শুনড্‌টা মেঝের ওপরে ওর খালি পিরিচের পাশে কাত হয়ে শুয়ে রয়েছে —নিস্পন্দ, চোখ দুটো বোজা। ভাবলাম, ও ঘুমোচ্ছে। তারপর যেমনটি ছিলাম, সমস্ত পোশাক-টোশাক পরা অবস্থাতেই বিছানার চাদরে শরীরটা যথাসম্ভব জড়িয়ে নিয়ে, নিজেকে বিছানায় ছুঁড়ে দিলাম এবং তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়লাম।···ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম আমি। দেখলাম গত রাত্রে আমি যে গলিটাতে গিয়েছিলাম, সেই গলি দিয়ে আমি শেকল-বাঁধা ড্যাক্‌শুনড্‌টাকে নিয়ে সূর্যের দিকে এগিয়ে চলেছি। আজ সকালের মতোই এক সারি গাছের পেছন দিয়ে সূর্য উঠছে। ক্রমে সূর্যটা সম্পূর্ণ উঠে পড়লো, আলোয় ভরে উঠলো সমস্ত আকাশ। ড্যাক্‌শুনড্‌টা বললো, 'আমার বাঁধন খুলে দাও, যেতে দাও আমাকে। আমাদের বিচ্ছিন্ন হবার সময় এসেছে—এখন আমাকে নন্দনকাননে যেতেই হবে।' আমি নিচু হয়ে শেকলটা খুলে দিতেই কুকুরটা বিদ্যুৎ-চমকের মতো আমার সামনে দিয়ে ছুটে গিয়ে উধাও হয়ে গেলো। নিঃসঙ্গ হয়ে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম এবং বিশ্রীভাবে কাঁদতে কাঁদতেই আমার ঘুম ভাঙলো।

চোখ নামিয়ে ড্যাক্‌শুনড্‌টার দিকে তাকালাম। কুকুরটা তখনও হাত-পা ছড়িয়ে ওর পিরিচটার পাশে চোখ বন্ধ করে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, ওর মুখটা সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে এবং সেখান দিয়ে দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। বিছানা থেকে উঠে প্রথমেই নিচু হয়ে ওর নাকটা ছুঁয়ে দেখলাম। নাকটা ঠাণ্ডা—ভালো লক্ষণ।

কিন্তু চাপড় মারতেই বুঝলাম, ওর শরীরটা নাকের চাইতেও ঠাণ্ডা। বুঝলাম, কুকুরটা মরে গেছে। কিন্তু আমি কাঁদতে পারলাম না, ইতি-মধ্যে স্বপ্নেই আমি কেঁদে নিয়েছি। সেই মুহূর্তে কে যেন আমার দরজায় করাঘাত করলো—ভয়ঙ্কর এক কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বললো, 'টেলিগ্রাম !'

নিজস্ব কোন বিশেষ পেশা না থাকলে মানুষ অসংখ্য রকমের কাজই করে এবং আমি বলতে পারি, আমি কম-বেশি সেগুলোর সব কটাই চেষ্টা করে দেখেছি। কোন্‌টা আমি চেষ্টা করিনি? ফেরিওয়ালা হয়েছি, তত্ত্বাবধায়ক-দারোয়ান-পরিচারক-রাস্তার ঝাড়ুদার হয়েছি, তিন-চাকার সাইকেল নিয়ে আইসক্রিম বিক্কিরি করেছি এবং আরও কত কি করেছি, জানি না। হ্যাঁ—কাউকে বাড়ি, বাঁধা মাইনে এবং একটা নিরাপদ পেশা নিয়ে সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠার থেকে বেকারত্ব যেমন করে সাফল্যের সঙ্গে বাধা দিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই নয়।

যথারীতি কাজকর্ম নেই দেখে সেদিন আমি পিয়াজা কলোন্নার আর্কেডে ভিড়ের মধ্যে চোখ-কান খোলা রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সমস্ত ধরনের মানুষই ছিলো সেখানে। একজন আমাকে ফিসফিসিয়ে বললো 'ডলার? স্টারলিং?' একজন তার বন্ধুকে বলছিলো, 'তাই হাকিম ওকে চার মাসের শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিয়েছেন।' আর একজন কাফের টেবিলগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো, 'এই, ওই সোনালী চুলের মেয়েটাকে ছাখ্‌!' একজন আবার বেশ জোর দিয়ে বললো, 'মনে রেখো, রোমা কিছুতেই লাজিয়োর কাছে দাঁড়াতে পারে না।'…ওরা সকলেই আমার মতো গরীব আর বাস্তবিকপক্ষে এতে খুব একটা মজা পাবার মতোও কিছু নেই। সময় কাটানোর জন্যে অন্য অনেক লোকের সঙ্গে আমিও দূরদর্শন দেখতে শুরু করলাম। তারপর হঠাৎ কনুইতে একটা স্পর্শ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি—নার্দোন। নার্দোন একজন সৎ মানুষ এবং সে সেইসব ভাগ্যবান মানুষদের মধ্যে একজন, যাদের যে কোন কারণেই হোক কোনদিনই চাকরি যায় না।

'কি করছো তুমি?' জিগেস করলো সে।

'সে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছো।'

'না, তা নয়। আমি বলতে চাইছি, কাজকর্ম কি করছো?'

'কাজ খুঁজছি।'

'আমার সঙ্গে এসো—তোমার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

অতএব আমরা কাফের ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। দুটো কফি আনতে বলে নার্দোন পুরো ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বললো। বললো যে বর্তমানে সে একটা বেসরকারী গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করে। বিশেষ বিশেষ মানুষকে অনুসরণ করাটাই তার কাজ। সেদিনই এক বয়স্ক ভদ্রলোকের হয়ে একটি মেয়েকে তার অনুসরণ করার কাজ শুরু করার কথা। মেয়েটি ভদ্রলোকের রক্ষিতা। ভদ্রলোকের সন্দেহ, মেয়েটি বিশ্বাসঘাতিনী। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই নার্দোনের প্রেমিকা নার্নি থেকে এসে পৌঁছচ্ছে এবং নার্দোন সন্ধ্যেবেলাটা তার সঙ্গেই কাটাতে চায়। সংক্ষেপে নার্দোন সেদিনের জন্যে আমাকে ওর জায়গাটা নিতে বললো। মেয়েটি যে বাড়িতে থাকে, নার্দোন আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে, মেয়েটি বাড়ি থেকে বেরোলে তাকে দেখিয়ে দেবে, তারপর আমার কাজ হবে শুধুমাত্র ওকে অনুসরণ করা। এ জন্যে আমার পুরস্কার তিন হাজার লির্যা, আর সেই সঙ্গে অন্যান্য খরচা। নার্দোন আরও বললো, 'মেয়েটি রীতিমতো সুন্দরী ও তরুণী। ওদিকে ভদ্রলোকটির বয়েস পঁয়ষট্টি। এখন কথা হচ্ছে, পঁয়ষট্টি বছর বয়েস হলে রক্ষিতাকে নজরে রেখে আর লাভ কি? এর উত্তর শুধুমাত্র একটাই হতে পারে।' আমি বললাম, ওর প্রস্তাবে আমি রাজী। তবে পারিশ্রমিকের সঙ্গে তাকে আরও কিছু যোগ করতে হবে। নার্দোন আমাকে তিন প্যাকেট সিগারেট দিতে চাইলো এবং এতে রাজী হয়ে আমরা দুজন দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

পরদিন আকাশটা কালো এবং বৃষ্টি হবার আশঙ্কা থাকায়, হাতে একটা ছাতা নিয়ে ঠিক দুটোর সময় আমি ভিয়া আর্কিমেদে গিয়ে হাজির হলাম। নার্দোন তখন সেখানেই ছিলো। একটা বিরাট সদর দরজা

দেখিয়ে সে আমাকে বললো, 'ওখান থেকে মেয়েটা বেরোবে। আসলে মেয়েটা বেজায় কুঁড়ে, প্রতিদিন বেলা একটা অব্দি বিছানায় শুয়ে থাকে আর এই সময় নাগাদ বেরোয়। ভদ্রলোককে ও একবার এ কথা বলে, আবার অন্য কথা বলে। কিন্তু তিনি ওকে সন্দেহ করেন আর আমার মতে সন্দেহ করার মতো যথেষ্ট কারণও আছে।'

নানা কথা আলোচনা করে আমরা প্রায় আধঘণ্টাটাক সময় অপেক্ষা করে রইলাম। নার্দোন এই বলে আমাকে হাসালো যে, গোয়েন্দা সংস্থাটাতে প্রায়ই এমন সমস্ত পুরুষ আর মহিলারা আসেন, যাঁদের বিশ্বাস যে তাঁরা প্রতারিত হচ্ছেন এবং নিজেদের সেই সন্দেহটাকে সত্যি বলে সমর্থন করানোর আনন্দেই তাঁরা অকাতরে অর্থব্যয় করে থাকেন। হঠাৎ আমাকে সে কনুই দিয়ে একটা গুঁতো মেরে বললো, 'ওই যে মেয়েটা।' ঠিক তখনই বাতাসের আর্দ্রতার জন্যে আমি হেঁচে ফেললাম। ফের যখন মাথাটা তুললাম তখন শুধু দেখলাম, আগুন-রঙা বর্ষাতি পরা একটি মেয়ে দ্রুতপায়ে বাস-স্টপের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমার হাতে তিন প্যাকেট সিগারেট গুঁজে দিয়ে নার্দোন বললো, 'মাঝ রাতেও যদি তোমার পিছু নেওয়া শেষ না হয়, তাহলে তখন আমাকে টেলিফোন কোরো—আমি এসে তোমাকে রেহাই দেবো।'

'রাজী', জবাব দিয়েই আমি মেয়েটির পেছনে ছুটলাম। কিন্তু এবারেও আমি ওর মুখটা দেখতে পেলাম না। কারণ ঠিক তখনই বাসটা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো, মেয়েটি বাসে উঠলো এবং সেই সঙ্গে আরও অনেক লোক। সকলের শেষে আমি কোন রকমে পা-দানিতে লাফিয়ে ওঠার সময় পেলাম মাত্র। বাসটাতে বেশ ভিড়। চলন্ত অবস্থাতেই হিসেব করে দেখলাম যে আমি যেখানটাতে রয়েছি, আমার পক্ষে সেখানে থাকাই সব চাইতে ভালো। কারণ আমি যদি ঠেলে ঠুলে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকতে চাই, তাহলে মেয়েটির কাছে গিয়ে পৌঁছনোর আগেই ও হয়তো বাস থেকে নেমে পড়বে। কিন্তু এ অবস্থায় থাকলে আমি ওর সঙ্গে একই সময়ে নেমে পড়তে পারবো।...বাসটা এক স্টপ থেকে অন্য

স্টপে ছুটে যেতে লাগলো, আমি ঠিক সেই পাদানিতেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ভিয়া ফ্লামিনিয়া ধরে বাসটা পিয়াজেল ফ্লামিনিয়োতে এসে পৌঁছলো। এক পা মাটিতে নামিয়ে আমি সতর্ক দৃষ্টি মেলে রাখলাম। চার-পাঁচ জন লোক বাস থেকে নেমে পড়লো—তারপর নামলো সেই মেয়েটি, সেই লাল বর্ষাতি। তৎক্ষণাৎ আমিও এক লাফে নেমে এসে ওর পিছু নিলাম।

আমার আগে আগে টাইবারের দিকে এগুচ্ছিলো মেয়েটি, আমি সহজেই ওর দিকে নজর রাখতে পারছিলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম, বর্ষাতির নিচে মেয়েটির গড়ন দিব্যি শক্তপোক্ত। প্রতিটি পদক্ষেপেই ওর নিতম্বের পেশীগুলো বর্ষাতির লাল আবরণের ভেতর থেকে ফুটে উঠছিলো। মেয়েটি লম্বা, আমার চাইতেও লম্বা। পদক্ষেপ দৃঢ়, সুনিশ্চিত আর ক্ষিপ্র। এগিয়ে গিয়ে আমি ওকে ধরে ফেললাম, সমরেখায় এসে তাকালাম ওর দিকে। মেয়েটি ফর্সা। সোনালী রঙের কোঁকড়ানো চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে ওর আগুন-রঙা টুপিটার নিচ থেকে। মুখখানা সুন্দর, কিন্তু কঠোর—প্রায় পুরুষালী। ঠোঁট দুটি বড়ো, তাতে দৃঢ়তার ছাপ। নাকটা সোজা। নীল রঙের চোখ দুটি খানিকটা ভেতরে ঢোকানো। বর্ষাতিটা ওর বুকের কাছে উঁচু হয়ে ফুলে রয়েছে। শরীরের গঠন স্পষ্টই একেবারে একটা পাথরের মূর্তির মতো। এমন একটি টগ[illegible] তেজী মেয়ে একটা পঁয়ষট্টি বছরের বুড়োকে নিয়ে খুশী থাকবে কি করে?

একই রকমের দৃঢ় আর ক্ষিপ্র পদক্ষেপে মেয়েটি লুনগোতিভেরের দিকে বাঁক নিয়ে, নদীর দিকে মুখ করা এক সারি বাড়ির পাশ ধরে হাঁটতে লাগলো। তারপর আধুনিক কেতায় তৈরি ছোটখাটো একটা ফ্ল্যাট বাড়ির কাছে এসে, মার্বেল পাথরে ঘেরা একটা সদর দরজা দিয়ে নির্দ্বিধায় ভেতরে ঢুকে পড়লো। আমিও ওর পেছনে পেছনে সেখানে গিয়ে ঢুকলাম। মেয়েটি বৈদ্যুতিক খাঁচাটার দিকে এগিয়ে গেলো। এক মুহূর্ত পরেই খাঁচাটা নিচে নেমে এলো—যেটা আধুনিকতম ধরনের একটা কাচের বাক্সমাত্র। মেয়েটি খাঁচাটায় গিয়ে ঢুকলো, অতএব

আমিও তাই করলাম। 'আপনি কোন্ তলায় যাচ্ছেন?' জানতে চাইলো ও। মেয়েটির কণ্ঠস্বর ওর কঠোর চেহারাটার ঠিক বিপরীত—নরম, সুরেলা, ছেলেমানুষদের মতো। চিন্তা ভাবনা না করেই বলে ফেললাম যে, আমি সব চাইতে ওপরের তলায় যাচ্ছি। বোতামটা টিপে দিলো ও।…এখন আমরা দুজনে দুজনার খুব কাছাকাছি, কিন্তু মেয়েটি ওর মাথাটা নিচু করে রইলো।…চারতলাতেই নেমে গেলো ও। আমি পাঁচ তলায় নেমে সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে চারতলায় এসে দেখি, ঠিক তক্ষুনি ও 'ফ্ল্যাট নম্বর আট' লেখা দরজার আড়ালে উধাও হয়ে গেলো। পড়ে দেখলাম, পেতলের ফলকে নাম লেখা রয়েছে: 'ইন্নোসেন্তি।' ফের একতলায় নেমে এসে বৃথাই খানিকক্ষণ ফ্ল্যাটের তত্ত্বাবধায়ককে খোঁজাখুঁজি করলাম। তারপর বাড়িটার ঠিক উলটো দিকে, টাইবারের ধার বরাবর নিচু পাঁচিলটার কাছে জায়গা নিয়ে দাঁড়ালাম।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিলো। ছাতাটা খুলে আমি প্রথম সিগারেটটা ধরালাম। জানতাম, খানিক সময় আমাকে এভাবেই অপেক্ষা করতে হবে এবং সেটাই আমাকে হতোদ্যম করে দিচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো, কাউকে অনুসরণ করাটা বেশ কঠিন কাজ—তিন হাজার লির‍্যাতে পোষায় না। সদর দরজাটার দিকে নজর রেখেই নিচের টাইবারের দিকে তাকিয়ে নিলাম এক ঝলক। নদীতে বাণ এসেছে, জলগুলো হলদে হয়ে ফুলে উঠেছে আশঙ্কাজনক ভাবে। এখানে সেখানে দু-এক টুকরো মরা ডাল বা দু-একটা মাছ পাক খাচ্ছে ঘূর্ণিস্রোতে। আকাশটা কালো এবং এই কালো আকাশের পটভূমিকায় নদীর অন্য পাড়ের নতুন হালকা-সবুজ পাতায় ভরা গাছগুলো যেন এক আশ্চর্য সমতা গড়ে তুলেছে।…বোধ হয় তিন পোয়া ঘণ্টা অপেক্ষা করে আমি তিন তিনটে সিগারেট খেয়ে ফেললাম। তারপর তত্ত্বাবধায়কের দেখা পাওয়া গেলো। লোকটা রোগা হলেও শক্ত চেহারা, পরনে পেতলের বোতাম লাগানো ধূসর রঙের উর্দি আর উঁচু টুপি। সদর দরজায় দাঁড়িয়ে মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো লোকটা। তৎক্ষণাৎ আমি এগিয়ে গিয়ে জিগেস করলাম

'আচ্ছা, ইন্নোসেন্তি নামে এক উকিল ভদ্রলোক কি এখানে থাকেন? ভদ্রলোকের বয়েস প্রায় ষাট, মাথায় টাক, চোখে চশমা আর নাকের ডগায় একটা আঁচিল।'

লোকটা প্রায় করুণার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'তিন তলার আট নম্বর ফ্ল্যাটে ইন্নোসেন্তি বলে এক ভদ্রলোক থাকেন বটে, কিন্তু তিনি তো যুবক মানুষ—বছর ত্রিশেক বয়েস। ভদ্রলোক খেলা-পাগল, তাঁর নেশা হচ্ছে দৌড়বাজ-গাড়ি। ওই তো, তাঁর গাড়িটা ওখানেই রয়েছে।' লোকটা আঙুল তুলে কাছেই একটা লম্বাটে নিচু গাড়ি দেখালো। গাড়িটা আগুনে রঙের—আমি যে মেয়েটিকে অনুসরণ করছি, ঠিক তার বর্ষাতির মতো।

বললাম, 'ধন্যবাদ, আমি তাহলে নিশ্চয়ই ভুল করেছি।' তারপর তাড়াতাড়ি আবার সেই পাঁচিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম—তবে এবারে একটু দূরে, যাতে লোকটা আমাকে দেখতে না পায়। মনে মনে ভাবলাম, 'তাহলে বছর তিরিশেক বয়েসের এক খেলোয়াড় যুবক! তা বেশ, তা বেশ—এবারে বোঝা গেলো, কেন তুমি বেলা দুটোর সময় বেরোও। চমৎকার!'

নোট-বই বের করে আমি নাম, ঠিকানা আর সময়টা লিখে নিলাম —তারপর আবার অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখনও ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছিলো। ছাতা খুলে আমি এক দৃষ্টিতে দরজাটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এমন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম যে মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিলো, একটা দরজার বদলে আমি যেন দুটো এমন কি তিনটে দরজাও দেখতে পাচ্ছি। কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম? প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক, আড়াইটে থেকে প্রায় সাতটা অব্দি। একটার পর একটা শুধু সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছিলাম। সঙ্গে কোন খবরের কাগজ নেই, দ্রুতবেগে ছুটে যাওয়া গাড়িগুলো ছাড়া লুনগোতিভেরে তাকিয়ে দেখার মতোও কিছু নেই—তাই ওই সময়টাতে আট নম্বর ফ্ল্যাটে কি ঘটছে, তা আপনা থেকেই আমার মনে জেগে উঠছিলো। ভাবছিলাম, 'আমি হত-

ভাগা এতক্ষণ এই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর ওদিকে ওখানে এখন কত লীলাখেলাই না চলছে!···কত আদর-সোহাগ, চুমু, মিষ্টি মিষ্টি কথাবার্তা, জড়াজড়ি, মধুর আলাপ, মদ্যপান—আরো কত কিছু। এমন বিশ্রী আবহাওয়ার দিনে প্রেম করতে কি মজা! জানলার সার্শি নামিয়ে অন্ধকার বিছানায় একে অন্যের আলিঙ্গনে লীন হয়ে দিব্যি বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ আর অ্যাসফল্ট বেছানো ভিজে রাস্তায় গাড়ির চাকার শব্দ শোনা যায়। কি ভাগ্যবান ওরা, আর কি জঘন্য আমার এ কাজটা!'

প্রথম প্যাকেট সিগারেট শেষ করার পর একঘেয়েমি দূর করার জন্যে আমি একশো গজের মতো জায়গা ধরে পায়চারি করতে শুরু করলাম। শুধু ওদের দুজনের কথাই ভাবছিলাম আমি। তারপর রেগে-মেগে ফের নোট-বইটা বের করে মন্তব্য লিখলাম—'আর অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন নেই। মেয়েটি যে পুরো বিকেলটা একটি যুবকের ফ্ল্যাটে কাটিয়েছে, তার প্রমাণ আছে—এবং সেটাই যথেষ্ট।'

অবশেষে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সাড়ে সাতটা নাগাদ ফের লাল-বর্ষাতির সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো। মেয়েটি জোর কদমে এগিয়ে যেতেই খানিকটা স্বস্তি নিয়ে আমি আবার ওকে অনুসরণ করতে শুরু করলাম। প্রেম-লীলা অবশ্যই ওকে ক্লান্ত করেনি—পিয়াজেল ফ্লামিনিয়োতে পৌঁছে ও শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে যাওয়া একটা বাসে লাফিয়ে উঠলো। আমিও উঠলাম ওর পেছন পেছন। বাসটাতে ভিড় ছিলো—আমি ঠিক ওর পেছনটিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। হয়তো ঘেঁষাঘেঁষিটা একটু বেশিই হয়ে থাকবে, কারণ মেয়েটি আমার দিকে ফিরে সেই ছেলেমানুষী গলায় খানিকটা বিরক্তির রেশ ঢেলে বললো, 'দয়া করে একটু পেছনে সরে দাঁড়ান।' আমি যথাসম্ভব পেছনের সরে দাঁড়ালাম, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, 'ছেনাল মেয়েমানুষ! ইন্নোসেন্তির বেলায় কিছু নয়, আর আমার বেলাতেই যত দোষ! তোমাকে তো সোনা যে কেউই পয়সা দিয়ে কিনতে পারে।'

শেষ পর্যন্ত পিয়াজা কলোন্নায় নামলো মেয়েটি, আমি তখনও ওর

পেছনে লেগে রয়েছি। তারপর পিয়াজা ফন্‌তানা-দি-ত্রেভির দিকে এগিয়ে যাওয়া একটা সরু গলিতে ঢুকে, ও একটা পুরনো বাড়ির সদর দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেলো। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে দরজার গায়ে ঝোলানো অসংখ্য নামের ফলকগুলো দেখতে লাগলাম। বাড়িটাতে একটা নাচের স্কুল, একটা পান্থশালা, একটা পোশাকের দোকান আর একটা অঙ্গ-সংবাহন কেন্দ্র রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, বাড়িটার নাম-ডাক যে ভালো নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। মাঝে মাঝেই অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে কখনো একা কখনো বা যুগলে, বাড়ির মধ্যে ঢুকে উধাও হয়ে যাচ্ছিলো।···সামনের ঘরের শেষ প্রান্তে কাচের দরজার পেছনে বসে থাকা ভারি গোঁফওয়ালা বুড়ি তত্ত্বাবধায়িকার কাছ থেকে আমি জানতে চেষ্টা করেছিলাম, 'আচ্ছা, এমন-এমন দেখতে একটি সোনালী চুলের মেয়ে এখানে থাকে কি না বলতে পারেন?' বেতো বুড়িটা তা শুনে মুখটা পর্যন্ত না ঘুরিয়ে জবাব দিলো, 'তা বাপু, ডজন ডজন মেয়ে এখানে আসে। কাজেই সে কথা বলবো কি করে?'

অতএব অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না, আমি সেটাই করতে লাগলাম। ভাগ্যিস ইতিমধ্যে একটা খবরের কাগজ কিনেছিলাম। কাগজটা পড়তে পড়তে গোটা কতক বান্‌ রুটিও খেয়ে নিলাম—রুটিগুলো সেদিন সকাল বেলাই আমি আগে থেকে বুদ্ধি করে পকেটে পুরে নিয়েছিলাম। এক ঘণ্টা কিংবা তার চাইতে খানিকটা বেশি সময় অপেক্ষা করে রইলাম। তবে লুনগোতিভেরের মতো এবার এটা আর অতটা যন্ত্রণাদায়ক হয়নি—কারণ এই সরু গলিটাতে আর কিছু না হোক অন্তত অনেক লোকজন যাতায়াত করে, কাজেই সব সময়েই দেখার মতো কিছু না কিছু থাকে।···মাঝে মাঝেই আমি ওই লাল বর্ষাতি পরা মেয়েটার কথা ভাবছিলাম আর নিজের মনে বলছিলাম, 'চোখে যতটা দেখা যায়, এর মধ্যে তার চাইতেও গভীর কিছু ব্যাপার আছে। শুধু ইনোসেন্তি নয়, মেয়েটার মধ্যে আরও কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে। কি আছে, তা ঈশ্বরই জানেন!' যাই হোক, অবশেষে

সেই একই বর্ষাতি পরা অবস্থায় বেরিয়ে এলো মেয়েটি—আমিও জোর কদমে ওর পিছু নিলাম।

এবারে আবার উলটো দিকের বাসে চেপে পিয়াজা কলোন্নায় ফিরে এলো মেয়েটা এবং বিশ মিনিটের মধ্যে আবার সেই লুনগোতিভেরে এসে হাজির হলাম আমরা। ইন্নোসেন্তির বাসস্থানে পৌঁছে মেয়েটা নির্দ্বিধায় বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন প্রায় নটা বাজে, বৃষ্টিটা বেশ ঝেঁপে নেমেছে। দমকা বাতাসে বৃষ্টির ঝাপটা আমার মুখের ওপরে আছড়ে পড়ছে। আমি তখন নার্দোন, আমার এই কাজ, আর ওই মেয়েটা—সবাইকে শাপান্ত করতে শুরু করলাম। এবং স্বাভাবিক কারণেই ফের না ভেবে পারলাম না, 'আমি শালা এখানে এই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর ওই সুন্দর ফ্ল্যাটের মধ্যে ওরা দুটোতে এখন খুব সম্ভব টেবিলের কাছে বসে প্রেমে ডগোমগো হয়ে 'এটা খাও সোনা···এটা একটু চেখে ছাখো লক্ষ্মীটি···এই মদটাতে একটা চুমুক দাও মানিক'—এ সব করছে। তারপর রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে শুরু হবে মধুর ঘনিষ্ঠতা, প্রেমের আদান-প্রদান। ধুস্ শালা, নিকুচি করেছে এ সবের—ন্যায়-বিচার বলতে সত্যিই কিছু নেই।'

যাই হোক সংক্ষেপে বলতে গেলে, একটানা তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর মাঝ রাত নাগাদ আমি কাছাকাছি একটা গ্যারাজে গিয়ে উঠলাম—যেখান থেকে ওই বিশেষ দরজাটার দিকে নজর রাখা চলে। তারপর সেখান থেকে নার্দোনকে টেলিফোনে বললাম, 'এখানে জোর ফুর্তি চলেছে হে···খানা, পিনা, মাগীটার সঙ্গে মজা লোটা—সবই চলেছে! এবারে তুমি এসে আমাকে রেহাই দাও, নয়তো আমি সব কিছু ফেলে-টেলে চলে যাবো।' নার্দোন জানালো, সে আসছে। বাস্তবিক, প্রায় বিশ মিনিটের মধ্যেই সে এসে হাজির হলো। তাকে আমার কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানালাম। তারপর আমার নোট-বই থেকে গোটা দুতিন পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ওর হাতে দিয়ে, সেই সঙ্গে গোটা কতক রসালো মন্তব্য জুড়ে, অবশেষে সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

এরপর বেশ কিছু দিন নার্দোনের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। ও আসবে বলে আমি সতর্ক হয়েই অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সেই তিন হাজার লির‍্যা—যার জন্যে আমি অত কঠিন পরিশ্রম করেছিলাম—তার কোন পাত্তা না পেয়ে, শেষ অব্দি আমিই ওকে টেলিফোন করলাম। নার্দোন জানালো, আর্কেডে আমার সঙ্গে ও দেখা করবে।···যথা সময়ে যথাস্থানে আমাকে দেখেই ও উষ্ণ হয়ে বললো, 'অভিনন্দন নাও হে! আমাকে তুমি প্রায় ডুবিয়েছিলে আর কি!'

'কেন?'

'আমি যে মহিলাটিকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, তুমি তার পেছন নাও নি—অন্য কাউকে অনুসরণ করেছিলে।'

'তা মোটেই সম্ভব নয়।'

'পুরোপুরিই সম্ভব। তুমি যে মহিলাটির পেছন নিয়েছিলে, আসলে সে একজন নার্স।'

'নার্স?'

'হ্যাঁ, রীতিমতো শিক্ষাপ্রাপ্তা নার্স।'

'কিন্তু ইন্নোসেন্তি?'

'সে ব্যাপারটাও আমি তোমাকে বলছি। ইন্নোসেন্তির বৃদ্ধা মা গুরুতর অসুস্থ ছিলেন, মেয়েটি তাঁকেই সেবাযত্ন করেছিল: খানাপিনাও করে নি, প্রেমলীলাও চালায় নি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মহিলাকে সেবা-শুশ্রূষা করে তিনটে নাগাদ মহিলা মারা যাবার পর, মেয়েটি তাঁর বিছানার কাছ ছেড়ে ওঠে। মেয়েটি কোথায় থাকে, জানো? ত্রেভি ফাউনতেনের কাছে সেই পুরনো বাড়িটায়, যেটাকে তোমার সম্ভ্রান্ত জায়গা বলে মনে হয়নি। সেখানে ওর আসবাবপত্রে সাজানো একটা ঘর আছে, নিজের চাবিও আছে। যাক, কাজটা তুমি ভালোই করেছো—আমার অভিনন্দন নাও। অনুসরণ করার কাজে তুমি একেবারে প্রথম শ্রেণীর!'

আমি ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম, মনে হলো আমার মাথায় যেন একটা তীব্র আঘাত করা হয়েছে। কিন্তু কি ভাবে এ ধরনের একটা

মারাত্মক ভুল করলাম, তা জানার জন্য তখনও আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিলো। তারপর একেবারে আচমকাই ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলাম।...সেই 'রক্ষিতা মেয়েটি' যখন বাসে উঠেছিলো, তখন আমি তার মুখটা দেখতে পাইনি। নার্সটিও তখন ওই একই বাসে ছিলো, তার পরনেও সেই একই রকমের লাল বর্ষাতি। আর আমি ঠিক একটা ষাঁড়ের মতো, অন্য কিছু চিন্তা না করে, ওই লাল রঙ দেখেই তেড়ে গিয়েছিলাম।

নার্দোন বলেছিল, 'এ সমস্ত কথা আমি ওই নার্সটির কাছ থেকেই জানতে পেরেছি। যাকে আমার অনুসরণ করার কথা, এ মেয়ে সে মেয়ে নয় দেখে আমিই ওর সঙ্গে আলাপ করে জানালাম - আমি কে এবং আমি কি করছিলাম। তখন মেয়েটি দয়া করেই আমাকে এ সব খবর জানালো। কিন্তু শেষটাতে ও কি বললো, জানো? বললো, 'যে লোকটা আমার পেছন নিয়েছিলো, তাকে আমার বেশ মনে আছে। বাসের মধ্যে সে এমন অভদ্রতা করছিলো যে, তাকে আমার জায়গা মতো সরিয়ে দিতে হয়েছিলো।' সেরাফিনো, তোমার কাছ থেকে আমি কিন্তু সত্যিই এমনটি আশা করিনি। তোমার মনে রাখা উচিত যে অনুসরণ করা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ—বলতে পারো, জনহিতকর কাজ।'

আমি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, 'কিন্তু কথাটা সত্যি নয়—আমি দিব্যি কেটে বলছি।'

'ছাখো বাপু, পুরুষ মানুষ হচ্ছে শিকারীর জাত।' নার্দোন বললো, 'তোমার মাথায় একটা ধারণা ঢুকে গিয়েছিলো' মেয়েটা ভদ্রঘরের নয়। সেটা কিন্তু খুবই খারাপ। যাই হোক, এই নাও এক হাজার লির‍্যা আর এক প্যাকেট সিগারেট। সত্যি বলছি, তোমাকে আমি আর এর চাইতে বেশি কিছু দিতে পারি না।'

একদিন এরনেস্তো তার নিজের বাড়িতে বৈঠকখানার দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে খানিকটা দূর থেকে তার স্ত্রী এবং লিউকা নামে তার এক বন্ধু—যাকে সে তার স্ত্রীর প্রেমিক বলে সন্দেহ করে—এই দুজনকে লক্ষ্য করছিলো। ঘরের অন্য প্রান্তে একটা সোফায় বসে ওরা দুজনে তখন এমন একটা বিষয় নিয়ে উচ্ছল অথচ নিচু গলায় আলোচনা করছিলো, যেটা ওদের দুজনের কাছেই দারুণ আগ্রহের বিষয় বলে মনে হচ্ছিলো এরনেস্তোর। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হিংস্রভাবে ধূমপান করছিলো সে। কিছুদিন যাবৎ নিদারুণ ঈর্ষা তাকে রাত্রিবেলা জাগিয়ে রাখছে আর দিনের বেলা তার ওপরে ঘুমের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। এবং এই মুহূর্তে ঘুমোনো কিংবা স্ত্রীর সম্পর্কে তার মনে যে নিদারুণ উদ্বেগ জেগে উঠেছে তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া—এই দুয়ের মধ্যে কোনটা তার বেশি পছন্দ, তা এরনেস্তোর পক্ষে বলা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার একটানা পরশ্রীকাতর দৃষ্টি যেন তার স্ত্রীকে বিরক্ত করে তুললো। একেবারে আচমকা লাফিয়ে উঠে ও ঘরের মধ্য দিয়ে হেঁটে এসে এরনেস্তোর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলো, 'দয়া করে বলবে কি, কেন তুমি আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে রয়েছো?'

'আদৌ কোন কারণে নয়।' এরনেস্তো একটা সুপরিচিত ইংরেজী প্রবাদ আওড়ালো, 'তোমার দিকে তাকানো কোন অপরাধ নয়—একটা বেড়ালও রাজার দিকে তাকাতে পারে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি রাজা নই। লিউকা ওর প্রেমঘটিত ব্যাপারগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। তুমি পড়াশুনো করার ঘরে গিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো। তারপর আমরা এসে তোমাকে নিয়ে বেরোবো—সবাই মিলে সমুদ্রের ধারে যাবো।' কথা বলতে বলতে

ওর স্ত্রী ওর বুকে আলতো করে হাতের চাপ দিয়ে ওকে বৈঠকখানার বাইরে শোবার ঘরের মধ্যে ঠেলে দিলো—দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

স্ত্রী অত আদর করে পড়ার ঘরে যাওয়ার কথা বলা সত্ত্বেও এরনেস্তো তা না করে ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে শোবার ঘরের এক কোণে বসেই অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু তার হাতঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটাটা, যেটার দিকে তার দৃষ্টি স্থির হয়েছিলো, সেটা নিজের কক্ষপথে বড়জোর বার পাঁচেক গোল হয়ে ঘুরে আসতে না আসতেই দরজাটা খুলে গেলো এবং পরনে সায়া, নগ্ন বাহু আর পায়ে মোজা পরা তার স্ত্রী দোরগোড়ায় হাজির হয়ে ওর পোশাক-আশাক একটা কুর্সির ওপরে ছুঁড়ে ফেলে রেখে আবার উধাও হয়ে গেলো।

এরনেস্তো যে এক কোণে গুঁড়ি মেরে বসে ছিলো তা ও অবশ্যই দেখতে পায়নি, কিন্তু এরনেস্তো ওকে খুব ভালো করেই দেখেছে—দেখেছে স্বচ্ছ অন্তর্বাসের আড়ালে ওর শরীরের চকিত চাঞ্চল্য আর মুখের উত্তেজিত ভঙ্গিমা। তাই একই সঙ্গে নিবিড় হতাশা অথচ জয়ের তিক্ত আনন্দ অনুভব করলো সে—ভাবলো, এতদিন ধরে সে যা খুঁজছিলো এবারে সেই প্রমাণ সে পেয়েছে। তার স্ত্রী আর লিউকা পরস্পরকে ভালোবাসে এবং বাস্তবিক পক্ষে ওদের ধৃষ্টতা এতদূর এগিয়ে গেছে যে তার নিজের বাড়িতে, তার নাকের ডগাতেই ওরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। এখন কি করবে সে? স্বাভাবিক ভাবেই এরনেস্তো প্রথমটাতে বৈঠকখানার দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার কথা ভাবলো। কিন্তু তারপর ঠিক সময় মতোই নিজেকে সামলে নিলো। কারণ প্রতিহিংসা গ্রহণের তাগিদে আচমকা তার মনে হলো, প্রতারিত হবার পরে এবারে সে নিজেই প্রতারণা করবে। দুম করে ওদের সামনে গিয়ে হাজির না হয়ে, বেড়াল যেমন করে ইঁদুর নিয়ে খেলে, সে ওদের নিয়ে তেমনি করে খেলবে। এতদিন সে কিছুই জানতো না, ওরা জানতো—এবার থেকে সে সব কিছু জানবে, ওরা থাকবে অজ্ঞ হয়ে।

ইতিমধ্যে অবশ্য ওদের সন্দেহ এড়ানোর জন্যে তার পক্ষে পড়ার

ঘরে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, যা তার স্ত্রী বিশ্বাসঘাতী ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে আগে থেকেই প্রস্তাব করে গিয়েছিলো। অতএব যে আরামকুর্সিতে এরনেস্তো শরীর ডুবিয়ে বসে ছিলো, সেখান থেকে সে উঠতে গেলো এবং উঠতে যাবার চেষ্টা করতেই আচমকা সে জেগে উঠলো।

হ্যাঁ, সে শোবার ঘরেই রয়েছে। কিন্তু কুর্সিতে কোন পোশাক-টোশাক নেই। ঠিক তখুনি দরজাটা খুলে গেলো এবং তার স্ত্রী, এবারে পুরোপুরি পোশাক পরা অবস্থাতেই, ভেতরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, সমুদ্র সৈকতে যাবার জন্যে সে তৈরি আছে কি না। ওকে অনুসরণ করতে করতে এরনেস্তো ভাবলো, 'ব্যাপারটার সবটাই তাহলে স্বপ্ন ছিলো।' এতদিন ঘুমহীনতার ক্লান্তি থাকা সত্ত্বেও সে সর্বদা ঘুম এবং ঘুম থেকে জেগে ওঠার প্রভেদটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এখন আতঙ্ক ও বিস্ময় মেশানো এক বিচিত্র মানসিকতায় সে সঠিক উপলব্ধি না করলেও অনুভব করলো, বাস্তবের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ এক স্বপ্ন থেকে সে বাস্তবে ফিরে এসেছে—যে বাস্তব স্বপ্নের মতোই অযৌক্তিকতায় ভরা। রাস্তায় বেরিয়ে আসতে আসতে এই চিন্তাটাই এরনেস্তোর মনটাকে ভরিয়ে রাখলো। তারপর গাড়িতে উঠে বসলো ওরা। এরনেস্তো বসলো চালকের আসনে, পাশে বসলো তার স্ত্রী আর লিউকা বসলো পেছনে।

কিছুক্ষণ কোন কথাবার্তা না বলে গাড়ি চালাতে লাগলো এরনেস্তো। কিন্তু ভিয়া ক্রিস্তোফোরো কলম্বোর মোড় নিয়েই বললো, 'ভেবে ছাখো, তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমি দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সত্যিকারের একটা উদ্ভট স্বপ্ন দেখলাম।'

'কি স্বপ্ন?'

'স্বপ্ন দেখলাম, তুমি লিউকার সঙ্গে বৈঠকখানা ঘরে রয়েছো আর আমি তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। তারপর তুমি আমাকে বাইরে বের করে দিয়ে আমার মুখের ওপরেই দরজাটা বন্ধ করে দিলে। একটু

পরেই কিন্তু তুমি পোশাক খোলা অবস্থায় দোরগোড়ার কাছে এসে হাজির হলে, কুর্সির ওপরে তোমার পোশাকটা ছুঁড়ে দিলে, তারপর ফের গিয়ে লিউকার সঙ্গে ঘরের দরজা বন্ধ করলে।'

এরনেস্তো দেখলো, ওর স্ত্রী অপাঙ্গে ওর দিকে তাকালো আর তারপরেই হাসতে শুরু করলো—হাসতে হাসতে টকটকে লাল হয়ে উঠলো ওর সুন্দর মুখখানা। শেষ অব্দি হোঁচট খেতে খেতে বললো, 'হায়রে আমার বেচারা এরনেস্তো…'

'কি, ব্যাপারটা কি?'

'শোনো এরনেস্তো, ওটা স্বপ্ন নয়।'

'কি? তুমি কি সত্যিই আমাকে ঘর থেকে বেব করে দিয়ে লিউকার সঙ্গে ঘরের দরজা বন্ধ কবেছিলে? সত্যিই কি তুমি অর্ধেক পোশাকে ছিলে?'

'দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। ব্যাপারটা ঘটেছিলো এই: লিউকা আর আমি কথা বলছিলাম, কিন্তু তুমি দরজা থেকে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আমাকে বিরক্ত করে তুলছিলে—যেমনটি তুমি প্রায়ই করে থাকো·· তেড়ে যাওয়ার আগে ষাঁড় যেমন করে তাকায়, ঠিক তেমনি করে তাকিয়ে থাকো। তাই একটু কালের জন্যে আমি তোমাকে ঘর থেকে চলে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু ওরা এসে বললো, দর্জি আমার নতুন পোশাকটা নিয়ে এসেছে—পরখ করে দেখবার জন্যে। তাই আমি লিউকাকে ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে বললাম। পোশাকটা আমার গায়ে সুন্দর মাপমতো হয়েছিলো। পরখ করে দেখার পর আমি সেটাকে কুর্সির ওপরে ছুঁড়ে দিলাম, যাতে ঝি সেটা সরিয়ে রাখতে পারে।…এর সব কিছুই সত্যি সত্যি হয়েছিলো। কিন্তু তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আর জেগে উঠে ভেবেছো, স্বপ্ন দেখছিলে।'

'কিন্তু আমি যখন জেগে উঠলাম, তখন পোশাকটা আর কুর্সির ওপরে ছিলো না।'

'অবশ্যই ছিলো না। তুমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলে বলে বুঝতে পারো

নি—ঝিটা ঘরে গিয়ে ঢুকেছে, পোশাকটা সরিয়ে নিয়েছে, তারপর ফের বেরিয়ে এসেছে। সত্যি বলতে কি ও তখন আমাকে বলেছিলো, 'সিনর এরনেস্তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি কি ওঁকে জাগিয়ে দেবো ?' আমি তাতে জবাব দিয়েছিলাম, 'না, জাগিয়ো না। কাল রাত্তিরে উনি ঘুমোন নি।' বুঝেছো ?'

'এতখানি বিবেচনা করার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি ? তুমি কি আমার ওপরে রাগ করেছো ?'

'না। রাগ করলে নিজের ওপরেই করেছি।'

ধূলিধূসরিত পাইনবনের জটলা আর চোখ ধাঁধানো সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে ছুটে যাওয়া কাস্তেফুলসানো রোড ধরে গাড়ি চালিয়ে ওরা স্নানের জায়গায় এসে পৌঁছলো। গাড়ি রাখার খড়ের ছাউনিগুলোর সর্বত্র সারি সারি গাড়ি দাঁড় করানো, আগস্টের সূর্য কিরণে ঝকমকে দ্যুতি ছড়াচ্ছে গাড়িগুলোর ধাতব অংশ। ওরা স্নানকুঠির দিকে এগিয়ে গেলো, যেটা গঠন-বৈচিত্র্য এবং পটভূমির দিক দিয়ে অবিকল ব্যালে থিয়েটারের মঞ্চসজ্জার মতো। এক ধারে নীল আকাশের পটভূমিকায় সমুদ্রের দিকে নেমে যাওয়া একই ধরনের অর্ধবৃত্তাকার খোলার মতো সবুজ খুপরিগুলো, অন্য দিকে শান বাঁধানো পথ ধরে এগিয়ে চলা স্নানার্থীদের মিছিল··· একটি পুরুষ, একটি নারী—পরপর এই একই ভাবে। ব্যালের সঙ্গে সঙ্গতি জোরদার করার জন্যেই সমুদ্রের পটভূমিকায় বড়ো বড়ো ছাতাগুলো সব হলুদ রঙের, আর দিগন্তের কাছাকাছি অর্ধনগ্ন যে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের গায়ের রঙ বাদামী। লাল রঙের সাঁতারের পোশাক পরা দুজন খেলোয়াড় অর্ধেক কালো আর অর্ধেক সবুজ রঙের একটা বিশাল বল বাতাসে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করছে। গোপনে গোপনে এর সমস্ত কিছুই এরনেস্তোকে বিরক্ত করে তুলছিলো—যেমন একটু আগেই সে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলো দীর্ঘ প্রস্তুতির পর ওর স্ত্রীর বিকিনি পরা অবস্থায় খুপরি থেকে বেরিয়ে আসার দৃশ্য দেখে।

বস্তুত, সমুদ্র সৈকতে এমন অদ্ভুত মাত্রায় সংক্ষিপ্ত প্রতিকী বিকিনি

কোথাও দেখা যায় না। বক্ষ-আবরণীর বিস্তৃতি ছোট হয়ে সাধারণ এক-ফালি ফিতেয় এসে ঠেকেছে, যার জন্যে ওর পুরুষ্টু স্তন দুটির দুই-তৃতীয়াংশই সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। বুক থেকে তলপেট অব্দি অবারিত স্বর্ণাভ নরম মাংসপেশীর হিন্দোলিত আর আমন্ত্রণের পথ পেরিয়ে গিয়ে চোখে পড়ে, ফুল আঁকা কাপড়ের ত্রিভুজাকৃতি ফালি-টুকু—এক পাশ থেকে দেখলে ওর উদ্বেলিত উরুর বৃত্তরেখায় আড়াল হয়ে যাওয়ায় সেটুকুও দেখা যাবে না, মনে হবে ও বুঝি সম্পূর্ণ নগ্ন। সত্যি বলতে কি স্ত্রীকে এরনেস্তোর মনে হচ্ছিলো, হান্স অ্যানডারসনের গল্পের সেই সম্রাটের মতো—যেন আসলে ও সত্যিই সম্পূর্ণ নগ্ন, কিন্তু ও ভাবছে ওর পরনে পোশাক রয়েছে, তাই পোশাক পরা সপ্রতিভ মানুষের মতো ওর আচরণেও অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা। রূঢ় স্বরে সে বললো, 'শোনো, দয়া করে গিয়ে তুমি নিজেকে আর একটু ঢাকাঢুকি দিয়ে নাও—এটা সত্যিই বড়ো বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।'

'কিন্তু এ বছরে এ ধরনের বিকিনিই তো চলছে।'

'তার চাইতে বরং একটা রুমাল পরে নাও···এটা সত্যিই জঘন্য। তুমি কি বুঝতে পারছো না যে, তুমি একেবারে ন্যাংটো হয়ে রয়েছো?'

'হলেই বা, কি হয়েছে?'

'খুপরিতে গিয়ে কিছু পরে নাও।'

'ওহ্, তুমি যা জ্বালাও না!' ওর স্ত্রী ঘুরে দাঁড়ালো এবং পেছন দিক থেকে ও যে কতটা নগ্ন, নিজের অজান্তে যেন বিদ্রূপ করেই এরনেস্তোকে সেটা দেখিয়ে, খুপরির দিকে এগুতে শুরু করলো। ওর পোশাক ছাড়ার জন্যে লিউকা এতক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করছিলো, ওই মুহূর্তে সে-ও ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু তাতে ওর স্ত্রীর পক্ষে এক সঙ্গে ভেতরে যাওয়াটা আটকালো না। দরজা বন্ধ হয়ে গেলো—এরনেস্তো দেখলো, বাইরে সে একা।

এরনেস্তোর পিঠে সূর্যের প্রখর তাপ, রাগে জ্বলছিলো ওর মুখটা। আবার তার স্ত্রী লিউকার সঙ্গে এক ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিয়েছে।

এবং এবারে সম্ভবত এটাকে আধ স্বপ্ন মনে করে নিজেকে প্রতারণা করা যায় না। ওর সব চাইতে খারাপ লাগছিলো এই ভেবে যে, ওর স্ত্রী যে কারণে এখন এ কাজটা করলো সে কারণটা এরনেস্তোই ওকে যুগিয়ে দিয়েছে ওর বিকিনির স্বল্প আকারের কথা বলে। এরনেস্তো না ভেবে পারছিলো না, এতক্ষণে প্রেমিক যুগল নিশ্চয়ই সমস্ত বাধা-নিষেধ হারিয়ে ফেলেছে—ওদের গুপ্ত প্রণয়ের ব্যাপারটা এখন একেবারে স্পষ্ট আর স্বচ্ছ। কুঠরির ভেতর থেকে পায়ের খসখসে আওয়াজ আর অস্পষ্ট মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছিলো। তারপর কিছুক্ষণের বিরতির পর—যা এরনেস্তোর কাছে প্রচণ্ড দীর্ঘ বলেই মনে হচ্ছিলো—দরজা খুলে গেলো এবং যেন প্রগাঢ় আত্মতৃপ্তিতে সাঁতারের পোশাকে কটিবন্ধ বাঁধতে বাঁধতে লিউকা দোরগড়ায় এসে দাঁড়ালো। এতটুকু ইতস্তত না করে এরনেস্তো এক ছুটে সেদিকে এগিয়ে গেলো, তারপর লিউকার গর্দান চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলো, 'যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়!'

তারপরেই এক বিভ্রান্তির দৃশ্য। লিউকা আর এরনেস্তো মারামারি করতে করতে এক রাশ ধুলোর মেঘ উড়িয়ে বালির ওপরে আছড়ে পড়লো। কয়েকজন স্নানার্থী এসে ওদের আলাদা করে দিলো···তুজনেই হাঁফাচ্ছে, তুজনেরই আলুথালু অবস্থা। এরনেস্তোর স্ত্রী তখন ভেজা শরীরে সমুদ্র থেকে উঠে এসে তুজনকে তুহাতে ধরে টানতে টানতে পানশালার দিকে নিয়ে গেলো। একটা কোণে গিয়ে বসলো ওরা। লিউকা বিক্ষুব্ধ, কিন্তু তার শান্ত মুখে ভুল করে সন্দেহ করা মানুষের অভিব্যক্তি। এরনেস্তোর মুখ কঠোর ও বিষণ্ণ। তার স্ত্রী যথারীতি কিছুতেই গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পারছে না, সব কিছুই ওর কাছে মজার ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত এরনেস্তো যখন ঘটনাটার পূর্ণ বিবরণ জানালো, তখন ও আর কিছুতেই নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়লো।

'এতে হাসির কিছু নেই,' এরনেস্তো বিষণ্ণ সুরে বললো।

'আমি হাসছি তার কারণ,' ওর স্ত্রী বললো, 'পুরো ব্যাপারটাই যে একটা স্বপ্ন ছিলো, এখন তাতে আমার আর এতোটুকুও সন্দেহ নেই।'

'তার মানে?'

'প্রথমে আমি কুঠরিটাতে গিয়ে ঢুকলাম, যখন বেরিয়ে এলাম তখন তুমি ওই বেতের আরামকুর্সিটাতে বসে ঘুমিয়ে পড়েছো। আমি তোমার সামনে দিয়ে গিয়ে সমুদ্রে নামলাম, তুমি তখনও ঘুমোচ্ছো। তারপর লিউকা ঘরে ঢুকলো। তুমি তখন স্বপ্ন দেখছিলে, তুমি আমার পেছন দিকটাতে কিছু একটা জড়িয়ে নিতে বলেছো আর আমি লিউকার সঙ্গে একঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছি। কাজেই অমন একটা স্বপ্ন দেখার পরে লিউকা যেমনি দরজা খোলার শব্দে তোমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলো, তুমি অমনি ওর দিকে ধেয়ে গেলে!'

'আমি দুঃখিত,' এরনেস্তো চিন্তিত সুরে বললো। 'প্রথম বারে আমি বাস্তবকে স্বপ্ন বলে ভুল করেছিলাম, আর এবারে স্বপ্নকে বাস্তব বলে ভুল করেছি। কদিন হলো আমার স্নায়ুগুলো সব যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, আমি যেন কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কিন্তু তুমি কি করে ভাবলে যে আমি লিউকার সঙ্গে ওই কুঠরিতে ঢুকে দোর বন্ধ করে দেবো—তাও আবার তোমার নাকের ডগায়?'

'ভেবেছিলাম তার কারণ, আজ সকাল বেলায় তুমি সত্যি সত্যি ওর সঙ্গে বৈঠকখানায় ঢুকে সেটার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা ছিলো বৈঠকখানা ঘর আর আমার পরনেও তখন সাঁতারের পোশাক ছিলো না।'

'তোমার পরনে ছিলো সায়া।'

'কিন্তু আমার পরনে যখন শুধু মাত্র সায়া ছিলো, তখন লিউকা ঘরের মধ্যে ছিলো না।'

'আমি তা জানবো কি করে? তাই ব্যাপারটা আমার কাছে এত অসঙ্গত আর সাংঘাতিক বলে মনে হয়েছিলো যে, আমি ভেবেছিলাম ওটা স্বপ্ন। হয়তো সে জন্যেই ব্যাপারটা যখন স্বপ্নের মধ্যে আবার ঘটলো, তখন আমি সেটাকে সত্যি বলেই বিশ্বাস করে নিলাম।'

'যাক গে, চলো এখন আমরা স্নান করে আসি। তুমি কি আমাদের

সঙ্গে আসছো?'

'তোমরা যাও,' এরনেস্তো বিষণ্ণ সুরে বললো, 'আমি পরে আসছি।'

লিউকার হাত ধরে যেতে যেতে এরনেস্তোর স্ত্রী উচ্ছল হয়ে বললো, 'জলটা ভারি চমৎকার!'

শান বাঁধানো পথ ধরে সমুদ্রের দিকে ওদের এগিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করলো এরনেস্তো। ওর কাছাকাছি একটা টেবিল থেকে কে একজন তখন উঁচু গলায় বলে উঠলো, 'ভাখো ভাখো, কত খুশি হয়ে উঠেছে ওরা ছুটিতে—ওই যে, ওই দুজন। দেখেই বোঝা যায়, ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে।'

ঘটনাটা ঘটেছিলো এভাবে। খুব ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে—ফিলো-মেনা তখনও ঘুমোচ্ছে—আমি যন্ত্রপাতির থলেটা নিয়ে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। গিয়েছিলাম ভিয়া গ্র্যামশির মন্তে পারিয়োলিতে। সেখানে একটা বয়লারে ফুটো হয়ে গিয়েছিলো, যেটা আমাকে সারাতে হবে। কাজটা সারতে আমার কতটা সময় লেগেছিলো? নিশ্চয়ই ঘণ্টা ছুয়েক, কারণ বয়লারের নলটা আমাকে বের করে আবার ঢোকাতে হয়েছিলো। যাই হোক, কাজটা শেষ করে আমি আবার বাসে-ট্রামে চেপে ভিয়া দি করোনারিতে ফিরে এসেছিলাম—ওখানেই আমার বাড়ি আর দোকান। এবারে সময়ের হিসেবটা খেয়াল করুন—মন্তে পারিয়োলিতে ছু ঘণ্টা, সেখানে যেতে আধ ঘণ্টা আর ফিরতে আধ ঘণ্টা—সর্বসমেত মোট তিন ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা সময় আর কতটা? আমি বলবো পরিস্থিতি অনুযায়ী হয় বেশি, নয় তো কম। যাই হোক, একটা সীসের নল মেরামত করতে আমি তিন ঘণ্টা সময় নিয়েছিলাম। অন্য কেউ হলে…।

কিন্তু ঘটনাগুলোকে পর পর সাজিয়ে নিয়ে বলা যাক। ভিয়া দি করোনারিতে বাঁক নিয়ে ঢোকার সময় আমি যখন জোর কদমে দেয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি, তখন শুনতে পেলাম কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলো। ফিরে তাকিয়ে দেখি, ফিড—যে কিনা আমাদের বাড়ির উলটো দিককার বাসা-বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকা। এই বুড়ি, ফিড বেচারীর ছুটো পা-ই গেঁটে বাতে অ্যায়সা ফোলা যে ঠিক হাতির পায়ের মতো দেখায়। হাঁফাতে হাঁফাতে বুড়ি আমাকে বললো, 'ওহ্, আজ কি ধুলোর ঝড়ই না বইছে!…তা তুমি কি এই পথেই যাচ্ছো? আমার এই বাজারের ঝুড়িটা একটু বয়ে দেবে?'

বললাম, আমি খুশী হয়েই তা করবো। তারপর আমার যন্ত্রপাতির

থলেটা অন্য কাঁধে চালান করে দিয়ে ওর ঝুড়িটা তুলে নিলাম। লম্বা ঢিলে কোটের নিচে থামের মতো গোদা গোদা পা দুটোকে টানতে টানতে আমার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করলো বুড়ি। একটু পরেই জিগেস করলো, 'তা ফিলোমেনা কোথায় ?'

'বাড়িতে', আমি জবাব দিলাম। 'তা ছাড়া আর কোথায় থাকবে ?'

'হ্যাঁ বাড়িতে', মাথা নুইয়ে ফিড বললো, 'তা বটেই তো !'

'তা বটেই তো, কেন ?' নেহাত কিছু বলার খাতিরেই প্রশ্নটা করলাম।

'তাই বৈকি···আহা, বেচারা !'

আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে শুরু করলাম। একটা মুহূর্তকে পেরিয়ে যেতে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আবার 'আহা বেচারা' কেন ?'

'কারণ তোমার জন্যে আমি দুঃখিত', হতকুচ্ছিত বুড়িটা আমার দিকে না তাকিয়েই বললো।

'তার মানে, কি বলতে চাইছেন আপনি ?'

'বলতে চাইছি, এখন আর সে দিন-কাল নেই···আমার কালে মেয়েরা যেমন ছিলো, এখন আর তেমনটি নেই।'

'কেন ?'

'আমার সময়ে পুরুষ-মানুষ বাড়িতে বউ রেখে নিশ্চিন্ত মনে বেরুতে পারতো···যেমনটি রেখে যেতো, ফিরে এসে ঠিক তেমনটিই দেখতো। কিন্তু আজকাল···'

'আজকাল, কি ?'

'আজকাল আর তেমনটি নেই।···যাক গে···আমার ঝুড়িটা দাও বাপু, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

সুন্দর সকালটার সবটুকু আনন্দই ততক্ষণে আমার মধ্যে বিষ হয়ে উঠেছে। ঝুড়িটা টেনে নিয়ে বললাম, 'ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে না বললে ঝুড়ি দেবো না।···ফিলোমেনা এ সবের মধ্যে আসে কি করে ?'

'সে আমি কিছু জানি নে। তবে আগে থেকে সাবধান করে দেওয়া,

আর আগে থেকে যুদ্ধের জন্য তৈরি করে দেওয়া—একই কথা।'

'কিন্তু আমাকে বলুন', আমি চিৎকার করে বললাম, 'ফিলোমেনা কি করেছে?'

'আদালগিজাকে জিগেস করো,' জবাব দিলো ফিড। এবং এবারে ঝুড়িটা হাতিয়ে নিয়ে সে এমন ভাবে প্রায় ছুটতে শুরু করলো যে বুড়ি অতটা তৎপর হতে পারে বলে আমি জানতামই না।

স্থির করলাম, এখন আর দোকানে যাওয়া অর্থহীন। তাই মুখ ঘুরিয়ে আদালগিজার খোঁজ করতে গেলাম। ভাগ্যক্রমে আদালগিজা ভিয়া দি করোনারিতেই থাকে। ফিলোমেনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমি আর আদালগিজা বিয়ের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম। ও এখনও অবিবাহিতা, তাই আমার সন্দেহ হলো—ও-ই ফিলোমেনার সম্পর্কে এই গল্পটা ফেঁদেছে।...পাঁচ তলা অব্দি সিঁড়ি ভেঙে উঠে আমি ওর দরজায় দমাদম ঘুঁষি মারতে লাগলাম। ও এত দ্রুত দরজাটা খুলে দিলো যে আর একটু হলে আমি ওর মুখেই মেরে বসেছিলাম প্রায়। ওর জামার হাতা গোটানো, হাতে লম্বা হাতলওয়ালা একটা ঝাড়ু। ভীষণ তীক্ষ্ণ গলায় আদালগিজা বললো, 'জিনো! কি চাই তোমার?'

আদালগিজা ছোট্টখাট্টো চেহারার মেয়ে, আকর্ষণীয়া। কিন্তু মাথাটা একটু বেশি বড় আর চিবুকটা একটু বেশি প্রকট। ওই চিবুকের জন্যে সবাই ওকে ইস্কাপনের বিবি বলে। সেটা অবশ্যই মুখের ওপরে বলার মতো কথা নয়। কিন্তু আমি তখন এতই তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছি যে বললাম, 'তাহলে ইস্কাপনের বিবি, তুমিই কি ফিলোমেনার সম্পর্কে এ সমস্ত কথা রটাচ্ছো যে আমি যখন দোকানে থাকি তখন ও বাড়িতে এমন সব কাজ করে, যা ওর করা উচিত নয়?'

ক্রুদ্ধ দুটো চোখ আমার দিকে স্থির করলো আদালগিজা, 'ফিলোমেনাকে তুমি চেয়েছিলে...এখন তো ওকেই পেয়েছো।'

ভেতরে ঢুকে আমি হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে ফেললাম। কিন্তু তক্ষুনি ছেড়ে দিলাম, কারণ ও প্রায় আশাতুর দৃষ্টিতেই আমার দিকে

তাকিয়ে ছিলো।

'তাহলে তুমিই সেই ব্যক্তি?' প্রশ্ন করলাম।

'আমি নই···আমি যা শুনেছি, শুধু তাই বলেছি।'

'কার কাছ থেকে শুনেছো?'

'গিয়ানিনা।'

কিছু না বলে আমি বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালাম। কিন্তু ও আমাকে পেছন দিকে টেনে আনলো, উত্তেজনা জাগিয়ে তোলার মতো দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাকে ইস্কাপনের বিবি বলে ডেকে যেও না।'

'কেন, তোমার চিবুকটা কি ইস্কাপনের মতো নয়?' নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে আমি দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম।

এতক্ষণে আমার খারাপ লাগতে শুরু করেছে। বিয়ের পর তিন বছর ধরে ফিলোমেনা যেভাবে সমস্ত রকমের অপর্যাপ্ত স্নেহপ্রীতি দিয়ে আমাকে ভরিয়ে রেখেছে, তাতে ও যে আমাকে ঠকাতে পারে, তা আমার আদৌ সম্ভব বলে মনে হয়নি। কিন্তু ঈর্ষা যে কি বিষম বস্তু! এখন ফিড আর আদালগিজার মন্তব্যের আলোতে ওই সমস্ত প্রেম-প্রীতির নিদর্শনই আমার কাছে বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ বলে মনে হতে লাগলো। বেশ, দেখা যাক।··

ওই একই রাস্তায়, কাছেই একটা পানশালায় গিয়ানিনা কোষাধ্যক্ষের কাজ করে। মেয়েটার গায়ের রঙ হালকা সোনা, চুলগুলো মসৃণ, চোখ দুটো টলটলে নীল, স্বভাব ধীর স্থির ভাবুক প্রকৃতির। আমি ক্যাশ-টেবিলের কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে ওকে বললাম, 'বলো তো, আমার অনুপস্থিতিতে ফিলোমেনা বাড়িতে লোকজন নিয়ে এসে তাদের আপ্যায়ন করে—এ গল্পটা কি তুমিই আবিষ্কার করেছিলে?'

গিয়ানিনা একজন খদ্দেরকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। গণন-যন্ত্রের চাবি টিপে টিকিটটা টেনে বার করে, ও মুখ না তুলেই বললো, 'দুটো কফি···,' এবং তারপরেই শান্ত গলায় আমাকে বললো, 'তুমি আমাকে

কি বলছিলে, জিনো ?'

প্রশ্নটা আমি পুনরাবৃত্তি করলাম। খদ্দেরকে খুচরোটা মিটিয়ে দিয়ে গিয়ানিনা বললো, 'ত্থাখো জিনো, ফিলোমেনা আমার সব চাইতে প্রিয় বান্ধবী। তুমি কি সত্যি মনে করো, আমি ওর সম্পর্কে ওই ধরনের একটা গল্প আবিষ্কার করে বসবো ?'

'তাহলে আদালগিজা নিশ্চয়ই ওটা স্বপ্নে দেখেছে।'

'না,' ও আমাকে শুধরে দিলো, 'আদালগিজা স্বপ্ন দেখেনি বা আমিও গল্পটা আবিষ্কার করিনি। তবে আমি যা শুনেছিলাম, ওকে তাই-ই বলেছি।'

'কি দারুণ বন্ধু!' আমি চিৎকার না করে পারলাম না।

'কিন্তু আমি ওকে এ কথাও বলেছিলাম যে ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস করি না···আদালগিজা নিশ্চয়ই তোমাকে সে কথা বলেনি।'

'কথাটা তোমাকে তাহলে কে বলেছে ?'

'ভিনসেনজিনা···বিশেষ করে ওই কথাটা বলার জন্যেই ও ধোবিখানা থেকে এখানে চলে এসেছিলো।'

গিয়ানিনার কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই আমি সোজা ধোবিখানায় ছুটে গেলাম। রাস্তা থেকেই দেখলাম, ভিনসেনজিনা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে দু হাত দিয়ে ইস্ত্রি ঘষছে। ভিনসেনজিনা মেয়েটি ছোট্টখাট্টো, বেড়ালের মতো থোবড়ানো মুখ, গায়ের রঙ খুব ঘন আর বেশ ছটফটে। জানতাম, আমার প্রতি ওর দুর্বলতা আছে এবং সত্যি সত্যি আমি আঙুল নেড়ে ইশারা করতেই ও সঙ্গে সঙ্গে ইস্ত্রি রেখে বেরিয়ে এলো। আশাভরা সুরে বললো, 'জিনো, তোমাকে দেখে যে কি ভালোই লাগছে!'

'বেহায়া মেয়ে,' আমি জবাব দিলাম। 'আচ্ছা, এ কথা কি সত্যি যে তুমি চারদিকে রটিয়ে বেড়াচ্ছো, আমি যখন দোকানে থাকি তখন ফিলোমেনা বাড়িতে পুরুষমানুষ এনে তাদের আদর-আপ্যায়ন করে ?'

বহির্বাসের পকেটে হাত ঢুকিয়ে, এধারে সেধারে হেলেদুলে,

খানিকটা বিষণ্ণ সুরে ও বললো, 'যদি করেই থাকে, তবে তুমি কি তাতে কিছু মনে করবে?'

'আমার কথার জবাব দাও। তাহলে তুমিই কি এই নোংরা গল্পটা বের করেছো?'

'ওহ্, কি হিংসুটে তুমি!' দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে ভিনসেনজিনা বললো, 'মেয়েরা বুঝি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একটু গল্প গুজবও করতে পারবে না?'

'তাহলে তুমিই...'

'সত্যি তোমার জন্যে আমি দুঃখিত।' বদমাশ মেয়েটা আচমকা বলে বসলো, 'তোমার বউয়ের ব্যাপারে আমার মাথাব্যথা হতে যাবে কেন, বলো তো? আমি কিছুই বের করিনি। কথাটা আমাকে বলেছিলো আগনেস...লোকটার নাম পর্যন্ত ও জানে।'

'কি নাম তার?'

'সেটা তুমি বরং ওর কাছ থেকেই জেনে নিও।'

এতক্ষণে আমি নিঃসন্দেহ হয়ে উঠেছি, ফিলোমেনা আমাকে ঠকিয়েছে। এমন কি লোকটার নামও জানাজানি হয়ে গেছে। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমার মনে হলো, আমার থলেতে বুঝি কোন ভারি যন্ত্রপাতি নেই...কিংবা হয়তো আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যেতে পারে, আমি ওকে খুন করে ফেলতে পারি। আমি বিশ্বাস করতেই পারছিলাম না যে ফিলোমেনা...আমার স্ত্রী...অন্য একটা লোকের সঙ্গে...

আগনেস ওর বাবার তামাকের দোকানে সিগারেট বিক্রি করে। সেখানে গিয়ে আমি কাউন্টারের ওপরে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, 'দুটো নাজিয়োনালি।'

আগনেস সতেরো বছরের তরুণী, মাথায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা খসখসে শুকনো চুলের অরণ্য, মুখটা ফুলোফুলো, ফ্যাকাশে—তাতে হালকা লালচে পাউডারের প্রলেপ, চোখ দুটো এক জোড়া জামের মতো কালো। ভিয়া দি করোনারির অন্য সকলের মতো আমিও ওকে

চিনতাম। এবং সকলের মতো এ কথাও জানতাম যে মেয়েটার টাকা-অন্ত প্রাণ, টাকার জন্যে ও নিজের আত্মাটাও বিকিয়ে দিতে পারে। ও সিগারেট দিতেই আমি একটু নিচু হয়ে ওকে জিগেস করলাম, 'বলো, কি নাম লোকটার?'

'কার নাম?' অবাক হলো মেয়েটা।

'আমার স্ত্রীর পুরুষ-বন্ধুর।'

আমার মুখে নিশ্চয়ই একটা কদর্য অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিলো, মেয়েটা আতঙ্কগ্রস্তের মতো আমার দিকে তাকালো। তারপর তাড়াতাড়ি বললো, 'আমি ও ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না।'

'আরে বলোই না,' আমি হাসার চেষ্টা করলাম। 'অ্যাদ্দিনে সবাই ব্যাপারটা জেনে গেছে, শুধু আমিই জানি না।'

আগনেস আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। তাই ফের বললাম, 'এই ছাখো—কথাটা বললে, আমি তোমাকে এটা দেবো।' তারপর সেদিন সকালেই মেরামতির পারিশ্রমিক বাবদ যে হাজার লিরার নোটটা পেয়েছিলাম, সেটা পকেট থেকে বের করলাম।

নোটটা দেখেই মেয়েটা এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলো, যেন আমি ওকে ভালোবাসার কথা শুনিয়েছি। ওর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো, চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো, তারপর নোটটা ধরে নিচু গলায় বললো, 'মারিয়ো।'

'তুমি এটা কি করে জানলে?'

'আপনি যে বাড়িতে থাকেন, সে বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকার কাছ থেকে।'

তাহলে ঘটনাটা সত্যি। এ যেন ঠিক 'ঠাণ্ডা-গরম' খেলার মতো। এখন ঘটনাটা নিয়ে আমরা আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি, শীগগিরি আমার ফ্ল্যাটে গিয়ে ঢুকবো।...কয়েকটা বাড়ির পরেই আমাদের বাড়ি, তামাকের দোকান ছেড়ে আমি জোর কদমে সেদিকে পা চালালাম এবং যেতে যেতে বারবার 'মারিয়ো' নামটা আবৃত্তি করতে লাগলাম। নামটা

বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিচিত সব কটা মারিয়ো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো—গয়লা মারিয়ো, আলমারি বানিয়ে মিস্ত্রি মারিয়ো, সবজীওয়ালা মারিয়ো…মারিয়ো, যে এককালে পল্টনে সৈনিক ছিলো, এখন বেকার…যে লোকটা শুয়োরের মাংস বিক্কিরি করে, তার ছেলে মারিয়ো,…মারিয়ো মারিয়ো মারিয়ো…রোমে নিশ্চয়ই লাখ দশেক মারিয়ো বাস করে এবং তাদের মধ্যে কয়েকশো অবশ্যই ভিয়া দি করোনারিতে।

সদর দরজায় ঢুকে সোজা তত্ত্বাবধায়িকার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। ফিডের মতো এ বুড়িটারও মুখে ভারি গোঁফ—দু পায়ের মাঝখানে একটা পা গরম করার চুল্লি নিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছিলো, কোলের ওপরে একগাদা চিকারি। দরজার ভেতরে মাথা গলিয়ে বললাম, 'আমি যখন বেরিয়ে যাই, তখন ফিলোমেনা মারিয়ো নামে একটা লোককে আপ্যায়ন করে—এ গল্পটা কি আপনিই বের করেছেন?'

বিরক্ত হয়ে মহিলা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো, 'কেউই কিছু বের করেনি …আপনার গিন্নী নিজেই কথাটা আমাকে বলেছেন।'

'ফিলোমেনা?'

'হ্যাঁ। উনিই আমাকে বলেছেন যে, এমন এমন দেখতে একটি অল্প-বয়সী পুরুষমানুষ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন, তাঁর নাম মারিয়ো। জিনো বাড়িতে থাকলে তাকে ওপরে যেতে বারণ করবেন। কিন্তু জিনো যদি না থাকে, তাহলে তাকে আসতে বলবেন।…তা, এখন তিনি ওপরেই আছেন।'

'এখন সে ওপরে আছে?'

'নিশ্চয়ই আছেন…প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে উনি ওপরে গিয়েছেন।'

তাহলে মারিয়োর যে শুধু মাত্র অস্তিত্বই আছে তা নয়—এক ঘণ্টা ধরে ফিলোমেনার সঙ্গে সে ফ্ল্যাটের মধ্যেই রয়েছে। ঝটিতি চার তলায় উঠে গিয়ে আমি দরজায় ধাক্কা দিলাম। ফিলোমেনা এসে দরজাটা খুলে দিলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমি লক্ষ্য করলাম, স্বভাবত শান্ত ধীর ফিলো-

মেনার দু চোখে আতঙ্কের দৃষ্টি। বললাম, 'তাহলে আমি যখন এখানে থাকি না, তখন মারিয়ো তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে।'

'কিন্তু তুমি এমন করে…'

'আমি সব জানি,' চিৎকার করে উঠে আমি ভেতরে ঢুকতে গেলাম।

কিন্তু ফিলোমেনা আমার পথ আগলে দাঁড়ালো, 'একটু শান্ত হও… এতে তোমার কি হয়েছে? তুমি বরং একটু বাদে ঘুরে এসো।'

এ কথায় আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'আচ্ছা! তাহলে এই কথা? এতে আমার কিছু হওয়ার কথা নয়?' তারপর ওকে ধাক্কা মেরে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে এক ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম, মারিয়ো সত্যি সত্যি সেখানে রয়েছে—টেবিলের পাশে বসে কফি খাচ্ছে। কিন্তু এ মারিয়ো আলমারি বানিয়ে ছুতোর মিস্ত্রি নয়, সবজীওয়ালা নয়, মাংসওয়ালার ছেলে নয়—বাড়িতে আসার পথে আমি যে সব মারিয়োদের কথা ভেবেছিলাম, ও তাদের মধ্যে কেউই নয়। এ মারিয়ো হচ্ছে ফিলোমেনার ভাই, সিঁদ কেটে চুরি করার দায়ে যে দু বছর ধরে কয়েদখানায় ছিলো। একদিন ও ফাটক থেকে বেরুবে জেনেই আমি ফিলোমেনাকে বলেছিলাম, 'মনে রেখো, আমি চাই না ও কোনদিনও আমার বাড়িতে আসুক…ওর নামটাও আমি শুনতে চাই না।' কিন্তু ভাই চোর হওয়া সত্ত্বেও বেচারী ফিলোমেনা ওকে ভালোবাসে—তাই ঠিক করেছিলো আমি যখন বাড়িতে থাকবো না, তখন ও ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে।

মারিয়ো আমার অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। আমি বেদম হয়ে ওকে বললাম, 'কি খবর, মারিয়ো—'

'আমি চলে যাচ্ছি,' মারিয়ো হোঁচট খেতে খেতে বললো, 'আপনি …আপনি কোন চিন্তা করবেন না…আমি…আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি? কাণ্ড দেখে যে কেউই মনে করবে, আমার

বুঝি প্লেগ হয়েছে।'

শুনতে পেলাম ফিলোমেনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। যা করে ফেলেছি তার জন্যে এখন আমার লজ্জা করতে শুরু করলো। বিভ্রান্ত হয়ে বললাম, 'না না, তুমি থাকো···আজকের দিনটা থাকো···রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া করে যেও। না কি, তুমি কি বলো ফিলোমেনা?' ফিলোমেনা দরজার কাছে এসে চোখ মুছছিলো। আমি ওর দিকে ফিরে বললাম, 'রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া সেরে যাওয়াই তো ভালো, তাই না?'

ব্যাপারটা ঠিকঠাক করে নেবার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। তারপর শোবার ঘরে ফিলোমেনাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে, ওকে একটা চুমু দিয়ে আবার আমরা শান্তি স্থাপন করে ফেললাম। কিন্তু রসালো গুজবের প্রশ্নটা তখনও রয়ে গেছে। একটু কাল ইতস্তত করে আমি মারিয়োকে বললাম, 'এসো মারিয়ো···আমার সঙ্গে কারখানায় যাবে চলো। হয়তো আমার কর্তা তোমাকে কোন কাজটাজ দিতে পারবেন।' ও আমার পেছন পেছন বেরিয়ে এলো। সিঁড়িতে এসে ফের বললাম, 'এখানে কেউ তোমাকে চেনে না···গত কয়েক বছর তুমি মিলানে কাজ করতে—বুঝেছো?'

'ঠিক আছে।'

নিচে নেমে তত্ত্বাবধায়িকার ঘরে গিয়ে আমি মারিয়োর হাত ধরে ওকে পরিচয় করিয়ে দিলাম, 'এই হচ্ছে মারিয়ো, আমার শালা। এই সবে ও মিলান থেকে এসেছে···এখন থেকে আমাদের সঙ্গেই থাকবে।'

'খুবই আনন্দের কথা, আমি···'

'আনন্দটা সম্পূর্ণই আমার,' রাস্তায় বেরিয়ে এসে আমি ভাবলাম। এই সমস্ত মেয়েমানুষগুলোর কচকচানির জন্যে আমি হাজার লিরা নষ্ট করলাম আর এখন লাভের মধ্যে একটা চোরকে বাড়িতে এনে ঢোকালাম।

নির্দেশ

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিলো এভাবে। আমি একটা অফিসে সচিবের পদে কাজ করি। সেদিন অফিস থেকে ফিরে আমি একটি ঘণ্টা আমার দু-ঘরের ফ্ল্যাটটা গোছগাছ করে কাটিয়েছিলাম। আমি মানুষটা ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করি। বাড়ির মধ্যে কোথাও একটা নোংরা ছাইদান রয়েছে অথবা একটা তোয়ালে বেজায়গায় রয়েছে জানলে, আমি মোটেই স্বস্তি পাই নে। তাই সেদিনও ভালো করে ঝাঁড় দিয়ে, ধুলো ময়লা সাফ করে আমি সবকিছু ঝকঝকে করে তুলেছিলাম—যদিও জানতাম, ইতিমধ্যে সকালবেলায় ঝি এসে আমি এখন যা করছি তা সবই করে গেছে। যখন নিশ্চিন্ত হলাম যে সব কিছুই ঠিক ঠিক জায়গা মতো রয়েছে, তখন আমি সেই ব্যাপারটা করতে বসে গেলাম, যেটাকে আমি গোপনে 'মগজ ধোলাই' বলে থাকি। জিনিসটাকে যেন রাজনৈতিক কোন ব্যাপার বলে মনে করা না হয়, আসলে ওটা একটা ভীষণ ব্যক্তিগত ব্যায়াম। ব্যাপারটা হচ্ছে : আমি তখন কোন বিষয় বা বস্তু ছাড়াই ভাবতে চেষ্টা করি—তার মানে বলতে গেলে, আমি চিন্তার কথা চিন্তা করতে চেষ্টা করি। অর্থাৎ কিনা আমি আমার ভাবনাটাকে আঁট করে তুলি, যেমন করে একজন তার হাতের মাংসপেশীকে আঁট করে তোলে। কিন্তু আমি তখন কোন কিছুই চিন্তা করি না, শুধু ওই আঁট অবস্থাটাকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলি। কেন অমন করি? জানি না। হয়তো চিন্তা করলেই কোন অর্থহীন, তুচ্ছ, অথবা হতোদ্যম হয়ে ওঠার মতো কোন কথা চিন্তা করি—তাই। কিংবা যে সম্ভাবনাটা আরও বেশি—নেহাত সময় কাটাবার জন্যেই অমন করি।

এবং তখনই, একেবারে আচমকা, আমার শূন্য চিন্তার ভিড়ের মধ্য থেকে—ঘূর্ণি জলের মাতন থেকে সমুদ্রে পড়া মাছের মতো—একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ো।' একেবারে আদেশ।

কথাটা শোনার চাইতে আমি অনুভবে আরও বেশি করে বুঝলাম যে, এ আদেশ অমান্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—কোনদিনও সম্ভব হবে না। অতএব আমি উঠে দাঁড়ালাম, তারপর হাতব্যাগ আর গাড়ির চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় বেরুতেই কণ্ঠস্বরটা আমায় নির্দেশ দিলো, 'গাড়িতে ওঠো, গাড়ি চালিয়ে পন্তে মিলভিওর দিকে চলো।' আমি ভিয়া ফ্লামিনিয়াতে থাকি, কাজেই পন্তে মিলভিও খুব একটা দূরে নয়। গাড়ি চালিয়ে চললাম শান্ত আয়েসী মেজাজে, যেটা আমার কাছে একেবারে নতুন—কারণ এমনিতে আমি ভীষণ ভীতু। তখন বেলা ছটার শেষ বিকেল, বেশ গরম। মাঝেমাঝেই আমি গাড়ি চালানোর চাকার নিচে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি নিয়ে টান টান হয়ে থাকা আমার পা ছুটোর দিকে তাকিয়ে নিচ্ছিলাম। আমার বয়েস চল্লিশ এবং পা ছুটো আমার শরীরের সব চাইতে সুন্দর অংশ। আমি তা জানি, আর তাই পা ছুটো যথাসম্ভব দেখিয়েও থাকি! কিন্তু ওইদিন আমার পায়ের সৌন্দর্যের মধ্যে প্ররোচনা যোগাবার মতো কিছু ছিলো না—শুধু যেন শান্ত এবং বাস্তব একটা পদার্থ। অস্তিত্ব আছে, আর সেটুকুই যেন যথেষ্ট।

পিয়াজেল দি পন্তো মিলভিওতে কণ্ঠস্বরটা আমাকে ভিয়াল তোর দি কুইনতো ধরে পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াবার নির্দেশ দিলো এবং বলা বাহুল্য আমি তা পালন করলাম। অবিশ্যি বিনা প্রতিবাদে নয়: 'এটা একটা বাজে জায়গা, ভীষণ আজেবাজে লোক এখানে ঘুরে বেড়ায়।' কণ্ঠস্বরটা তাতে দৈববাণীর মতো জবাব দিলো, 'সেটাই তোমার দরকার।' অতএব আমি নিতান্ত অনুগতের মতো বড় বড় পাতা-ওয়ালা প্লেন গাছগুলোর তলা দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগলাম। গাছের গুঁড়িগুলোর মাঝে মাঝে যথারীতি তিন বা চারজনের এক একটা দলে বাজারে মেয়েমানুষগুলোকে দেখা যাচ্ছিলো। নিঃসঙ্গ এক একটা মানুষকে নিয়ে গাড়িগুলো সেখানে এসে খানিকক্ষণ থেমে দাঁড়াচ্ছিলো, তারপর আবার চলে যাচ্ছিলো। আরও খানিকটা দূরে এসে ছুটো প্লেন

গাছের মাঝখানে আমি একটা তরমুজের দোকান দেখতে পেলাম। কণ্ঠস্বরটা বললো, 'থামো, গাড়ি থেকে নামো, গিয়ে এক চিলতে তরমুজ খাও।'

দোকানের কাউন্টারে এক সারি তরমুজ। তলার দিকগুলো প্রায় নীলচে সবুজ। ধুলো ভর্তি, কিন্তু লোভনীয়। তরমুজ বিক্রেতা এক বিশাল চেহারার মহিলা—ছোট্ট লাল মুখ, বুক দুটো বিপুল আকৃতির। দেখে মনে হয়, মহিলা বোধহয় ব্লাউজের নিচে গোটা কতক তরমুজ ঢুকিয়ে রেখেছেন। আমার অভিজাত চালচলনের দিকে উনি কোন রকম খেয়ালই করলেন না, কারণ ওঁর কাছে আমি অন্য যে কোন মেয়ের মতোই শুধু একজন খদ্দের মাত্র। 'আমি আপনাকে সত্যিকারের সুন্দর একটা টুকরো দেবো,' মহিলা এমন পেটুকের মতো কথাটা বল-লেন, যেন উনিই টুকরোটা খেতে যাচ্ছেন। তারপর অনেক কষ্টে কাউন্টারের পেছনে একটু নড়াচড়া করে একটা বরফের চাঙড়ের ওপরে আগে থেকে কেটে রাখা এক সারি টুকরোর ভেতর থেকে একটা টুকরো পছন্দ করে তুলে আনলেন। এক হাতে টুকরোটা নিয়ে, অন্য হাতের আঙুলগুলো আমি পয়সা তোলার জন্যে পকেটে ঢোকালাম। ঠিক সেই মুহূর্তে একখানা হাত আমার হাতটা চেপে ধরলো। মুখ ফিরিয়ে আমি লোকটার দিকে তাকালাম। লোকটার বয়েস অল্প—রোদে তেতে ওঠা লাল মুখ, একরাশ সাদা চুল আর নিষ্ঠুর ঝকঝকে দুটি নীল চোখ। কণ্ঠস্বরটা এবারে খুবই বিশদ ভাবে নির্দেশ দিলো : 'শান্তভাবে তরমুজের টুকরোটা খেয়ে নাও। তারপর লোকটাকে অনুসরণ করে টাইবারের দিকে যাও। কিন্তু সাবধান—মাঠে যখন ঘাসের ওপরে শোবে তখন তোমার পশমী জামায় যেন নোংরা সবুজ ছাপ না ধরে, কাঁটাফলে স্কার্টটা যেন না ছেঁড়ে। ও যদি তোমার কাছে টাকা চায়, তো দিয়ে দিও। যদি না দাও, তাহলে ও নিজেই তা নিয়ে নেবে।'···ওহ্, কত কথাই না মনে পড়ে! সেদিন আমাকে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো, আমি ঠিক তাই-ই করেছিলাম।

কদিন কণ্ঠস্বরটা নীরব ছিলো, তারপর একদিন বিকেল বেলায় আমাকে বেরিয়ে পড়ার আদেশ দিলো। এবারে অবিশ্যি ভিয়াল তোর দি কুইনতোতে নয়—আমাকে যেতে হবে পিয়াজা দি স্পাগনায়। আদেশ মতো আমি পিয়াজা অবধি গাড়ি চালিয়ে গেলাম, গাড়িটা দাঁড় করালাম এবং তারপরেও নির্দেশ অনুযায়ী ভিয়া দেল বাবুইনোর দিকে হাঁটতে লাগলাম। সেখানে আমি কি করতে যাচ্ছি তা কিছুই জানতাম না, তাই নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমাকে নেহাতই বিপর্যস্ত করে দিয়ে নির্দেশটা এলো এই ভাবে : 'সেকেলে জিনিসপত্র বিক্রি করার যে দোকানটা প্রথমে পড়বে, সেখানে গিয়ে যে কোন একটা জিনিস দেখাতে বলো। ওরা যখন সে জিনিসটা খুঁজতে শুরু করবে, তখন ছোট্ট একটা রূপোর কৌটো তুলে নিয়ে তোমার ব্যাগে রেখে দাও।' খুব সঙ্গতভাবেই আমি তৎক্ষণাৎ এর প্রতিবাদ জানালাম, 'কিন্তু একে তো চুরি করা বলে!' কণ্ঠস্বরটা এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে বললো, 'যা বলছি তাই করো, বোকা কোথাকার!' আমি আর কি করি? এখন আমাকে বোকাও বলছে! তাই আদেশ পালন করলাম। দোকানে ঢুকে দূরের একটা তাকের দিকে আঙুল তুলে জিগেস করলাম, 'ওই মাটির বেড়ালটা একটু দেখতে পারি?' গেঁটে বাতগ্রস্ত বৃদ্ধ দোকানি আমার দিকে পেছন ফিরে তাকটার দিকে এগিয়ে গেলেন। আর সেই অবকাশে আমি ক্ষিপ্র হাতে টেবিল থেকে একটা রূপোর নস্যদান তুলে নিয়ে সেটা হাতব্যাগের মধ্যে বন্ধ করে রাখলাম। তারপর মাটির বেড়ালটা আমার পছন্দ নয় বলে, দোকান থেকে বেরিয়ে গেলাম।

ইতিমধ্যেই যে সমস্ত ছোটখাটো অপরাধ এবং অন্যায় কাজের সঙ্গে আমি জড়িত হয়ে পড়েছিলাম, কণ্ঠস্বরটা আমাকে যে শুধুমাত্র সে সব করার জন্যেই আদেশ দিতো—সে কথা ভাবলে চলবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদেশগুলো হতো খাপছাড়া অথবা অদ্ভুত ধরনের। যেমন, একদিন আমাকে একেবারে চরম আপসহীন কেতায় আদেশ দিয়ে বসলো, 'বাড়িতে থাকো।' আমি জবাব দিলাম, 'বাড়িতেই তো রয়েছি।'

কণ্ঠস্বর বললো, 'তিনদিন এখানেই থাকো।' 'অফিসের কি হবে?' 'টেলিফোনে জানিয়ে দাও, তুমি সুস্থবোধ করছো না।' অতএব আদেশ পালন করে তিনটে দিন আমি বাড়িতেই রইলাম—আমার দুখানা ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম—বিছানা থেকে সোফা, সোফা থেকে আরামকুর্সির মধ্যে চলাচল করলাম। ভাগ্যিস বাড়িতে কিছু খাবার-দাবার ছিলো, নয়তো খিদেতেই মারা পড়তাম। কিন্তু আমার বন্দীদশা শেষ হবার পর কণ্ঠস্বরটা আমাকে কি বললো, জানতে চান? 'বেশ করেছো। পরের বার তুমি একটি বছর বাড়িতে থাকবে।'

ওই আদেশটির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমি অন্যান্য আদেশগুলোও পালন করে চলছিলাম—যেগুলোর সবই প্রচণ্ড পরিমাণে বেয়াড়া এবং খাপছাড়া। যেমন, একদিন রাত তিনটে নাগাদ আদেশ হলো, 'ওঠো। যেমন ভাবে আছো ঠিক তেমনি ভাবে—রাত্রিবাস পরা অবস্থাতেই—উঠে গিয়ে তোমার প্রতিবেশীর দরজায় ঘন্টি বাজাও। তাকে বলো, তুমি ভয় পেয়েছো।' বৃথাই আমি জানালাম, যে আমি একটুও ভয় পাইনি। কণ্ঠস্বরটা তাতে বললো, আমি একটা বোকা এবং এ আদেশ আমাকে মানতেই হবে। ওই একই তলায় আমার প্রতিবেশী একজন পেনশনজীবী বৃদ্ধ—একাই থাকেন। কে জানে—এত রাতে রাত্রিবাস পরা একটি মহিলা তাঁর দরজায় আঘাত করছে, এটা সম্ভবত তাঁর কাছে সম্পূর্ণ বিসদৃশ বলে মনে নাও হতে পারে। আমতা আমতা করে তাঁকে জানালাম, আমি ভয় পেয়েছি এবং তিনি তক্ষুনি সহৃদয়ভাবে আমাকে তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক কিসের যেন একজন অধ্যাপক ছিলেন, সমস্ত ঘরটা বইপত্রে ঠাসা। এলোমেলো চুলে ঢিলে বহির্বাস পরা অবস্থাতেই তিনি টেবিলের কাছে গিয়ে বসলেন, আমি আশ্রয় নিলাম তাঁর মুখোমুখি—আরামকুর্সিটার মধ্যে। পিতৃসুলভ ভঙ্গিমায় তিনি আমাকে অনেক প্রশ্নই করলেন। কিন্তু কণ্ঠস্বরটা তখন আমার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বললো, 'আমার সম্বন্ধে কিছু বললে, আমি তোমাকে খুন করে ফেলবো।' অতএব যে

ব্যাপারটা সব চাইতে জরুরী, আমি সেটার সম্পর্কেই সম্পূর্ণ নীরব হয়ে রইলাম। শেষটাতে আমার প্রতিবেশী, ওই ভালোমানুষটি, আমাকে খানিকটা কড়া চা করে দেবার জন্যে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আর তারপরেই কণ্ঠস্বরটা আমাকে হুকুম করলো, 'এক ছুটে ঘরে চলে যাও।' আমিও সত্যি সত্যি ঠিক তাই-ই করলাম—খালি পায়ে নিজের ফ্ল্যাটে ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে, ফের বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

কণ্ঠস্বরের অন্যান্য সমস্ত হুকুমই নিখুঁতভাবে তামিল করা হচ্ছিলো। যেমন, 'অফিসে তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করে, তাঁকে প্রেম নিবেদন করো।' 'ফ্রিগেনে গিয়ে রাত্রিটা সমুদ্রসৈকতে শুয়ে ঘুমোও, ভোরবেলা সমুদ্রের তীর ধরে হাঁটো।' 'এক বোতল ব্রাণ্ডি কিনে অর্ধেকটা খাও (অর্ধেকটা কেন ?), তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ো।' 'টেলিফোনে যেমন খুশি এলোপাথাড়িভাবে একটা নম্বর ঘোরাও। যেই সাড়া দিক না কেন, তাকে ঠিক এই কথাগুলো বলো : এ বছরে সমুদ্রটা চৈনিক, দেশটা বলিভিয়ান আব বাতাসটা তুর্কী দেশীয়।' 'একটা কচ্ছপ কেনো, তারপর সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে ঘুরে বেড়াও।' এবং আরও ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ হয়তো জানতে চাইবেন, আমার মনিব প্রেম-নিবেদনের ব্যাপারটা কি ভাবে নিয়েছিলেন। তা সেটাকে উনি খারাপ ভাবেই নিয়েছিলেন, আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তখন এই ভেবে স্বস্তি পেয়েছিলাম যে, এখন থেকে হুকুম তামিল করার জন্যে আমার হাতে আরও বেশি সময় থাকবে।

কোন কোন দিন কণ্ঠস্বরটা খামখেয়ালের একেবারে চরম সীমায় পৌঁছে যায়। যেমন আমাকে বলা হলো, 'তোমার যা ইচ্ছে হয়, করো।' কিন্তু যা ইচ্ছে হয়, তাই করতে বলার কোন অর্থই হয় না। একদিন সকাল বেলায় কণ্ঠস্বরটা বললো, 'একটা ভ্রমণ ব্যবস্থাপক সংস্থার কাছে গিয়ে উড়োজাহাজে ইস্তাম্বুলে যাবার একখানা টিকিট কেনো। ইস্তাম্বুলে যাও, সেখানে গিয়ে এক মাস থাকো।' আমি নম্রভাবে বুঝিয়ে বললাম যে আমার কাছে অত টাকা নেই, আর এই তুরস্ক ভ্রমণের মতলবটা

সত্যিই একেবারে পাগলের মতো চিন্তা। কিন্তু কণ্ঠস্বরটা নিষ্ঠুরভাবে জবাব দিলো, 'অত কিপটেমি কোরো না। যা বলছি, তাই করো।' অতএব উড়ে চলে গেলাম ইস্তাম্বুলে। সেই আমার প্রথম উড়োজাহাজে চড়া, ইতালি থেকে সেই প্রথম বাইরে কোথাও গিয়ে থাকা। ইস্তাম্বুল সত্যিই কি সুন্দর! কি সুন্দর সান্তা সোফিয়া! মসজিদগুলোকে আমার কি ভালোই না লাগলো! পাহাড়ের ওপর থেকে বস্‌ফরাসের দৃশ্য কতই না কাব্যিক! কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাত্র তিনদিন পরেই কণ্ঠস্বরটা আমাকে রোমে ফিরে যাবার আদেশ দিলো। আমি যেমন অনুমান করেছিলাম, ওখানে আমি শুধু সেই একটা মাসই নয়—পুরো জীবনটাই কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আদেশ আমাকে মানতেই হবে। তাই আবার সেই রোমে ফিরে এলাম, অপেক্ষায় রইলাম পরবর্তী আদেশের।

কণ্ঠস্বরটা এখন কিছুদিন ধরে নিশ্চুপ হয়ে আছে। আমি কি তাতে খুশি? হ্যাঁ এবং না। আমার মতো একজন মহিলা, যে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করে এবং যার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা নিতান্তই কম, একদিক দিয়ে এটা তার পক্ষে একটা বিহ্বলতা। আবার অন্যদিক দিয়ে একথা বলতেই হয় যে, বিশেষ করে ইদানীং কণ্ঠস্বরটা অতিরিক্ত অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। এখন সমস্ত কিছুই আশা করা যেতে পারে—এমন কি আমি জানলা দিয়ে নিজেকে বাইরে ছুঁড়ে দেবার জন্যেও আদিষ্ট হতে পারি। কিন্তু আত্মহত্যা পর্যন্ত না গিয়েও, যে কোন কারণেই হোক না কেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে শীঘ্রিই আমি এমন একটা আদেশ পাবো যার সম্পর্কে আমাকে আগে থেকেই শাসিয়ে রাখা হয়েছে: 'নিজেকে বাড়িতে বন্ধ করে রাখো—এক বছর বাইরে না বেরিয়ে, সেখানেই থাকবে।' আমার মনে হয়, এর সমাপ্তি এমনি করেই হবে। আর সেটা মনে রেখেই আমি খাবার-দাবার সঞ্চয় করে রাখছি—টিনে করা খাবার, সসেজ, পনীর, বিস্কুট—সব কিছু। কারণ, কখন কি হবে তা কেউই জানে না।

নতুন বাড়িতে এসেই আমি দিব্যি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলাম। শহরতলির একটা নিরিবিলি সম্ভ্রান্ত অঞ্চলে একটা আধুনিক বাড়ির দোতলায় আমার এই তিন ঘরের ফ্ল্যাট। এ পরিতৃপ্তি আমার প্রাপ্যই ছিলো—কারণ সব চাইতে বড় কথা, এটা একটা যেমন তেমন ফ্ল্যাট নয়। এ ফ্ল্যাটটা সত্যি সত্যিই আমার নিজস্ব, আমার কল্পনা আর পছন্দ দিয়ে গড়া। অতএব এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, ফ্ল্যাটটা একেবারে অদ্বিতীয়—কারণ কোন কিছুই অবিকল অন্য একটা জিনিসের মতো হয় না। বেশ কয়েক মাস ধরে পরম যত্নে আমি ছোটখাটো জিনিস দিয়ে ফ্ল্যাটটা সাজিয়েছি, প্রতিটা আসবাব দেখে দেখে কিনেছি। তারপর আরও দুটো মাস ওই একই ধরনের অক্লান্ত নিবিষ্টতায় আসবাবপত্রগুলোকে নিয়ে মোহিত হয়ে থেকেছি—যেমন করে মাঝে মাঝে হয়তো আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকি মুখটাও অদ্বিতীয় বলে, কারণ সে মুখ আমার নিজের।

তাছাড়া ফ্ল্যাটটার মতো বাড়িটাও আমার পছন্দসই। বাড়িটা খুব একটা নতুন নয়, আবার খুব একটা পুরনোও নয়— মাঝামাঝি। রাস্তাটাও বেশ। দুধারে ফুলে ভরা ওলিয়্যানডার, একতলাগুলোতে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন আর বড় বড় জানলাওয়ালা দোকানপাট—সিগারেট, কেশবিন্যাস, সুগন্ধি, রুটি আর প্রসাধনীর দোকান। আমার জানলাটার ঠিক উলটো দিকেই একটা ফুলের দোকান। দোকানের জানলা দিয়ে এক নজরেই গাছপালা, ফুলে ভরা লম্বা ছিপছিপে ফুলদানি আর ছোট্ট করে সাজানো একটা ফোয়ারা চোখে পড়ে। দোকানি মেয়েটি দিব্যি সুন্দরী, গায়ের রঙ ঘন, লম্বা সুগঠিত চেহারা, ধীরেসুস্থে চলাফেরা করে—দেখে বছর পঁচিশের বেশি বয়েস বলে মনে হয় না। দোকানে ও একাই। সকাল বেলা এসে ও দরজাটা ঠেলে তোলে, একটু

ঘোরাফেরা করে ফুলগুলোকে সাজিয়ে নেয়, তারপর খদ্দেরদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। অধিকাংশ সময়ে ও দোকানের মধ্যেই থাকে, কাউণ্টারের পেছনে বসে ছবির বই পড়ে। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার দরজার কাছে এসে রাস্তার দিকেও তাকিয়ে থাকে—সেখানে অবিশ্যি দেখার মতো কিছু থাকেও না বা ঘটেও না।

অবিলম্বে আমি ওই সুন্দরী ফুলওয়ালিকে লক্ষ্য করে ফেললাম এবং যেহেতু এটা সেপ্টেম্বর মাস, আমার বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই এখনও ছুটিতে রয়েছে, আর আমিও অধিকাংশ সময়টা বাড়িতেই থাকি—তাই আমার অনেকটা সময়ই আমি ওর পেছনে ব্যয় করতে লাগলাম।

একটা শিল্পসংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে বলে আমি টেবিলের কাছে বসে কাজ করতাম। কিন্তু প্রতি দশ মিনিট অন্তর অন্তরই উঠে গিয়ে ফুলের দোকানটার দিকে তাকাতাম। দেখতাম, কাউণ্টারের পেছনে বসে মেয়েটি ওর কালো মাথাটা ছবির বইয়ের ওপরে নুইয়ে রেখেছে। অথবা হয়তো দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামান্য একটু সময় ওর দিকে তাকিয়ে থেকে আমি আবার নিজের কাজে ফিরে যেতাম।

শেষ অব্দি মাথায় একটা মতলব এলো। ঠিক করলাম, মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে আমি আয়না দিয়ে ওর গায়ে সূর্যের আলো ফেলবো। মতলবটা আমার কাছে সত্যিকারের নতুন এবং মৌলিক বলেই মনে হলো। তাই ছোট্ট একটা পকেট আয়নার সাহায্যে আমি ফুলের দোকানটার দিকে সূর্যের আলো ঠিকরে দিতে শুরু করলাম। আলোর রশ্মিটা প্রথমে জানলার কাচের ওপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দোকানের সাইনবোর্ডের ওপরে পড়লো। তারপর অনেক প্রচেষ্টায় ছুঁচের ফুটোয় সুতো পড়াবার মতো, সেটা শেষ পর্যন্ত সরু দরজাটার ভেতর দিয়ে গিয়ে একখানা সোহাগ জানানো হাতের মতো মেয়েটির নুইয়ে রাখা মাথার ওপরে স্থির হলো। চুলের মধ্যে খানিকক্ষণ থমকে রইলো আলোটা। শেষে মসৃণভাবে ওর নগ্ন বাহু বেয়ে নেমে এসে

ছবির বইয়ের পাতায় পড়ে, থেকে থেকে একটু নড়াচড়া করতে লাগলো। সামান্য কিছুক্ষণ মেয়েটি পড়েই চললো, তারপর মাথা তুলে দরজার দিকে তাকালো। নিজের দুঃসাহসিকতায় আমি নিজেই তখন প্রায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম, তাড়াতাড়ি ঘরের পেছন দিকটাতে সরে এলাম।

কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই ফের আমি জানলার কাছে এগিয়ে গেলাম। মেয়েটি তখন দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এবারে লক্ষ্য স্থির করে আমি আলোর টুকরোটা ওর দিকেই ফেললাম, পা থেকে আস্তে আস্তে গায়ে—একেবারে বুক অব্দি তুলে আনলাম। তারপরেই আচমকা সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোটা সোজা ওর মুখের ওপরে ফেললাম। এবারে ও চোখ তুলে তাকালো, আমাকে দেখে ছোট্ট করে হাসলো। আমিও মুচকি হেসে এমন একটা ভঙ্গিমা করলাম, যেন বললাম, 'ওপরে চলে এসো। আমার ফ্ল্যাটে এসে একটু দেখা করে যাও'। মেয়েটি একটু ইতস্তত করলো, তারপর হাতের ভঙ্গিমায় ইঙ্গিতে বললো, 'হ্যাঁ যাবো, কিন্তু পরে'। এমন ধারা দ্রুত সফলতায় আমি আনন্দে একেবারে টইটম্বুর হয়ে উঠলাম। কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটা দেখিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কখন'? ও ফের ভাব-ভঙ্গিতেই জবাব দিলো, 'সাড়ে বারোটায়'। ওর দিকে হাত নেড়ে আমি ঘরের মধ্যে ফিরে এলাম, এক পায়ে ভর রেখে পোঁ করে এক চক্কর ঘুরে নিলাম, হাতে হাত ঘষলাম—তারপর আয়নার কাছে গিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই নিজেকে একটা চুমু দিয়ে ফেললাম।

দেখলাম, কাজ করা তখন নিতান্তই শক্ত ব্যাপার। পাঁচ মিনিট বাদে বাদেই আমি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝেই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলাম। দেখছিলাম মেয়েটি কাউন্টারের পেছনেই রয়েছে, মাথা নুইয়ে রেখেছে ছবির বইয়ের ওপরে। একবার লক্ষ্য করলাম, একটি মহিলা-খদ্দেরকে ও কয়েকটা গোলাপফুল পছন্দ করে দিচ্ছে। সামনের দিকে ঝুঁকে ও যখন একরাশ ফুলের মধ্যে নগ্ন বাহুটি এগিয়ে দিয়ে, সাবধানে একটা করে গোলাপ তুলে, আবার সোজা

হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো—তখন লক্ষ্য করলাম ওর শরীরের সুন্দর গড়নটা। মনে হলো, ও সত্যিই ভারি আকর্ষণীয়া—কিন্তু ও যেমন করে অতি সহজে আর রহস্যময়ভাবে আমার আমন্ত্রণে রাজী হয়েছে, তার মধ্যে যেন কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার রয়ে গেছে।

বারোটা বেজে পঁচিশ মিনিটের সময় আমি শেষ বারের মতো জানলাটার তাকের কাছে গেলাম। মেয়েটি তখন ধীর শান্ত রাজকীয় ভঙ্গিমায় দোকানের মধ্যে যাতায়াত করছে, ফুলগুলোকে অন্যরকমভাবে গুছিয়ে রাখছে। তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে এসে সংযতভাবে ও তিন দফায় তিনটে টান মেরে তুলে রাখা দরজাটা নামিয়ে দিলো। লক্ষ্য করলাম ও রাস্তাটা পার হলো, তারপর এ বাড়ির সদর দরজায় ঢুকে উধাও হয়ে গেলো।

উত্তেজনায় আমি বাইরের ঘরে দরজার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। খুশি হয়ে লক্ষ্য করলাম, আগের দিন কিনে আনা ফাইকাস জাতীয় বড়সড় গাছটা দরজার কোণে ভারি সুন্দর লাগছে। তাছাড়া একটু আগে আধুনিক সুইডিশ কেতায় সাজানো বৈঠকখানা ঘরে চোখ বোলাবার সময়ও কথাটা আমার মনে হয়েছিলো। ফ্ল্যাটটা সত্যিই ভারি ছিমছাম আর মৌলিকভাবে সাজানো—আমি নিশ্চিত ছিলাম, এটা মেয়েটির মনে একটা গভীর ছাপ ফেলবেই।

অবশেষে শব্দ শুনে বুঝলাম, বৈদ্যুতিক খাঁচাটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দোতলায় এসে থামলো। তারপর খাঁচাটার দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার শব্দ। অবশেষে বাইরের মেঝেতে জুতোর গোড়ালির আওয়াজ। সামান্য একটু নীরবতা। তারপরেই ঘন্টির আওয়াজ। ও যাতে বুঝতে না পারে যে আমি দরজার পেছনে অপেক্ষা করছিলাম, সে জন্যে পা টিপে টিপে বৈঠকখানা ঘরে ফিরে এলাম এবং পরক্ষণেই যথাসম্ভব শব্দটব্দ করে এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে দিলাম।

সামান্য হতাশ হলাম। দূর থেকে মেয়েটিকে সুন্দরী বলেই মনে হয়েছিলো। কিন্তু সামনাসামনি দেখলে বোঝা যায়, আসলে ওর

বয়েসটা কম আর দেখতেও মোটামুটি মনোরম—এই যা। মেয়েটির গায়ের রঙ ঘন, মুখের নিচের অংশটা সামান্য ভারি, ঠোঁট দুটো অনেকটা লম্বা, নাকটা বাঁকা, চোখ দুটো কালো এবং বড় বড়, মুখের অভিব্যক্তি বোকাটে ধরনের। ভেতরে ঢুকে প্রাদেশিক টানে ও ভালোমানুষের মতো বললো, 'আমার আসা উচিত ছিলো না, কিন্তু আপনাকে স্বাগত জানাতে এলাম। আমরা পাড়া-প্রতিবেশী, তাই এটা শুধু পরিচয় করে রাখা বলতে পারেন।'

'মাপ করবেন,' আমি বললাম, 'কিন্তু ওই আয়নার ব্যাপারটা না হলে আমি কি করে আপনার সঙ্গে পরিচিত হবো, সেটা সত্যিই ভেবে পাচ্ছিলাম না।'

লক্ষ্য করলাম মেয়েটি ওর দু কাঁধে সামান্য ঝাঁকুনি তুললো। তারপর বললো, 'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, ওটা ইঞ্জিনিয়ারেরই কাজ। তারপর বুঝলাম, আপনি।'

'কোন ইঞ্জিনিয়ার?'

'আপনি আসার আগে এখানে যে ইঞ্জিনিয়ারটি থাকতো। সে ও ওই একইভাবে, আয়না দিয়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে ব্যাপারটা শুরু করেছিলো। কিংবা কে জানে, সে-ই হয়তো আপনাকে বলে দিয়েছে যে ওইভাবে চালাকি করে আপনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন।'

'না, সত্যিই তা নয়। আমি তাকে চিনিই না।'

'দুঃখিত। কিন্তু জানেন, প্রায়ই ওই ধরনের ঘটনা ঘটে।'

যেন খুবই পরিচিত, এইভাবে মেয়েটি কথা বলতে বলতে আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে দোরগড়ায় থমকে দাঁড়ালো।

'সব কিছু দেখছি ঠিক আগের মতোই রয়েছে। ফ্ল্যাটটা আপনি আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো অবস্থাতেই নিয়েছেন, তাই না?'

এবারে জবাব দেবার আগে আমি এক মুহূর্ত ভেবে নিলাম। মনে হলো, আমার আর মেয়েটির মধ্যে আচমকা বাইরে থেকে বিভ্রান্তি এবং অপমানকর একটা কিছু এসে হাজির হয়েছে—যেটাকে আমি ঠিক

বুঝে উঠতে পারছি না। শেষে বললাম, 'না, জায়গাটা খালি ছিলো। আমিই এটাকে আসবাব দিয়ে সাজিয়েছি।'

'কি অদ্ভুত মিল! এখানে, বাইরের ঘরে, সব সময়েই এরকম একটা গাছ থাকতো। তবে হয়তো একটু ছোট—এই যা। এটা তো ফাইকাস, তাই না?'

'হ্যাঁ, ফাইকাস।'

'ইঞ্জিনিয়ার সেটাকে নিয়ে কত কিছুই না ভাবতো। আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো যে ওটাতে সপ্তাহে দুবার করে জল দিতে হয়।'

এই সময়ে আমি ভেবে দেখলাম, মেয়েটা যখন গাছটার সৌন্দর্য লক্ষ্য করেছে, তখন আমার আর ওকে ওই একই ধরনের জ্ঞান দেওয়াটা ঠিক হবে না। অথচ সে ইচ্ছেটাকে আমি পুরোপুরি বাতিল করতেও পারছিলাম না, তাই ইতস্তত করতে লাগলাম।

'আরে, কি আশ্চর্য!' মেয়েটি বলে চললো, 'এই ছোট্ট ছবিটা তো ইঞ্জিনিয়ারের ছিলো!'

বিরক্ত হয়ে আমি মন্তব্য ছুঁড়লাম, 'বিমূর্ত শিল্প দেখতে প্রায় একই রকমের হয়, কিন্তু আসলে এক নয়।'

আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকতেই মেয়েটা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো, 'বৈঠকখানাটাও ঠিক একই রকমের। একই আসবাবপত্র—শুধু সামান্য একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে।'

এবারে আমি কিছুই বললাম না। মেয়েটি গিয়ে সোফায় বসলো। তারপর পা দুটো আড়াআড়ি করে রেখে, বিশাল বুক থেকে কোটের বোতামগুলো খুলতে লাগলো। ওকে খুবই খুশি খুশি দেখাচ্ছিলো এবং এটা স্পষ্ট যে ও আশা করছিলো, আমি ওর সঙ্গে দেহলীলা শুরু করে দেবো। রেকর্ডপ্লেয়ারে একটা রেকর্ড চাপাতে গিয়েও আমি মন পালটে ফেললাম এবং তার বদলে ছোট্ট টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলাম। টেবিলে একটা ট্রের ওপরে আগে থেকেই এক বোতল আপেরিতিফ আর কয়েকটা গ্লাস সাজিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এবারেও

আমি একটু চিন্তা করে ফিরে এসে, মেয়েটির মুখোমুখি হয়ে বসলাম। তারপর বললাম, 'আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!'

'প্রথমবার আপনি যখন এখানে এলেন, তখন ওই ইঞ্জিনিয়ার কি রেকর্ডপ্লেয়ারে কোন রেকর্ড চাপিয়েছিলো?'

'হ্যাঁ, চাপিয়েছিলো বোধহয়।'

'তারপর কি আপনাকে কোন পানীয়, ধরুন একটা আপেরিতিফ, দিতে চেয়েছিলো?'

'হ্যাঁ, ভারমুথ খাবার প্রস্তাব দিয়েছিলো।'

'এবং তার ঠিক পরেই সে গিয়ে আপনার পাশে বসেছিলো, তাই না?'

'হ্যাঁ, বসেছিলো। কিন্তু কেন আপনি···'

'দাঁড়াও। তারপর সে তোমার সঙ্গে ভালোবাসাবাসি শুরু করেছিলো?'

প্রশ্নটা শুনে মেয়েটি স্পষ্টই অপ্রতিভ হয়ে উঠলো, 'আচ্ছা, কেন তুমি এ সব জানতে চাইছো বলো তো?'

'ভয় নেই, আমি তোমাকে কোন অশালীন প্রশ্ন করবো না—যাকে বলা যায় ওপর ওপর বিশদ ঘটনা, সেগুলোই শুধু জিজ্ঞেস করবো। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, তখন সে তোমার সঙ্গে প্রেমলীলা শুরু করে দিয়েছিলো। এবারে বলো···' এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললাম, 'ঘটনাটা যাতে চলতে থাকে, সম্পর্কটা যাতে নিবিড় হয়, সে জন্যে কোন এক সময়ে সে কি এমন প্রস্তাব করেনি, যে সে তোমার হাতের রেখা পড়ে দিতে পারে?'

মেয়েটা হাসতে শুরু করলো. 'হ্যাঁ, ঠিক তা-ই করেছিলো। কিন্তু তুমি সে কথা আন্দাজ করলে কি করে? তুমি নিশ্চয়ই জাদু জানো।'

বলার ইচ্ছে ছিলো, 'আমি নিজেও ঠিক তা-ই করতে যাচ্ছিলাম'—কিন্তু বলার সাহস ছিলো না। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে এখন মনে

হচ্ছিলো, উঁচু শক্তির বিদ্যুৎবাহী তারের প্রান্ত ঘিরে থাকা অদৃশ্য শক্তির মতো মেয়েটাকেও যেন একটা ভয়ঙ্কর, দুর্ভেদ্য শক্তি ঘিরে রেখেছে। বাস্তবিক পক্ষে ইঞ্জিনিয়ারটি ইতিপূর্বে করেনি বা বলেনি, এমন কিছুই আমি করতে বা বলতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিলো, দাড়ি-কামানো আয়নার অসংখ্য সারির মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারটি যেন শুধুমাত্র প্রথম আয়নাটি এবং তার মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায় আমি শুধু নিজেকেই দেখতে পাবো। অবশেষে জিগেস করলাম, 'এবারে বলো—ইঞ্জিনিয়ারটির সঙ্গে আমার কি কোন মিল আছে?'

'কোন দিক দিয়ে?'

'শরীরের দিক দিয়ে?'

বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলো মেয়েটি। তারপর বললো, 'হ্যাঁ, এক দিক দিয়ে মিল আছে বৈকি। তোমরা দুজনেই মাঝারি ধরনের।'

'মাঝারি ধরনের?'

'হ্যাঁ। তোমরা কুৎসিত নও সুন্দরও নও, লম্বা না বেঁটেও না, কচি ছোকরা নও আবার হৃদ্ধ বুড়োও নও—মাঝামাঝি।'

আমি কিছুই বললাম না, শুধু ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। অসহায় ক্ষুব্ধ ক্রোধে নিজেকেই বললাম, এ রোমাঞ্চ এখানেই উবে গেলো বলা যায়। ওই ফুলওয়ালি এখন আমার কাছে এক নিষিদ্ধ বস্তু এবং এখন আমার একমাত্র করণীয় কাজ, একটা শোভন ওজুহাত দেখিয়ে ওকে ফিরিয়ে দেওয়া। মেয়েটা বুঝতে পারলো, আমার মেজাজ পালটে গেছে। তাই খানিকটা সচকিত হয়ে প্রশ্ন করলো, 'কি হলো তোমার? কোন গোলমাল হয়েছে নাকি?'

সচেষ্ট প্রয়াসে জিগেস করলাম, 'তোমার মতে, আমার আর ওই ইঞ্জিনিয়ারটির মতো কি অনেক মানুষই আছে?'

'হ্যাঁ, তা আছে। তোমরা হচ্ছো—কি করে বোঝাই—জনসাধারণের অংশ।'

আমি কুঁকড়ে উঠলাম আর মেয়েটা হঠাৎ একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, 'এবারে বুঝেছি! আমি তোমাকে মাঝারি ধরনের, মানে সাধারণ ধাঁচের মানুষ বলেছি—সেই জন্যেই তোমার লেগেছে। তাই নয় কি?'

'ঠিক লাগা নয়, বরং বলা যায়—অসাড় হয়ে গেছি।'

'অসাড় হয়ে গেছো? কেন?'

'ব্যাপারটা এ রকম—সবাই যা করে আমিও তাই করি, এ কথা ভাবলে আমার মনে হয়, তার চাইতে বরং কিছু না করাই ভালো।'

মেয়েটা আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলো, 'কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তোমার নিজেকে অসাড় মনে করা উচিত নয়। তাছাড়া আমি তোমাকে দিব্যি করে বলছি, আমি তোমার মতো পুরুষদের—যারা খুব একটা আলাদা ধাঁচের নয়, যারা ভিড়ের মধ্য থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়ায় না, যারা কি করবে বা বলবে তা আগে থেকেই জানা যায়—আমি তাদেরই বেশি পছন্দ করি।'

'যাক গে, আমার কাজ আছে।' আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'আমাকে মাফ কোরো, কিন্তু কাজটা জরুরী আর সেটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে।'

আমরা হলঘরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। মেয়েটা খুব একটা ব্যথা পেয়েছে বলে মনে হলো না। হাসতে হাসতেই বললো, 'অত রাগ কোরো না। রাগ করলে তুমি কিন্তু সত্যি সত্যি সেই ইঞ্জিনিয়ারের মতোই কাজ করবে।'

'ইঞ্জিনিয়ার কি করেছিলো?'

'একদিন আমি ওকে বলেছিলাম, ও আরও অনেক মানুষের মতোই একটা মানুষ মাত্র। ও তাতে তোমার মতোই রেগে উঠে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো।'

আবহাওয়াটা ভালো হতেই আমি আবার সমুদ্রের জন্যে আকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে শুরু করলাম। পুরো শীতকালটা আর বসন্তেরও কিছুটা সময় পর্যন্ত প্রথমে এশিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডাবল নিউমোনিয়ায় এবং পরে ফ্লুর পরিণামে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, যার জন্যে আমার প্রায় অন্যলোকে চলে যাবার যোগাড় হয়েছিলো। শেষটাতে, যেমন করেই হোক, আমার ওপরে এশিয়ান ফ্লুর আরো একটা আক্রমণ হয়েছিলো—তবে সেটা অবিশ্যি আগের তুলনায় অনেক হালকা গোছের। ইতিমধ্যে মাসগুলো কেটে যাচ্ছিলো। আমার ছোট্ট দোকানটা—গাড়ির আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ বিক্রির ছোট্ট দোকানটাতে বন্দী হয়ে আমি তখন সমুদ্রের কথা ভাবতাম···অপরূপ সুন্দর সমুদ্র, পরিষ্কার সূক্ষ্ম বালু, চিরচঞ্চল চিরপ্রাণময় অনন্ত নীল জল···আর ভাবতাম ঝলমলে রোদ্দুরের কথা—যা জ্বালা ধরায়, পুড়িয়ে দেয়, কিন্তু ঘাম ঝরায় না। সমুদ্রের জন্যে আমার আগ্রহ এত তীব্র হয়ে উঠেছিলো যে রাত্রিবেলাও আমি সমুদ্রের স্বপ্ন দেখতাম। স্নানের ঋতু যখন এগিয়ে এলো, তখন সেন্ট পিটার্সের পেছনে আকাশটা কেমন দেখায়, দেখার জন্যে আমি প্রতিদিন সকাল বেলায় গিয়ে ঝুল-বারান্দায় দাঁড়াতাম।

এখন মে মাসের শেষাশেষি। এক শনিবার দিন আমি আমার প্রেমিকা জিনেত্তার কাছে প্রস্তাব করলাম, বছরের প্রথম সমুদ্রস্নানের জন্যে পরদিন আমরা কাস্তেলফুসানোতে যাবো।

আমার এবং ওর দুজনের দুই পরিবার সহ আমরা তখন একটা খাবারের দোকানে বসেছিলাম। শিশুরা যার যার মায়েদের কোলে ঘুমোচ্ছিলো। আমার দু-একজন বন্ধুও ছিলো সেখানে। কথাটা শুনেই জিনেত্তা এক নৈর্ব্যক্তিক মুখভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে বললো, 'আমি সমুদ্রে

যেতে পারছি না। তুমি বরং অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে যেও।'

'কেন?'

'তুমি তিলদের সঙ্গে যাও, ওকে তো তুমি খুবই পছন্দ করো। আমি যাচ্ছি না।'

'তিলদের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?' আমি রেগে উঠতে শুরু করলাম, 'তুমিই বা যেতে চাইছো না কেন?'

জবাবে ও মাথা নিচু করলো, কিছুই বললো না। ওর মা তখন কর্তৃত্বসুলভ ভঙ্গিমায় তাড়াতাড়ি বললেন, 'তুমি যখন অসুস্থ ছিলে, তখন জিনেত্তা একটা মানত করেছিলো। ও প্রতিজ্ঞা করেছিলো, তুমি যদি ভালো হয়ে ওঠো তা হলে এ বছরে ও আর সমুদ্রস্নান করবে না। তাহলে বুঝতেই পারছো, কেন ও যেতে চাইছে না।'

কথাটা শুনে আমার অস্বস্তি লাগলো। এক দিক দিয়ে ওর এ মানতের জন্যে আমার মনে দোলা লাগা উচিত, কারণ সেটা আমার প্রতি ওর স্নেহ-প্রীতিরই প্রমাণ-স্বরূপ। অন্যদিকে আবার, ওর মানতটাই আমার প্রমোদ-ভ্রমণের আনন্দটা মাটি করে দেবে।

বললাম, 'ধন্যবাদ। কিন্তু মানতের কোন্ দরকারটা ছিলো? পেনিসিলিন কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো না?'

সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সমস্ত মহিলাদের তরফ থেকে সমস্বরে প্রতিবাদ উঠলো, 'ও কথা বোলো না···হয়তো স্রেফ জিনেত্তার মানতের জন্যেই তুমি ভালো হয়ে উঠেছো···কিছুই বলা যায় না···'

ওঁরা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করে রইলাম। তারপর বললাম, 'ভালো কথা। কিন্তু আমি সমুদ্রের কাছে যেতে চাই এবং যাবো। তুমিও তোমার মানত ভেঙে আমার সঙ্গে আসবে।'

'আমি আসছি না আর আমার মানতও ভাঙছি না। কারণটা তুমি জানো—কারণ তাহলে তুমি হয়তো আবার অসুস্থ হয়ে পড়তে পারো।'

'আমি তোমাকে মানত ভাঙার অনুমতি দিচ্ছি।'

'অমন কথা তোমার ভাবারও কোন দরকার নেই,' জিনেত্তা এক-

গুঁয়ের মতো বললো। 'তোমাকে তো বললাম, তুমি তিলদের সঙ্গে যাও।'

যে জিনিসটা আমাকে সব চাইতে বিরক্ত করে তুলেছিলো তা হচ্ছে, ওর অমায়িকতাহীন অশিষ্ট হাবভাব। প্রায় যেন মনে হচ্ছিলো, ও আমার ওপরেই রেগে উঠেছে—কারণ আমি অসুস্থ হয়ে যেন ওকে ওই মানতটা করাতে বাধ্য করিয়েছি। তাই আরও সামান্য কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি করে আমি আচমকা টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম। জোর গলায় বলে দিলাম যে আমি তিলদের সঙ্গেই যাবো, কারণ ও সেটাই চায়।

তিলদে যে পানশালায় কোষাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করে, আমি সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। তিলদে নামের এই মেয়েটি জিনেত্তার ঠিক বিপরীত। জিনেত্তা অভিমানী, স্নায়বিক দিক থেকে দুর্বল, জটিল রসিকতা ও অস্পষ্টতায় ভরা। অন্যদিকে তিলদে সরল, অনড় আর শান্ত। চরিত্রের মতো চেহারার দিক দিয়েও ওরা আলাদা। জিনেত্তা রোগা ও উদগ্রীব, গায়ের রঙ ঘন—তিলদে ফর্সা, গোলগাল ও শান্ত।

'এই যে তিলদে,' ওকে জিগেস করলাম, 'তুমি কি আসছে কাল কাস্তেলফুসানোতে যেতে চাও?'

আমি জানতাম, পুরুষমানুষের অর্থ ওর কাছে কিছুই নয়। কিন্তু আমোদ ফুর্তি করার ব্যাপারে ও সদাই উন্মুখ। সত্যিই, ও সামান্য একটু হেসে বললো, 'কখন রওনা দিতে চাও?'

পরদিন সকাল বেলা সাঁতারের পোশাকের ছোট্ট পুলিন্দাটা মোটর-সাইকেলের হাতলের সঙ্গে বেঁধে, তিলদেকে তুলে নেবার জন্যে আমি ওদের বাড়িতে গেলাম। অথচ মনের মধ্যে এক সুনির্দিষ্ট বিষাদ সম্পর্কেও আমি সচেতন ছিলাম। শত হলেও আমাকে ভালবাসে বলেই জিনেত্তা অমন একটা মানত করেছিলো। তাছাড়া যে পুতুল চোখ খুলে 'বাবা' আর 'মা' বলে, তার সঙ্গে একটা জ্যান্ত মানুষের যে প্রভেদ—জিনেত্তা আর তিলদের মধ্যেও ঠিক সেই একই প্রভেদ।…আগেকার ব্যবস্থা মতো আমি একটা শিস দিতেই তিলদে ওর ভিকোলো দেল সিনিক-এর বাড়ির জানলায় এসে হাজির হলো। ওর নিটোল বাহু দুটি নগ্ন,

থোকা থোকা হলদে রঙের কোঁকড়ানো চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের ওপরে, নিচু করে কাটা ব্লাউজের গলা থেকে বুক দুটি একেবারে সুস্পষ্ট। খুশিয়াল সুরে ও আমাকে চিৎকার করে বললো, 'জিনেত্তার জন্যে এখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

সম্পূর্ণ হতচকিত হয়ে আমি জিগেস করলাম, 'জিনেত্তা ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ! গতকাল সন্ধ্যায় ও পানশালায় গিয়ে বলে এসেছে, ওর জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তারপর আমরা তিনজনে মিলে একসঙ্গে সমুদ্রে যাবো।'

বিস্ময় থেকে নিজেকে সামলে নেবার মতো সময় পাবার আগেই জিনেত্তা এসে হাজির। ওর ঠোঁটে বিদ্বেষের হাসি, গরম সত্ত্বেও পরনে গলা অব্দি টানা ধূসর পশমী পোশাক। বললো, 'তাহলে এখন কি আমরা যাবো ?'

'তুমি সাঁতারের পোশাক আনোনি ? সাঁতার না কাটো, অন্তত পোশাকটা তো ছাড়তে পারতে ?'

'শুধু স্নান করবো না বলে আমি মানত করিনি—সাঁতারের পোশাকও পরবো না।'

'এতই যখন পরেছো, তখন তোমার লোমের কোটটাও তো পরে নিতে পারতে !'

'এ পোশাকটাতে কিছু ক্ষতি হয়নি।'

শেষটাতে আমরা তিনজনেই মোটর-সাইকেলে উঠে পড়লাম—আমার পেছনে জিনেত্তা, জিনেত্তার পেছনে তিলদে। গাড়ি চালু করে প্যাসেগিয়াতা আরকিয়োলজিকা দিয়ে ভিয়া ক্রিসতোফোরো কোলোম্বোতে গিয়ে পড়লাম আমরা। আমার পিঠে চিবুক রেখে, আমার কানে অসন্তোষের বিষ ঢালছিলো জিনেত্তা। বললো, 'আমি এসে ভুল করেছি···গরমে মরে যাচ্ছি।'

'এলে কেন ?'

'তোমার জন্যে···তুমি অত করে চাইছিলে বলে।'

'আমি যা চাই তা হচ্ছে, তুমি আমার বেড়ানোর আনন্দটা নষ্ট করবে না। কিন্তু আমি যা জানতে চাই তা হচ্ছে, কেন তুমি অমন একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলে?'

'আর আমি যা জানতে চাই তা হচ্ছে, কেন তুমি অসুস্থ হয়েছিলে?'

এমনি করেই চললো। ওর ওই ফিসফিসে কণ্ঠস্বর আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। এক সময় আচমকা গাড়ি থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'এবারে পালটা-পালটি করে বসা যাক। তিলদে আমার পেছনে আসুক, তুমি তিলদের পেছনে গিয়ে বোসো।'

'কেন?'

'কারণ তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছো, আমার মনটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। ফলে আমরা কোন গর্ত বা নালার মধ্যে গিয়ে পড়তে পারি।'

অতএব ওরা জায়গা পালটে বসলো, আমিও শান্তি পেলাম। তিলদে কোন কথাবার্তা বলছিলো না, কারণ যথারীতি ওর কিছুই বলার ছিলো না। তারপর হঠাৎ নেপলসের রাস্তার মোড়ে কে যেন আমার হাতে এক প্রচণ্ড চিমটি বসিয়ে দিলো—আর একটু হলেই আমরা গিয়ে একটা নালার মধ্যে পড়তাম। গাড়ি থামিয়ে আমি রেগে-মেগে তিলদেকে জিগেস করলাম, 'তোমার ব্যাপারটা কি?'

ও হেসে উঠলো, 'জিনেত্তা তোমাকে চিমটি কাটতে বললো, তাই কাটলাম।'

'তুমি কি পাগল?' জিনেত্তাকে বললাম, 'অমন করলে কেন?'

'ইচ্ছে হলো, তাই। তোমার ওপরে আমি ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। কেন, জানো? আমি প্রতিজ্ঞাটা করেছিলাম তোমার জন্যে। আর তুমি তার বদলে সমুদ্রের কাছে আসার এই প্রমোদ-ভ্রমণটাও বাদ দিতে পারলে না।'

'কিন্তু আমি তো কয়েক মাস ধরেই সমুদ্রের কথা চিন্তা করছিলাম।

দোষটা তোমার নিজের। অমন ধারা একটা মানত তোমার কক্ষনো করা উচিত হয়নি।'

অবশেষে আমরা সমুদ্র দেখতে পেলাম। শহরতলি আর পাইন বনের ভেতর দিয়ে আলোকিত ফিতের মতো রাস্তাটা নিচের দিকে অনেক দূর অব্দি গড়িয়ে গিয়ে, আরও আলোকিত রোদঝলমলে সমুদ্রের আলোতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। পাহাড় বেয়ে নেমে এসে আমি স্রেফ মনের আনন্দে গান গাইতে শুরু করলাম, তিলদেও আমার সঙ্গে যোগ দিলো। কিন্তু জিনেত্তো নিশ্চুপ। কাস্তেলফুসানোর প্রধান সড়ক ধরে স্নানের কুঠিগুলো পেরিয়ে আমরা সৈকতের কিনারায় ঝোপঝাড়গুলোর কাছে এসে হাজির হলাম। গাড়ি থামিয়ে মোটর-সাইকেল থেকে নেমে এলাম আমরা। তারপর এক হাতে তিলদে আর অন্য হাতে জিনেত্তাকে নিয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে চললাম সামনের দিকে। মুখগোমড়া জিনেত্তাকে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। এখানে-সেখানে স্নানার্থীদের সামান্য কয়েকটা দল ছাড়া সমুদ্রতীর প্রায় নির্জন। কাছেই একটা পুরনো জেটির পচা কাঠগুলো কোনক্রমে শান্ত সমুদ্রের গায়ে লেগে রয়েছে। আনন্দে অধীর হয়ে একটা ঝোপের পেছনে গিয়ে আমি মুহূর্তের মধ্যে পোশাক-টোশাক ছেড়ে ফেললাম। চিৎকার করে জিগেস করলাম, 'এই তিলদে, তুমি কি পোশাক ছাড়ছো?' অন্য একটা ঝোপের পেছন থেকে ও জবাব দিলো, 'আমি স্নানের পোশাকও পরে নিয়েছি।'

এমন পাগলের মতো তাড়াহুড়ো করে আমি পোশাক ছেড়েছিলাম যে লক্ষ্যই করিনি, আমার কাছে কোন স্নানের পোশাক নেই। আমরা যখন মোটর-সাইকেলটা রেখে চলে আসি, জিনেত্তা সেই মুহূর্তেই আমার স্নানের পোশাকটা নিয়ে নিয়েছিলো। চিৎকার করে বললাম, 'জিনেত্তা, আমাকে আমার স্নানের পোশাকটা দাও।'

'আমি এখানে,' তক্ষুনি জবাব দিলো ও, 'তোমার বাঁদিকে। এসে নিয়ে যাও।'

সাবধানে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলাম আমি, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। আর ঠিক তখনি আমার ডানদিক থেকে জিনেত্তার গলায় বিদ্রূপের সুর শুনতে পেলাম, 'এবারে তোমাকে বাগে পেয়েছি!' মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, আমার যে পোশাকগুলো আমি মাটিতে ফেলে রেখে-ছিলাম, সেগুলো উধাও হয়ে গেছে।

অস্থির হয়ে আমি চড়া গলায় বললাম, 'এই জিনেত্তা, আমার জামা-কাপড় আর স্নানের পোশাকটা ফিরিয়ে দাও বলছি।'

কোন একটা লুকোনো জায়গা থেকে সেই একই বিদ্রূপের সুর জবাব দিলো, 'কোনটাই ফেরত দিচ্ছি না। আমি রোদ্দুরে বসে পুড়বো আর তোমরা সমুদ্রের মধ্যে হুটোপুটি করে মজা লুটবে, আমার পক্ষে সেটা মোটেই ভালো নয়।'

'কিন্তু মানত করেছিলে তুমি, তাতে আমার কি দোষ?'

'অবশ্যই তোমার দোষ—তোমার অসুস্থ হয়ে পড়া উচিত হয়নি।'

ইতিমধ্যে তিলদে যথারীতি বোকার মতো হাঁক পাড়ছিলো, 'চলে এসো এত্তিলিয়ো, স্নান করতে যাওয়া যাক!'

তারপর এক দীর্ঘস্থায়ী তর্ক-বিতর্ক চললো। আমি সাঁতারের পোশাকটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে জিনেত্তাকে ধমকাতে লাগলাম, জিনেত্তা তাতে অস্বীকার করেই চললো। আর তিলদে ক্রমাগত বলতে লাগলো যে ও স্নান করতে যেতে চায়। অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে আমি তিলদেকে বললাম, 'শোনো, তুমি নিশ্চয়ই পারবে। যাও, জিনেত্তার কাছ থেকে আমার স্নানের পোশাকটা নিয়ে এসো।'

'তুমি অনুমতি দিচ্ছো তো?' খুশীভরা সুরে জিগেস করলো ও।

'অবশ্যই।'

তখন তিলদেকে দেখতে হয়! যেন জিনেত্তাকে জাপটে ধরার জন্যেই বিশাল এক ঝাঁপ দিলো ও। কিন্তু জিনেত্তা দ্রুত ওকে এড়িয়ে গিয়ে আমার পোশাক-টোশাক বগলের নিচে নিয়ে ছুটতে শুরু করলো। যে ঝোপটার পেছনে আমি বুক অব্দি আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান

থেকে সাঁতারের পোশাক-পরা তিলদে আর পুরো পোশাক-পরা জিনেত্তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম আমি। প্রথমে বালুবেলার ওপর দিয়ে, তারপর সমুদ্রের ধার ঘেঁষে ওরা একজন অন্য জনকে তাড়া করে ছুটছিলো। তিলদে খুশীভরা মনে হাসছিলো, কিন্তু জিনেত্তা যেন খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে নিয়েছে ব্যাপারটা। খানিকক্ষণ এভাবেই ছোটাছুটি করলো ওরা, তারপর তিলদে জিনেত্তাকে ধরে ফেললো—আমার পোশাকগুলো ও চেপে ধরতেই, সেগুলো মাটিতে পড়ে গেলো। জিনেত্তা ফিরে দাঁড়ালো। তিলদে পুরো সময়টাই হাসছিলো, এবারে জামাকাপড়গুলো তুলে নেবার জন্যে ও নিচের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালো। তারপরেই একটা তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম আমি···দেখলাম, জিনেত্তা তিলদের লম্বা চুলগুলোকে মুঠোয় করে চেপে ধরে ওকে বালির ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। তারপর আচমকা একটা ধাক্কা মেরে ওকে একটা বালিয়াড়ির গায়ে ফেলে দিলো জিনেত্তা, একটা বুনো জন্তুর মতো ওর ওপরে লাফিয়ে উঠে ওর মুখের ডাইনে বাঁয়ে চড় মারতে লাগলো বারবার। জিনেত্তার বাহুর গতিবিধি, ওর হাতখানার ওপরের দিকে উঠে তিলদের সুন্দর গালের ওপরে নেমে আসা—সবই দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। সত্যি কথা বলতে কি, জিনেত্তার হিংস্রতায় আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—এ একেবারে আক্রোশময় হিংস্রতা, যেন রক্তপাত ঘটাতে উন্মুখ। তারপর আবার উঠে দাঁড়ালো তিলদে, দু হাতে মুখখানা আড়াল করে এগিয়ে চললো সমুদ্রের ধার ঘেঁষে। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো ওর কাঁধ দুটি। 'তিলদে!' চিৎকার করে উঠলাম আমি। ও নিশ্চয়ই আমার ডাক শুনতে পেয়েছিলো, কিন্তু দু কাঁধে সামান্য ঝাঁকুনি তুলে সোজা হেঁটেই চললো। ওদিকে জিনেত্তাও ততক্ষণে আমার জামাকাপড় আর স্নানের পোশাকটা নিয়ে বালিয়াড়ির পেছনে উধাও হয়ে গেছে।

এখন আমি সম্পূর্ণ একা। ঝোপটা আমার বুক অব্দি আড়াল করে রেখেছে সত্যি, কিন্তু এভাবে অনন্তকাল থাকা চলে না। যে সামান্য

কজন স্নানার্থীকে সৈকতের এখানে-সেখানে দেখা যাচ্ছে, অন্তত তারা চলে না যাওয়া অব্দি এভাবে নগ্ন অবস্থায় বেরিয়ে পড়ার কথাটাও চিন্তা করা যায় না। রেগে আগুন হয়ে কতক্ষণ ওই চড়চড়ে রোদের মধ্যে আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না···একটানা চোখ মেলে রেখেছিলাম আমাকে ঘিরে রাখা ঝোপঝাড়গুলোর দিকে, যেগুলো যতদূর দৃষ্টি যায় একেবারে জনমানবশূন্য বলেই মনে হচ্ছিলো। হঠাৎ, আমার বেশ কাছেই, জিনেত্তার কণ্ঠস্বর আমাকে চমকে দিলো। 'কেমন চলছে?' জিগেস করলো ও।

'খুব খারাপ', রাগত স্বুরে জবাব দিলাম আমি। 'নাও, এবারে ওই স্নানের পোশাকটা আমাকে দাও।'

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর কণ্ঠস্বরটা আবার বললো, 'স্নানের পোশাকটা তোমাকে দিলে, তুমি তার বদলে আমাকে কি দেবে?'

চারধারের ঝোপগুলো সবই ঠিক এক রকমের। তার মধ্যে কোথায় ও লুকিয়ে রয়েছে, আমি তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু ওর নরম কৌতুকে-ভরা কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে আমি যেন ওকে দেখতে পাচ্ছিলাম···দেখতে পাচ্ছিলাম তিলদেকে চড় মেরে মনের সবটুকু বিদ্বেষ বের করে দেবার পরে, এখন ও আবার শান্ত, ভদ্র, স্নেহময় হয়ে হাসছে। তবু আমি কর্কশ গলায় বললাম, 'কিছুই দেবো না। বরং তুমি যদি আমাকে সাঁতারের পোশাকটা না দাও, তাহলে আমিও এবারে একটা প্রতিজ্ঞা করে বসবো।'

'কি প্রতিজ্ঞা করবে?'

'প্রতিজ্ঞা করবো, আমাদের সব সম্পর্ক শেষ।'

ওর হাসির শব্দ শুনতে পেলাম আমি, 'তাহলে প্রতিজ্ঞাটা করে ফেলছো না কেন?'

আমি মুশকিলে পড়ে গেলাম। কারণ অনুভব করলাম, অমন শপথ করতে আমি অক্ষম···ওকে আমি বড্ড বেশি ভালবাসি। একটু পরে ও আবার প্রশ্ন করলো, 'তাহলে বলো, সাঁতারের পোশাকটার বদলে

তুমি আমাকে কি দেবে?'

ও কোথায় আছে দেখার জন্যে একটু নড়াচড়া করতেই, আমার সামনে পেছনে নগ্ন ত্বকে ঝোপের খোঁচা লাগলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'একটা চুমু।'

'এই যে তোমার সাঁতারের পোশাক।'

পোশাকটা বাতাসে উড়ে এসে আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো। সেটা গলিয়ে নিয়ে জিগেস করলাম, 'তুমি কোথায়?'

'যাও, গিয়ে স্নান করে এসো। চুমুটা তুমি আমাকে পরেও দিতে পারবে।'

অতএব গিয়ে স্নান করলাম। সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মে মাসের অপরূপ জল আস্তে আস্তে আমার কাঁধ অব্দি উঠে এলো। তারপর আবার জল থেকে উঠে, সৈকত পেরিয়ে ঝোপঝাড়ে ঘিরে রাখা জায়গাটায় ফিরে এলাম। ঠিক তখনই, একেবারে আচমকা, কি একটা জিনিস যেন প্রচণ্ড বেগে আমার পিঠে এসে পড়লো। তাকিয়ে দেখি, পেটিকোট পরা জিনেত্তা দু হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে হাসছে। আমি ওকে প্রতিশ্রুত চুমুটা দিলাম। ও বললো, 'তিলদেকে বাদ দিয়ে এখন আমরা দুজনে সামান্য কিছুক্ষণ একত্রে থাকতে পারবো।'

'কিন্তু তিলদে যদি ফিরে না আসে?'

'আসবেই। ও ওর জামাকাপড় এখানে রেখে গেছে। তাছাড়া ও কিছু খেতেও চাইবে।'

এবং তাই-ই হলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে তিলদে সৈকত থেকে ভয়ে ভয়ে মরিয়া হয়ে আমাদের ডাকলো। জিনেত্তা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো ওকে। তারপর আমাকে ডেকে বললো, 'এসো, তিলদের সঙ্গে তুমি আর একবার স্নান করে নাও। আমি ততক্ষণে খাবারটা তৈরি করে রাখছি।'

এগিয়ে গিয়ে তিলদের পাশে দাঁড়ালাম আমি। ওকে অপমানিত আর লাঞ্ছিত বলে মনে হচ্ছিলো। বললাম, 'জিনেত্তা তোমাকে বেশ

জোরেই কয়েকটা চড় বসিয়ে দিয়েছে !'

'তুমি জানো, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ওর সঙ্গে আর কক্ষনো কথা বলবো না ?'

'তাহলে···?'

'তাহলে আর কি ? তার বদলে আবার এখানে ফিরে এলাম ! জিনেত্তা জানে, কি করে শপথ রাখতে হয়। আমি জানি না।'

শিশুকল্যাণ সমিতি থেকে দয়ালু মহিলাটি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে যখন অন্য সকলের মতোই জিগেস করলেন যে কেন আমরা এতগুলো সন্তান পৃথিবীতে এনেছি, তখন আমার স্ত্রী—যে সেদিন একেবারে মনমরা হয়ে ছিলো—মহিলাকে সোজা সত্যি কথাটাই বলে দিলো। বললো, 'ক্ষমতা থাকলে সন্ধ্যাবেলা আমরা সিনেমা দেখতে যেতুম। কিন্তু টাকা-পয়সা নেই বলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি···তাই বাচ্চা জন্মায়।' মন্তব্যটা শুনে মহিলাকে বিব্রত দেখালো, একটি কথাও না বলে উনি চলে গেলেন। স্ত্রীকে আমি বকুনি লাগালাম, কারণ সোজা সত্যি কথা বলাটা সব সময় ভালো মতলব নয় এবং বলার আগে সেটা কাকে বলা হচ্ছে, তা বুঝে নেওয়া উচিত।

আমার বয়েস যখন অল্প, বিয়েটিয়ে করিনি—তখন প্রায়ই খবরের কাগজের স্থানীয় সংবাদে বেরুনো মানুষের জীবনে সম্ভবপর সমস্ত রকম দুর্ভাগ্যের খবরগুলো—যথা চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি, আত্মহত্যা, পথ দুর্ঘটনা—এ সব পড়ে আমি খুব মজা পেতাম। এবং এই সমস্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার মধ্যে একমাত্র যেটা আমার ক্ষেত্রে হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হতো, তা হচ্ছে পত্রিকার ভাষায় 'করুণ ঘটনা' হয়ে যাওয়া···শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যেই এমন চরম দুর্ভাগা হয়ে ওঠা, যাতে বিশেষ কোন দুর্ভাগ্যের প্রকোপ না থাকলেও মানুষের কাছে করুণার পাত্র হয়ে উঠতে হয়। যা বলেছি, তখন আমার বয়েস ছিলো অল্প এবং একটা বিরাট সংসার চালানো যে কি বস্তু তা আমি তখনও জানতাম না। কিন্তু এখন অবাক হয়ে দেখছি ওরা 'করুণ ঘটনা' বলতে যা বোঝায়, আমি ক্রমশ তা-ই হয়ে উঠেছি। যেমন ধরা যাক, আমি পড়তাম, 'ওরা শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে'—আজ আমিও চরম·দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করি। কিংবা, 'ওরা যেখানে বাস করে, সেটা

নামেমাত্র বাড়ি'···আমি বউ আর ছটা বাচ্চা নিয়ে তোরমারানসিয়োর যে ঘরটাতে থাকি, সে ঘরের মেঝেতে একগাদা তোশক ছাড়া আর কিচ্ছু নেই—বৃষ্টির সময় ভিয়া রিপেত্তার আসনগুলোতে যেমন করে বৃষ্টি পড়ে, এখানে ঘরের মধ্যেও তেমনিভাবে বৃষ্টি পড়ে। অথবা, 'নিজের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা আবিষ্কার করার পর, হতভাগী একটা অন্যায় সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে—নিজের কামনার ফলটিকে উপড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত'···যখন আবিষ্কার করলাম আমার স্ত্রী সপ্তমবার গর্ভ ধারণ করেছে, তখন আমরাও দুজনে মিলে এমনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। বাস্তবিক-পক্ষে আমরা ঠিক করেছিলাম যে আবহাওয়াটা একটু গরম হয়ে উঠলেই বাচ্চাটাকে আমরা একটা গির্জায় রেখে দিয়ে চলে আসবো—যে ওকে প্রথম দেখবে, তাঁর দয়ার ওপরেই ছেড়ে দেবো ওকে।

যাই হোক, ওই ধরনের দয়ালু মহিলাদের মধ্যস্থতাতেই আমার বউ বাচ্চা বিয়োতে হাসপাতালে গেলো এবং তারপর একটু সুস্থবোধ করতেই ছেলে নিয়ে তোরমারানসিয়োতে ফিরে এলো। ঘরে ঢুকেই বললো, 'জানো, হাসপাতালটা হাসপাতাল হলেও, ওরা যদি বলতো তাহলে বাড়িতে ফিরে আসার বদলে আমি নিজের ইচ্ছেতেই ওখানে থেকে যেতুম।' এ কথায় বাচ্চাটা যেন সব বুঝে ফেলেছে, এমনিভাবে অ্যায়সা চিৎকার জুড়ে দিলো যে তা না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। বাচ্চাটা দিব্যি সুন্দর—শক্তপোক্ত গড়ন, গলার স্বরটাও জোরালো। কাজেই রাত্রিবেলা যখন ও উঠে কাঁদতে শুরু করে, তখন সকলেরই ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দেয়।

যখন মে মাস এলো, বাতাস এমন গরম হয়ে উঠলো যে ওভারকোট ছাড়াই ঘরের বাইরে বেরুনো যায়—তখন রোমে যাবার জন্যে আমরা তোরমারানসিয়ো থেকে রওনা দিলাম। আমার স্ত্রী বাচ্চাটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রেখেছিলো—সেটার গায়ে এত কাঁথা-কাপড় জড়ানো যে ও নিরাপদেই সেটাকে বরফের মাঠে রেখে চলে যেতে পারতো। আমা-দের আসল উদ্দেশ্য যে ওর পছন্দ নয়, হয়তো সেটা লুকোবার জন্যেই শহরে পৌঁছে আমার স্ত্রী একটানা বকবক করতে শুরু করলো ··মনে

হলো ও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, দম ফুরিয়ে গেছে, চুলগুলো এলো-মেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র, চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে বাইরের দিকে। এক সময় ও বিভিন্ন ধরনের গির্জাগুলোকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করলো—যে সমস্ত জায়গায় আমরা বাচ্চাটাকে রেখে যেতে পারি। আমাকে ও বুঝিয়ে বললো, গির্জাকে এমন হতে হবে যেন সেখানে বড়-লোকেরা যায়। কারণ আমাদের মতো কোন গরীব মানুষই যদি ওকে কুড়িয়ে নেয়, তাহলে তো আমরাই ওকে রেখে দিতে পারি। তার পরেই বললো, ম্যাডোনার প্রতি নিবেদিত কোন গির্জাই ওর পছন্দ। কারণ ম্যাডোনারও ছেলে আছে, অতএব তিনি ওর মনোবাসনা বুঝতে পেরে ওর ইচ্ছেমতো কোন বর দেবেন। এ ধরনের কথাবার্তা আমার ভীষণ ক্লান্তিকর বলে মনে হতে লাগলো, মেজাজটাও চড়ে উঠলো। কারণ সত্যি কথা বলতে কি ব্যাপারটা আমার কাছে অপমানকর বলেই মনে হচ্ছিলো এবং আমি যা করছি সেটা আমারও পছন্দ হচ্ছিলো না। কিন্তু নিজেকে আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে ওর মনে সাহস যোগাতে বলছিলাম। তাই মূলত ওর কথার স্রোতে বাধা দেবার জন্যেই বারকয়েক আপত্তিও করলাম। তারপর বললাম, 'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে··· ওকে আমরা সেণ্ট পিটার্সে রেখে যাই না কেন?' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ও বললো, 'না, ওটা অত বড় একটা জায়গা···কেউ হয়তো ওকে দেখতেই পাবে না!···তার চাইতে বরং ভিয়া কনদোত্তির ওই ছোট্ট গির্জাটাতে চেষ্টা করে দেখবো—ওখানে অনেক সুন্দর সুন্দর দোকান আছে···অনেক বড়লোকেরা যায়। ওটাই হচ্ছে জায়গা।'

আমরা বাসে উঠে পড়লাম। অন্য লোকজনের মধ্যে আমার স্ত্রী চুপ করেই রইলো। তবে মাঝেমধ্যেই ও বাচ্চাটার গায়ে কম্বলটা টেনেটুনে আরও ভালো করে জড়িয়ে দিচ্ছিলো অথবা সাবধানে ওর মুখের ঢাক-নাটা খুলে একটুখানি দেখে নিচ্ছিলো। বাচ্চাটা তখন ঘুমোচ্ছে, কাঁথা-কম্বলের মাঝখানে ফর্সা আর গোলাপী ওর মুখখানা। আমাদের মতো ওরও পোশাক-পরিচ্ছদ খুব বাজে—একমাত্র সুন্দর জিনিস ওর নীল

রঙের পশমী দস্তানাজোড়া, যেন সে ছটো দেখাবার জন্যেই ও হাত ছটিকে টানটান করে খুলে রেখেছিলো। লারগো গোলদোজিতে আমরা বাস থেকে নেমে পড়লাম এবং আমার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ আবার বকবকানি শুরু করে দিলো। একটা সোনার দোকানের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে, ও তাকের ওপরে লাল মখমলে জড়ানো গয়নাগাঁটিগুলো দেখিয়ে বললো, 'ছাখো, কি সুন্দর!...গরীব মানুষরা এখানে আসে না। এ রাস্তায় যারা আসে, তারা গয়নাগাঁটি আর অন্য সব সুন্দর সুন্দর জিনিস কিনতেই আসে।...তারপর এক দোকান থেকে অন্য দোকানে যাওয়ার ফাঁকে গির্জাটাতে গিয়ে টুক করে প্রার্থনা সেরে নেয়। কাজেই মনটা ভালো থাকতে থাকতেই ওরা বাচ্চাটাকে দেখতে পাবে, আর নিয়েও যাবে।' ...সমস্ত কথাগুলোই ও বাচ্চাটাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে, গয়না-গুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললো। ওর চোখ ছটো বিস্ফারিত, যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে। আমিও ওর কথায় আপত্তি করার সাহস পেলাম না, দুজনে মিলে গির্জাটাতে গিয়ে ঢুকলাম। গির্জাটা ছোট, চারদিকে হলদে মর্মর পাথরের মতো রঙ করা, প্রার্থনা করার মতো অনেকগুলো ছোট ছোট জায়গা, আর একটা উঁচু বেদি। আমার বউ বললো, ও আগে এ জায়গাটা যেমন দেখেছিলো বলে মনে পড়ছে—এখন আর তেমন লাগছে না...আবার দেখে এটা ওর মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। যাই হোক, পবিত্র জলে আঙুল ডুবিয়ে ও নিজের শরীরে ক্রুশ এঁকে নিলো। তারপর বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই অসন্তুষ্টভাবে আস্তেসুস্থে গির্জাটার সর্বত্র ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো। গম্বুজের লণ্ঠন থেকে ঠাণ্ডা একটা পরিষ্কার আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিলো। যেন বাচ্চাটাকে রেখে যাবার মতো একটা সুবিধেজনক জায়গা পাবার জন্যেই ও একটা ভজনালয় থেকে অন্যটাতে—কুর্সি, বেদি, ছবি সব কিছু দেখে দেখে বেড়াচ্ছিলো। একটু দূর থেকে ওকে অনুসরণ করতে করতে আমি সব সময়েই দরজার দিকে নজর রাখছিলাম। হঠাৎ, একেবারে আচমকা, লাল পোশাক-পরা অল্পবয়সী দীর্ঘাঙ্গী এক স্বর্ণকেশী ভেতরে এসে ঢুকলো। আঁটসাঁট

স্কার্ট নিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে মেয়েটি বড়জোর মিনিটখানেক ধরে প্রার্থনা করলো, ক্রুশ আঁকলো, তারপর আমাদের দিকে না তাকিয়েই ফের বেরিয়ে গেলো। আমার বউ ওকে লক্ষ্য করছিলো—হঠাৎ বলে বসলো, 'নাঃ, এ জায়গাটা সুবিধের নয়…এখানে যারা আসে, তারা সবাই ওই মেয়েটির মতো…সকলেরই ফুর্তি করা আর দোকান দেখার জন্যে তাড়া। চলো, যাওয়া যাক।' এবং এই বলে ও গির্জাটা থেকে বেরিয়ে এলো।

তাড়াহুড়ো করে আমরা করসো ধরে খানিকটা পেছিয়ে এলাম—আমার বউ আগে আগে, আমি পেছনে—এবং পিয়াজা ভেনিজিয়ার কাছাকাছি একটা জায়গায় এসে আর একটা গির্জায় গিয়ে ঢুকলাম। এটা প্রথমটার চাইতে অনেক বড়, প্রায় অন্ধকার। ভেতরে ঝোলানো গিল্টি-করা সাজসরঞ্জাম আর কাচের আলমারিতে গাদাগাদি করে রাখা রুপোর হৃদয়গুলো আবছা আলোয় চিকচিক করছিলো। বেশ কয়েকজন তখন ওখানে উপস্থিত ছিলেন—তাঁদের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে আমি বুঝলাম, এঁরা সকলেই সচ্ছল অবস্থার মানুষ। মেয়েদের প্রত্যেকেরই মাথায় টুপি, পুরুষরা ফিটফাট পোশাক-পরা। মঞ্চের ওপরে হাত নেড়ে নেড়ে একজন পুরোহিত ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন। অন্য সকলে উঠে দাঁড়িয়ে, তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো বলেই মনে হলো, কারণ এখন কেউই আমাদের লক্ষ্য করবে না। তাই ফিসফিসিয়ে বউকে বললাম, 'আমরা এখানেই ওকে রেখে যাবার চেষ্টা করবো নাকি?' ও মাথা নেড়ে সায় জানালো, আমরা পাশের প্রার্থনাস্থলে গিয়ে ঢুকলাম। সেখানে কেউই ছিলো না… জায়গাটা ভীষণ অন্ধকার, কিছু প্রায় দেখাই যায় না। হাত দুটো খালি করে নেবার জন্যে মানুষ যেমন করে কোন ঝঞ্ঝাটে বোঝা নামিয়ে রাখে, ঠিক তেমনি করে গায়ে জড়ানো কম্বলটা দিয়ে বাচ্চার মুখ ঢেকে আমার বউ ওকে একটা কুর্সির ওপরে নামিয়ে রাখলো। তারপর দু হাতে নিজের মুখ ঢেকে বহুক্ষণ ধরে ও প্রার্থনা করলো আর আমি কি করবো বুঝে না পেয়ে, প্রার্থনাশালার দেয়ালে সাজানো হরেক আকারের 'রুপোর

'হৃদয়'গুলো দেখতে লাগলাম। অবশেষে ও উঠে দাঁড়ালো, কঠিন মুখে ক্রুশ এঁকে নিলো এবং খুবই আস্তে আস্তে বাইরের দিকে এগুতে লাগলো। একটু দূর থেকে আমিও ওকে অনুসরণ করলাম। ধর্মপ্রচারক ভদ্রলোক ঠিক সেই মুহূর্তেই চিৎকার করে উঠলেন, 'এবং যীশু কহিলেন, পিটার তুমি কোথায় চলিয়াছো?' আমি চমকে উঠলাম, কারণ আমার মনে হলো প্রশ্নটা উনি আমাকেই করেছেন। কিন্তু আমার বউ যেমনি দরজার পর্দাটা তুলতে গেছে, অমনি পেছন দিক থেকে আসা একটা কণ্ঠস্বর আমাদের দুজনকেই চমকে দিলো—'সিনোরা, আপনি ওই কুর্সির ওপরে রাখা পুলিন্দাটা নিতে ভুলে গেছেন।' মহিলার পরনে কালো পোশাক—উনি ওই সমস্ত ধর্মপ্রাণাদের মধ্যেই একজন, যাঁরা গির্জা এবং গির্জার জিনিসপত্র রাখার ভাণ্ডারের মধ্যেই নিজেদের দিনগুলো কাটিয়ে দেন।…'ও, হ্যাঁ…' আমার স্ত্রী বললো, 'ধন্যবাদ আপনাকে…আমি ওটা ভুলেই গিয়েছিলাম।' অতএব ফের আমরা পুলিন্দাটা তুলে নিলাম এবং নিজেদের মৃতপ্রায় অনুভব করে গির্জা থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে এসে আমার স্ত্রী বললো, 'কেউই আমার এই হতভাগা পুঁচকে ছেলেটাকে চায় না—' যেন তাড়াতাড়ি বিক্রিবাটা হয়ে যাবে ভেবে বাজারে এসে দেখা গেলো, সে মাল কেনার মতো কোন খদ্দের নেই।…ইতিমধ্যে ও আবার আগের মতোই এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করেছিলো যে ওর পা যেন মাটিতে প্রায় লাগছিলোই না। পিয়াজা সান্তি অ্যাপোস্তোলিতে এসে পৌঁছলাম আমরা। গির্জাটা খোলাই ছিলো। ভেতরে ঢুকে জায়গাটার বিশাল ব্যাপ্তি আর ছায়া ছায়া অন্ধকার দেখে ও ফিসফিসিয়ে বললো, 'ঠিক এমনটিই আমরা চাই!' স্থির সঙ্কল্পের ভাব করে ও এক পাশের একটা প্রার্থনা করার জায়গায় এগিয়ে গিয়ে, বাচ্চাটাকে একটা বেঞ্চির ওপরে নামিয়ে রাখলো এবং ক্রুশ না এঁকে বা প্রার্থনা না করে অথবা বাচ্চাটার কপালে একটা চুমু পর্যন্ত না দিয়ে তাড়াতাড়ি সদর দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলো—যেন ওর পায়ের নিচে মেঝেটা একেবারে তেতে রয়েছে। ও মাত্র কয়েক পা গিয়েছে, কিন্তু

তখনই সমস্ত গির্জাটা হতাশ চিৎকারে ভরে উঠলো। এখন খাওয়ার সময়, আর সময়নিষ্ঠ বাচ্চাটা তাই খিদে পেয়েছে বলে কাঁদতে শুরু করেছে। ওই প্রচণ্ড কান্নার আওয়াজ হয়তো আমার বৌয়ের বুদ্ধি ঘুলিয়ে দিয়েছিলো। কারণ প্রথমটাতে ও দরজার দিকেই ছুটে গেলো—তারপর ছুটতে ছুটতেই ফিরে এসে, কোথায় আছে সে সব কথা চিন্তা না করে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলো, বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলো এবং ব্লাউজের বোতাম খুলে ওর দিকে একটা মাই এগিয়ে দিলো। কিন্তু যেই ও মাইটা টেনে বের করেছে, আর বাচ্চাটা কান্না থামিয়ে নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই লোভী হাতে সেটাকে আঁকড়ে ধরেছে—অমনি একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর ওকে চিৎকার করে বলতে শুরু করলো, 'ঈশ্বরের আবাসে তুমি এ সব করতে পারো না···যাও, বেরিয়ে যাও···রাস্তায় বেরোও!' লোকটা গির্জার ঘণ্টাবাদক—বেঁটেখাটো বুড়ো মানুষ, চিবুকের নিচে নরম সাদা দাড়ি, গলার আওয়াজটা চেহারার চাইতে ভারি। আমার স্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বুক আর বাচ্চাটার মাথা যথাসম্ভব ঢেকে-ঢুকে দিলো। তারপর বললো, 'কিন্তু ছবিতে, জানেন তো, ম্যাডোনার কোলে সব সময় বাচ্চা থাকে।' 'অ, তা তুমি ম্যাডোনার সঙ্গে নিজের তুলনা করতে চাও, তাই না?' লোকটা বাঁকা গলায় বললো, 'তোমার সাহসটা দেখছি বড্ড বেশি।'···যাই হোক, গির্জা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা পিয়াজা ভেনিজিয়ার বাগানটাতে গিয়ে বসলাম এবং বাচ্চাটা যতক্ষণ না তৃপ্ত হয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়লো ততক্ষণ আমার বউ ওকে বুকের দুধ খাওয়ালো।

তখন সন্ধ্যা, গির্জাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—আমরা দুজনেই ক্লান্ত, হতবুদ্ধি, কি করলে সব চাইতে ভালো হয় তা কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। যা করা উচিত নয়, সে বিষয়ে কিছু করার জন্যে আমি যা কিছু করেছি, তার চিন্তা আমাকে বেপরোয়া করে তুললো। স্ত্রীকে বললাম, 'শোনো, রাত হয়ে যাচ্ছে। এমন করলে চলবে না, আমাদের মনস্থির করে নিতে হবে।' খানিকটা তেতো গলায় ও বললো, 'কিন্তু ওর শরীরে

তোমার নিজের রক্ত। মানুষ যেভাবে কুকুর-বেড়ালের জন্তে নাড়ি-ভুঁড়ির পুলিন্দা ফেলে রাখে, তুমি কি ওকে সেভাবে যেখানে-সেখানে ফেলে যেতে চাও?' 'না, সেভাবে নয়,' আমি বললাম। 'কিন্তু চিন্তা-ভাবনা না করে এক্ষুনি একটা কিছু করে ফেলতে হবে—নয়তো কিছুই করতে পারবে না।' ও জবাব দিলো, 'আসল কথা, তোমার এখন ভয় হচ্ছে যে আমি মন পালটে ওকে ফের বাড়িতে নিয়ে যাবো।···ওহ্, তোমরা পুরুষমানুষের জাত···তোমরা সব একেবারে কাপুরুষ।' বুঝলাম এই মুহূর্তে ওর কথার প্রতিবাদ করাটা ঠিক হবে না। তাই সংক্ষেপে বললাম, 'তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না···তোমার মনের অবস্থা আমি জানি। কিন্তু এ কথা মনে রেখো যে ওর কপালে যা-ই থাকুক না কেন, তা তোরমারানসিয়োতে স্নানঘর বা রান্নাঘর ছাড়া একখানা ঘরের মধ্যে শীতে ছারপোকা আর গরমে মাছি নিয়ে বড় হয়ে ওঠার চাইতে ভালো'। এ কথায় ও আর কোন জবাব দিলো না।

কোথায় যাচ্ছি না জেনেই আমরা ভিয়া ন্যাজনালি ধরে তোর দিনেরোনের দিকে এগুতে লাগলাম। লক্ষ্য করলাম, ঠিক নিচেই ছোট একটা সরু রাস্তা রয়েছে, যেটা একেবারে নির্জন। আমরা যেখানটাতে রয়েছি, ঠিক সেখান দিয়েই রাস্তাটা চড়াইতে উঠে এসেছে—সামনেই দরজা-বন্ধ একটা ধূসর রঙের গাড়ি একটা বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। নতুন এক উদ্দীপনায় আমি গাড়িটার কাছে এগিয়ে গেলাম, হাতল ধরে চেষ্টা করতেই দরজাটা খুলে গেলো। বউকে বললাম, 'শীগগিরি করো, এই আমাদের সুযোগ···ওকে পেছনের আসনে রেখে দাও।' আমার কথামতো ও বাচ্চাটাকে পেছনের আসনে রেখে দিলো, আর আমিও দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। এ সব কিছুই আমরা একেবারে সঙ্গে সঙ্গে করে ফেললাম, কেউ আমাদের দেখতে পেলো না। তারপর বউয়ের হাত ধরে আমি জোর কদমে পিয়াজা দেল কুইরিনলের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

জায়গাটা একেবারে নির্জন, প্রায় অন্ধকার—শুধু বড় বড় বাড়ি-

গুলোর সামনে গুটি কয়েক আলো জ্বলছে আর পাঁচিলের ওধারে নিচের অন্ধকারে ঝিকমিক করছে সমস্ত রোমের আলোগুলো। আমার বউ ফোয়ারার কাছে এগিয়ে গিয়ে চার কোনাচে মিনারটার নিচে একটা আসনে গিয়ে বসলো এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ ওর নিজস্ব ভঙ্গিমায় মাথা নুইয়ে আমার দিকে পেছন ফিরে কাঁদতে শুরু করলো। জিগেস করলাম, 'কি হয়েছে?' ও বললো, 'এখন ওকে ফেলে এসে খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে···আমার বুকে যেখানটাতে ও ধরতো, মনে হচ্ছে সেখানে কি যেন একটা নেই!' খানিকটা ঝুঁকি নিয়ে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তা তো হবেই।···তবে ওসব কেটে যাবে।' দু কাঁধে একটু ঝাঁকুনি তুলে ও কেঁদেই চললো। তারপর হাওয়া বইলে রাস্তার বৃষ্টি যেমন করে শুকিয়ে যায়, আচমকা ওর চোখের জলও তেমনি করে শুকিয়ে গেলো। লাফিয়ে উঠে রাগে গজগজ করতে করতে ও সামনের একটা বাড়ি দেখিয়ে বললো, 'আমি ওখানে যাচ্ছি, গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাইবো···তাঁকে সব কথা খুলে বলবো।' 'থামো,' ওর হাত চেপে ধরে আমি চিৎকার করে উঠলাম। 'তুমি পাগল···জানো না, এখন ওখানে আর রাজা নেই?' 'রাজা না থাকলেই বা কি এসে যায়?' ও বললো, 'তাঁর জায়গায় কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই আছেন। যিনি তাঁর জায়গায় আছেন, আমি তাঁর সঙ্গেই কথা বলবো।' বাস্তবিক, ও তখন প্রাসাদের বিশাল দরজাটার দিকেই ছুটছিলো। ঈশ্বর জানেন কি একটা মারাত্মক দৃশ্যই না ও গড়ে তুলতো, যদি না আমি মরিয়া হয়ে আচমকা ওকে বলে না বসতাম, 'শোনো, ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখলাম।···চলো, গাড়িটার কাছে ফিরে গিয়ে আমরা বাচ্চাটাকে আবার তুলে নিয়ে আসি।···মানে আমি বলতে চাইছি, ওকে না হয় আমাদের কাছেই রাখা যাক···শত হলেও একটা কম বা বেশিতে···'

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে আসলে এটাই হচ্ছে সব চাইতে জটিল জট এবং এটা তৎক্ষণাৎ রাজার সঙ্গে কথা বলার মতলবটাকে বাতিল করে দিলো। 'কিন্তু সে কি এখনও ওখানে থাকবে?' কথাটা বলেই, সেই ধূসর

গাড়িটা যেখানটাতে দাঁড়িয়ে ছিলো, ও দ্রুতপায়ে সেই ছোট্ট রাস্তাটার দিকে এগিয়ে চললো। 'নিশ্চয়ই আছে,' আমি জবাব দিলাম, 'এখনও পাঁচ মিনিটই হয়নি!'

বাস্তবিক, গাড়িটা তখনও সেখানে ছিলো। কিন্তু আমার স্ত্রী সেটার দরজা খুলতে যেতেই বেঁটেখাটো চেহারার মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে উঠলেন, 'থামো!···আমার গাড়িটা নিয়ে কি হচ্ছে?' আমার স্ত্রী মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলো, 'আমি আমার জিনিসটাই নিতে চাইছি,' তারপর নিচু হয়ে বাচ্চাটাকে তুলে নিতে গেলো। লোকটা তবু ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, জিগেস করলো, 'কিন্তু ওখানে তোমার কি আছে? ওটা আমার গাড়ি, বুঝেছো? আমার—'

আমার বউকে তখন একবার দেখতে হয়! সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ও লোকটার কাছে এগিয়ে গেলো। তারপর চিৎকার করে বললো, 'আপনার কাছ থেকে কে কি নিতে যাচ্ছে? আপনার কোন চিন্তা নেই, কেউ আপনার কিচ্ছু নেবে না।···আর আপনার গাড়ি? আপনার গাড়িতে আমি থুথু ফেলি···এই দেখুন!' সত্যি সত্যি ও গাড়িটার দরজায় থুথু ফেললো। লোকটা হতভম্ব হয়ে বলতে শুরু করলো, 'কিন্তু ওই পুলিন্দাটা···?' ও বাঁকা গলায় বললো, 'এটা আমার বাচ্চা···ইচ্ছে হয় তো তাকিয়ে দেখুন!'

বাচ্চাটার মুখের কাপড় সরিয়ে ও ভদ্রলোককে বললো, 'আপনি আর আপনার বউ সারা জন্মেও এমন একটা সুন্দর বাচ্চা পাবেন না—এক জন্ম ঘুরে এলেও না।···খবরদার, আমার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে আমি চেঁচিয়ে পুলিস ডেকে বলে দেবো যে আপনি আমার বাচ্চা চুরি করার চেষ্টা করছিলেন।'

সত্যি সত্যি ও এমন করে শাসাতে লাগলো আর এত হম্বিতম্বি করতে শুরু করলো যে বেচারা মানুষটা মুখ লাল করে হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো—প্রায় যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, এমনি অবস্থা। শেষ পর্যন্ত ও অলস ভঙ্গিতে হেঁটে এসে রাস্তার মোড়ে আমার সঙ্গে মিলিত হলো।

চলে যাবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে, অথচ আমি এখনও ঢিলে বহির্বাসটা পরে বসে রয়েছি। আমার চারদিকে স্তূপীকৃত সুটকেস, আলমারিগুলো খোলা, কুর্সিগুলো দেখেশুনে খারিজ করে দেওয়া পোশাকে বোঝাই। যথারীতি আমার মনে হচ্ছিলো, সময় কমে আসছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে, সময়মতো সব কিছুই আমি সেরে ফেলবো। এ এক বিরক্তিকর বৈপরীত্য। কিন্তু এটাও সত্যি যে, আমাকে হাজারটা কাজ সেরে নিতে হবে—ধারাস্নান করতে হবে, মুখের প্রসাধন করতে হবে, চুল বাঁধতে হবে, পরে যাবার জন্যে একটা পোশাক পছন্দ করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত বেনোকে—দারুণ সুদর্শন এক জার্মান যুবক, যে আমার প্রেমে পড়েছে—টেলিফোন করে বলতে হবে, সে যেন আমাকে ভুলে যায় এবং তিন মাস আগে আমাদের মধ্যে যা ছিলো সেটাকে সে যেন একটা জোরকপালে অভিযান (তার পক্ষে) বলেই মনে করে—তার বেশি কিছু নয়।

বিশেষ করে ওকে আমার একটা কথা বলতেই হবে। বলতে হবে, আমার সময় নেই। প্রেম করতে গেলে সময়ের দরকার। এদিকে আমার বলতে গেলে নিঃশ্বাস নেবার সময় পর্যন্ত নেই। কাজেই প্রেম করার মতো সময় আমি পাবো কোথায়? এই চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে খানিকটা দায়িত্ব থাকার জন্যে এবং তার পরিবর্তে ফ্যাশানের পত্রিকাগুলোতে পৃথিবীর সুবেশা রমণীদের মধ্যে সপ্তম বলে বর্ণিত হবার জন্যে, এখন আমার শুধু-মাত্র সেই সমস্ত ব্যাপারেই সময় আছে যেগুলো দিনক্ষণ স্থির করে পরিকল্পনামতো করা যায়। যেমন—নিমন্ত্রণ, ভ্রমণ, অভ্যর্থনা, শিকার, বলনাচ, খেলাধুলো এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রেম-ভালবাসা, যা ছক-কাটা পরিকল্পনা সহ্য করতে পারে না, তার জন্যে আমার সত্যিই সময় নেই। কেউ তার কর্মতালিকায় লিখে রাখছে : বারোই ডিসেম্বর

থেকে বিশে জানুয়ারী—প্রেম…এ কথা কি কল্পনা করা যায়? যাদের সময় আছে, অর্থাৎ যারা সময়ের বাইরে বাস করে, প্রেম তাদের জন্যে। প্রেম আমার জীবনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে কিনা—সৌখিন সমাজের কোন এক সাংবাদিকের এই প্রশ্নের জবাবে আমি কি বলেছিলাম, জানেন? আমি আমার স্বভাবসিদ্ধ সেই ঝলমলে হাসিটি হেসে বলেছিলাম, 'আমি উড়োজাহাজে বাস করি। উড়োজাহাজে থেকে আমি প্রেমের কথা ভাববো কি করে? যাঁরা স্থায়িভাবে এক জায়গায় থাকেন, প্রেম তাঁদের জন্যেই থাক।'

অতএব অগোছালো বিছানায় বসে ঢাউস খাতাটা নিয়ে, আমি তামাম ছুনিয়ার জড়ো করা ঠিকানার মধ্যে থেকে আঙুল দিয়ে দিয়ে বেনোর নামটা খুঁজতে শুরু করলাম। আমার পাশেই ট্রের ওপরে চা, যা এখনও আমার খাবার সময় হয়নি। গ্রাহযন্ত্রটা মাত্র তুলে নিতে গিয়েই আমি আচমকা থমকে গেলাম। ঝি ঘরে ঢুকে ঘোষণা করলো, 'আপনার বোন।' এবং পরক্ষণেই আমার যমজ সহোদরা সুজানা ঘরে হাজির হয়ে একঘেয়ে সুরে বললো, 'হ্যালো, মারিয়ানা।'

সবাই বলে, যমজ বোনেরা এক আশ্চর্য মানসিক বন্ধনে যুক্ত থাকে—যে কারণে একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে, অন্যজনেও তার প্রতিক্রিয়া অনুভব করে। কথাটা নেহাতই অর্থহীন। আমি এতদূর বলতে চাই না যে সুজানা আমার কাছে একেবারে অপরিচিতা, কিন্তু আসলে ঘটনাটা প্রায় তাই। একথা অবশ্যই স্পষ্ট যে আমরা যমজ—ছুজনেরই বড় বড় নীল চোখ, একই রকমের সাদা চুল, তীক্ষ্ণ নাক, চওড়া লাল মুখ। কিন্তু সাদৃশ্যটুকু সেখানেই শেষ। আমি একেবারে চড়া পর্দায় বাঁধা, খানিকটা নার্ভাস এবং খেয়ালী। আর সুজানা ঢিলেঢালা, নিস্তেজ, সহজে উত্তেজিত হয় না। আমার প্রধান বৈশিষ্ট্য—অতিরিক্ত চটপটে ভাব, সুজানার—বিরক্তিকর ঢিলেমি। ধরে নেওয়া যেতে পারে, স্বভাবের এই ভিন্নতা থেকেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাগ্যও আলাদা হয়ে গেছে। প্রথম থেকেই আমার উদ্দেশ্য ছিলো বড়লোক হওয়া এবং

আমি তাতে সফলও হয়েছি—যদিও এর মূল্য হিসেবে এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাকে 'সুবিধেজনক' বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে হয়েছিলো এবং ভাগ্যক্রমে খুব শীগ্রিই তিনি আমাকে বিধবা করে চলে গিয়েছিলেন। সুজানা কিছুই চায়নি, শুধু দিন কাটিয়েছে এবং কিছুই পায়নি। এখন ওর উপস্থিতির দৃশ্যটাই বা কি মনোহর! পোশাক-আশাক ঠিক একটা ভবঘুরের মতো—গায়ে বেঢপ একটা সোয়েটার, পরনে রঙচটা পাতলুন, পায়ে গোড়ালি-ক্ষয়ে-যাওয়া জীর্ণ জুতো। মুখে প্রসাধনের নামগন্ধও নেই, চাষাদের মতো মাথায় বাঁধা রুমালে মুখের চারদিক ঘেরা। অবিলম্বে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে বললাম, 'তুই এসেছিস! কিন্তু আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে, অথচ এখনও সব কিছুই করার বাকি। ছাখ্, তুই বরং চলে গেলেই ভালো হয়।'

আদৌ তেমনটি হলো না, ও দু হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। এক লাফে পেছিয়ে গিয়ে আমি একটুর জন্যে ওর আলিঙ্গন এড়ালাম—কারণটা সংক্ষেপে বলতে গেলে, ওর গায়ের দুর্গন্ধ। সুজানা তাতে বিচলিত হলো না। ঘরের চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আদুরে আদুরে অবাক গলায় টেনে টেনে বললো, 'ও মা, কত সুন্দর সুন্দর পোশাক! কি দারুণ! তোর নিশ্চয়ই অনেক পোশাক আছে!'

ইতিমধ্যে আমি বহির্বাসটা খুলে স্নানঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, কিছু দিলে হয়তো ওর কাছ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। তাই নগ্ন অবস্থাতেই ফিরে এসে ঘরের মধ্যে ছোটাছুটি করে আমার কখনও-না-পরা একটা পাতলুন, একটা কাশ্মীরি সোয়েটার আর কয়েকটা আনকোরা নতুন জুতো তুলে নিলাম। তারপর সেগুলো ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে বললাম, 'এই নে, তোর ওই দুর্গন্ধে ভরা নোংরা পোশাকগুলো ছেড়ে এগুলো পরে নে। যাই হোক, কিছু লাভ তো তোর হলো। এবারে দয়া করে যা—আমার একটুও সময় নেই।'

আস্তে, খুবই ধীরে ও পোশাকগুলো তুলে নিলো, অনেকক্ষণ ধরে

পরীক্ষা করলো, বারবার খানিকটা সন্দেহজনক এবং হয়তো প্রায় বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতেই 'ধন্যবাদ' কথাটার পুনরাবৃত্তি করলো এবং তারপর আমাকে চরম বিরক্ত করে শান্ত গলায় বললো, 'এবারে এগুলো পরে দেখবো।'

'না, পরে আর দেখতে হবে না। পরে এখান থেকে কেটে পড়্।'

সুজানা আমার কথা শুনলো না। আস্তে আস্তে চেনটা টেনে নামিয়ে পাতলুনটা খুললো। তারপর একটু একটু করে সোয়েটারটা তুলে, মাথা দিয়ে সেটা খুলে নিলো। এখন ওর পরনে শুধু ব্রাসিয়ার আর সংক্ষিপ্ত একটা জাঙিয়া। দুটোই শতচ্ছিদ্র, সুতো বেরিয়ে আসা, নোংরা। রাগে আমি ওর দিকে ছুটে গেলাম। 'তুই একটা নোংরা, জঘন্য!' চিৎকার করে বললাম, 'আমার পোশাকগুলো পরার আগে তোকে স্নান করে নিতে হবে। আয়, আমরা এক সঙ্গে ধারাস্নান করবো।'

ওর পরনের নেকড়াগুলো ছিঁড়ে ফেলে, আমি ওকে ধারাযন্ত্রের নিচে ঠেলে দিলাম। সুজানা সামান্য জোরাজুরি করলো, প্রতিবাদ জানিয়ে একটু গাঁইগুঁই করলো, কিন্তু শেষ অব্দি হার মেনে নিলো। উষ্ণ জলের ধারার নিচে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা দুজনে। আমি ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাবান মাখিয়ে দিলাম। সাবান মাখাতে গিয়ে বুঝলাম, আসলে আমরা কতটা আলাদা। আমি নিজে শুধু মাত্র স্নায়ু আর মাংসপেশীতে গড়া, যেন ছোটাছুটি করার জন্যেই আমার সৃষ্টি। কেউ কোন দিনও আমাকে বিশেষভাবে খুঁটিয়ে দেখেনি, আর আমিও কোন দিন কাউকে তেমন করে লক্ষ্য করিনি। অন্য দিকে সুজানা নরম, কোমল, মসৃণ। যে কেউই অনুভব করবে ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখছে, গভীরভাবে লক্ষ্য করছে। এবং ও নিজেও এতটুকু না নড়ে অচঞ্চলভাবে নিজেকে দেখতে দিয়েছে, গভীরভাবে বিচার করতে দিয়েছে।...সুজানার সঙ্গে আমিও ধারাযন্ত্রের নিচে থেকে সরে এলাম। তারপর সংক্ষেপে ওর গা থেকে জল মুছে, ওকে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে, ফের শোবার ঘরের মধ্যে ঠেলে দিলাম।

'এখন তুই সাফসুফো হয়েছিস, এবারে আমার পোশাকগুলো পরতে পারিস।'

ছুজনেই পোশাক পরতে শুরু করলাম। কিন্তু সুজানা এত ধীরে-সুস্থে সব কিছু করছিলো যে আমি যখন পোশাক পরা শেষ করে প্রসাধন করার জন্যে সাজগোজ করার টেবিলের কাছে গিয়ে বসলাম, ও তখন সবেমাত্র পাতলুনে পা গলাচ্ছে। আয়না দিয়ে লক্ষ্য করলাম পোশাক পরা শেষ করে ও গটমট করে হাঁটছে, পরক্ষণেই শান্ত করে তুলছে নিজেকে। তারপরেই অন্যমনস্কভাবে বিলাপের সুরে বলতে শুরু করলো, 'আমি বছরে শুধু একবার বা ছবার তোর সঙ্গে দেখা করতে আসি। কিন্তু বাচ্চাগুলো কেমন আছে, তুই সে কথাটা পর্যন্ত আমাকে জিগেস করিস না।'

সুজানার তিনটি কন্যার জন্মদাতা তিনজন ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ, যাদের কেউই ওর স্বামী নয়। আমি কোন নৈতিক প্রশ্ন তুলছি না, কিন্তু এ ধরনের একটা পরিবারের জটিলতার জট খোলার মতো সময় মানুষ কোত্থেকে পাবে? তাই খুব তাড়াহুড়ো করে বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওরা কেমন আছে? ইসাবেলো, জিয়ানিনা আর লি—ওরা সব ভালো আছে তো?'

'ভালোই আছে। কিন্তু ওরা বড় হয়ে উঠছে আর ওদের কাছে এখন জামাকাপড়ের ব্যাপারটাই একটা সত্যিকারের সমস্যা। পোশাক বড় করে আমি সমস্যাটা মেটাই—মানে, পা অব্দি লম্বা আলখাল্লা বানাই, স্কার্টের ঝুল গোড়ালি পর্যন্ত নামিয়ে দিই। কিন্তু ওরা প্রতিবাদ করে, ওতে ওরা লজ্জা পায়—এখন ওরা সবেমাত্র বড়-হয়ে-ওঠা তরুণী-দের মতোই দাবি জানাতে শুরু করেছে।'

আমি তখন চোখের প্রসাধন সেরে নিচ্ছি। রাগে চোখ ছুটোকে ঝলমল করে উঠতে দেখে, আমি প্রায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। জিগেস করলাম, 'তোরা কি এখনও সেই নিচের তলার ঘরটাতেই থাকিস?'

'না, বাড়ি পালটেছি। এখন আমরা চিলেকোঠায় থাকি। ঘর মোটে

ছুটো—সত্যি কথা, কিন্তু ছাদে অনেকটা জায়গা। আমরা শহরতলিতে আছি, প্রায় গ্রামের মধ্যে।'

ও ঠিক আমার পেছনটিতে এসে দাঁড়িয়েছিলো বলে, আমি ওকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ওর উপস্থিতি অনুভব করে আমার বিরক্ত লাগছিলো। সাজগোজ করার টেবিল থেকে অনেকগুলো রঙীন ঝুটো পাথর বসানো চকচকে হলদে ধাতুর একটা লম্বা শেকল তুলে নিয়ে, কাঁধের ওপর দিয়ে সেটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এটাও পরে নে। তারপর কেটে পড়্ এখান থেকে।'

কাজটা আমার কখনই করা উচিত হয়নি। শেকলটা ও দু হাতে তুলে নিলো। তারপর নিঃশব্দে, লোভাতুর বিস্ময়ে একটা একটা করে প্রতিটা পাথর পরখ করতে লাগলো। ওর এমনধারা প্রচণ্ড ধীরতার কারণ, ও সব কিছু একটু একটু করে ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করে। কিন্তু আমি প্রচণ্ড চটপটে—তার কারণ, আমি মনের সাহায্যে সমস্ত জিনিসই তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলি। অবশেষে সুজানা ভয়ে ভয়ে, অথচ লোভাতুর সুরে বললো, 'কিন্তু এটা আমি তোর কাছ থেকে নিয়ে যেতে চাই নে। কি দারুণ জমকালো জিনিস! এটা তুই সত্যি সত্যি আমাকে দিয়ে দিচ্ছিস? তোর এটা দরকার নেই? এটা তুই পরে যাবি না?'

'না, ওটা আমি তোকে দিচ্ছি। কিন্তু ওটা গলায় ঝোলাবার জন্যে নয়, ওটা কোমরে পরতে হয়।'

'এমনি করে?'

এবারে আমি কোন জবাব দিলাম না। ঠোঁটের প্রসাধন শেষ করে ঘণ্টি বাজাবার বোতামে ভীষণ জোরে চাপ দিলাম। ঝি আসতেই তীক্ষ্ণ সুরে বললাম, 'ভিনসেনজোকে ওপরে এসে আমার সুটকেসগুলো নিয়ে যেতে বলো।'

যে কোন কারণেই হোক, এই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেলো। অদ্ভুত তার কারণ, ঘটনাটা নেহাতই তুচ্ছ। দুদিন আগে বাগানে পায়চারি করার সময় মুখের ওপরে রোদ্দুরের উষ্ণতা

অনুভব করে আমি ভেবেছিলাম, ও্‌হ, রোদ্দুরটা কি গরম !' সত্যিই, এটা আসলে গ্রীষ্মকাল। সুজানা যেভাবে ওই হলদে ধাতুর শেকলটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তা দেখে ওই ঘটনাটা পরিষ্কারভাবে আমার মনে জেগে উঠলো। মনে পড়লো, আমার ক্রনোমিটারের ছোট ছোট সংখ্যা-গুলোর কাছ থেকে জানার বদলে আমি সেদিন বাগানে পায়চারি করার সময় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে "আবিষ্কার" করেছিলাম যে এটা গ্রীষ্মকাল। ঠিক তেমনিভাবে, আমি সুজানাকে যে শেকলটা দিয়েছি, একটু আগেই সুজানা নিজের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেটার সৌন্দর্য "আবিষ্কার" করেছে। ...নিজেই নিজেকে বললাম, অনেক বছর হয়ে গেলো আমি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কিছু আবিষ্কার করিনি এবং তার কারণ, হায়, আমার কখনও থমকে দাঁড়িয়ে কোন কিছু গভীরভাবে তলিয়ে দেখার সময় হয়নি! কিন্তু এখন সুজানা আমাকে বলছে, 'তুই আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলি, যেন আমি একটা ভিখারী—তোর কাছে ভিক্ষে চাইতে এসেছি। এ কথা সত্যি যে তোর কাছে আমার একটা জিনিস চাইবার আছে। কিন্তু সেটা পোশাক-আশাকের প্রশ্ন নয়।'

স্থির সঙ্কল্প নিয়ে বললাম, 'দ্যাখ্‌, আমার সময় নেই। গাড়িটা আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে বলে অপেক্ষা করছে...'

'যদিও ব্যাপারটা খুবই জটিল আর কাহিনীটা ভীষণ লম্বা, তবু আমি তোকে সংক্ষেপেই বলবো। তোর জানা দরকার যে...'

বেরিয়ে যাবার পথে আমি ততক্ষণে দরজা অব্দি এগিয়ে গেছি। চিৎকার করে বললাম, 'আমার যে সময় নেই তা তুই বুঝতে পারছিস, কি না ?'

আমি বেরিয়ে এলাম। সুজানা এক ছুটে সিঁড়িতে আমার পাশা-পাশি এগিয়ে এলো, 'তোর জানা দরকার যে কয়েক মাস আগে অসাধারণ রূপবান এক যুবক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো এবং সে আমার প্রেমে পড়েছে।'

'দুঃখিত, কিন্তু তাতে আমার কি আসে যায় ?'

'দাঁড়া! সে আমার প্রেমে পড়েছে, তার কারণ সে তোকে ভালবাসতো।'

'দারুণ ব্যাপার!'

'একটু ভেবে ছ্যাখ্। তার কাছে আমি—কিভাবে বলবো?—তোর এক ধরনের বদলী বলতে পারিস। সে বলেছে, তোর সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক ছিলো। তারপর তুই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিস। তাই এখন সে আমার মাধ্যমে তোকে ভালবাসতে চায়—কারণ আমি তোর যমজ বোন, তোর সঙ্গে আমার ভীষণ মিল। আমার তাতে কিইবা এসে যাচ্ছে? ওকে দেখতে এত সুন্দর···তাছাড়া তোর সঙ্গে একত্রে একটা পুরুষমানুষকে পাবার ব্যাপারটা, কেন জানি না আমার খুব পছন্দ।'

'তোর পক্ষে ভালোই! ভালো কাজ করেছিস। শোন্, আমি ওই শেকলটা যেমন তোকে উপহার দিয়েছি, তেমনি ওই মানুষটাও দেবো। ওকে নে, নিয়ে উপভোগ কর্।'

'ওর নাম বেনো—ও একজন জার্মান।'

আমার আর সময় ছিলো না। দু হাতে সুজানার গলা জড়িয়ে ধরে আমি ওকে আলিঙ্গন করলাম। গাড়িটা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমার মাথার মধ্যে উড়োজাহাজের গর্জন, যেটা শীঘ্রিই আমাকে নিয়ে চলে যাবে। ব্যস্তভাবে ওকে বললাম, 'চলি রে—সুখী হোস তোর বেনোকে নিয়ে।'

'তুই বলতে চাইছিস "তোর" বেনোকে নিয়ে।'

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আমি গাড়িতে উঠলাম। হয়তো আমার গভীর বুদ্ধিগত চিন্তাধারা থাকা উচিত ছিলো। হয়তো তেমন সুযোগও থাকতে পারতো। কিন্তু আমার সময় ছিলো না।

'উমবের্তো এটা করে, উমবের্তো সেটা করে···স্কুলে ক্লাসের মধ্যে উমবের্তো সবার ওপরে, উমবের্তোর মা বলেছে তাঁরা ওকে একটা পদক দেবেন···উমবের্তো কাজ করছে···উমবের্তো বাড়িতে টাকা-পয়সা আনছে ···উমবের্তো নিজের টাকায় একটা মোটর-স্কুটার কিনেছে···উমবের্তো গাড়ি কিনছে···'

শিশু বয়সে লালাপোষ পরা অবস্থা থেকে চিরদিনই লক্ষ্য করে আসছি, উমবের্তো আমার পথের কাঁটা। ভিয়া কানদিয়ার একটা বাড়িতে একই তলায় থাকতাম আমরা। দুটো ছোট ফ্ল্যাটের একটা উমবের্তোর বাবার—একতলায় তাঁর পাখির মাংস বিক্কিরির দোকান—অন্যটা আমাদের। আমাদের দুজনের মা ছিলেন পরস্পরের বান্ধবী এবং আমরা একই সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছি। কাজেই আমি যখন দায়িত্বজ্ঞান-হীন অলস ও অপদার্থ হয়ে উঠলাম, তখন আমার মা যে আদর্শ হিসেবে উমবের্তোকেই দেখাবেন—সেটা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। অবিশ্যি আমি বলতে পারতাম যে আমার কড়ে আঙুলটাও ধূর্ত নৈতিকতার দিক থেকে অতিমাত্রায় রুচিবাগীশ, হীনচেতা উমবের্তোর সম্পূর্ণটার চাইতেও বেশি দামী। কিন্তু তাতে লাভটাই বা কি হতো? সকলেই জানেন, সব মেয়েরাই এক রকমের এবং পৃথিবীটা যদি মায়েদের পছন্দ-মতোই গড়ে উঠতো, তাহলে সেটা সম্পূর্ণভাবে শুধুমাত্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষে—বস্তুত, উমবের্তোর মত ধূর্ত, নীতিবাগীশ আর হীনচেতা চরিত্রের মানুষে—ভরে উঠতো।

উমবের্তোর ওপরে আমার রাগ ছিলো, কিন্তু আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিলো সম্পূর্ণ মার্জিত। দেখা হলে আমরা একজন অন্যজনকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে কুশল সংবাদ আদানপ্রদান করতাম। আসলে

প্রথম সুযোগে ঝগড়া বাধাবার অপেক্ষায় থাকা দুটি মানুষের মতো আমাদের সম্পর্কটা ছিলো ঠাণ্ডা যুদ্ধের সম্পর্ক। আর এই সুযোগটা এলো ঠিক সেদিনই, যেদিন অদক্ষতার কারণে ভিয়া দানদোলার রবারের কারখানা থেকে আমি বরখাস্ত হলাম।···সিঁড়ি দিয়ে আমি নেমে আসছিলাম ··মায়ের কথাগুলো তখনও কানে বাজছিলো আমার—'বাছা, তুই আমার মনটাকে একেবারে ভেঙে ফেলবি! অথচ উমবের্তোর দিকে তাকিয়ে ছাখ্, কত ভালো ছেলে!·· নিজেকে উমবের্তোর মতো করে তৈরি করে নে, বাবা!'

ঠিক তখনই উমবের্তোর সঙ্গে আমার দেখা হলো, সেও তখন বেরিয়ে যাচ্ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'আচ্ছা, তুই সব সময়েই সব কিছু ভালোভাবে করিস বোধহয়?'

'তার মানে?'

তার মানে তুই কখনও ভুল করেছিস, যা করা উচিত নয় তাই করে-ছিস···যেমন ধর্, এক হপ্তার টাকা জুয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিস—কক্ষনো কি তোর এমনটি হয় না?'

উমবের্তোর জায়গায় অন্য যে কেউ হলে এতে অসন্তুষ্ট হতো। কিন্তু উমবের্তো ওর ধূর্ত মুখে এক আশ্চর্য প্রশ্রয়ের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুললো। তারপর আমার কাঁধে একখানা হাত রেখে বললো, 'পিপি, আমি যা করি, তুই তাই কর্—তা হলে দেখবি সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

হিংস্রভাবে আমি জবাব দিলাম, 'আমার কাঁধ থেকে হাত সরা। ···আমি উপদেশ-টুপদেশ চাইবার জন্যে তোকে থামাইনি। বরং আমিই তোকে কিছু উপদেশ দিতে চাই।···ক্লারার কাছ থেকে সরে থাকবি। বলতে গেলে, আমাদের বিয়ের কথা ঠিকঠাক হয়ে গেছে।'

'বলতে গেলে···ঠিকঠাক হয়ে গেছে?'

'সে যা-ই হোক না কেন, ও আমার প্রেমিকা—ওর আশা তোকে ছাড়তে হবে। বুঝেছিস?'

'কিন্তু এতে আমার কি দোষ···ও যদি···?'

'যথেষ্ট হয়েছে—আগে থেকে সাবধান করে দিলাম, মনে থাকে যেন।'

আমার এ কথাগুলো বোঝার জন্যে জানা দরকার, আমি তখন ক্লারা নামে একটি মেয়ের পেছনে ছুটছিলাম। ভিয়া কানদিয়াতেই থাকতো মেয়েটি। ওদের বাড়িটা অবিকল আমাদেরটার মতো—তার মানে পুরনো আর হতকুচ্ছিত, চত্বরটা একটা চৌরঙ্গীর মতো বিশাল, সিঁড়ি-গুলোতে সেই একই রকমের 'এ' থেকে 'এফ' অব্দি নম্বর দেওয়া। ওই সিঁড়িগুলোর মধ্যে একটা দিয়ে উঠলে ক্লারার মায়ের ছোট ফ্ল্যাটটায় গিয়ে পৌঁছনো যায়। ওর মা, যিনি দলোরেস নামে পরিচিতা কিংবা ওই নামেই যিনি নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন, তিনি হস্তরেখা বিচার করেন। মহিলার বয়েস প্রায় পঞ্চাশ, রোগাপটকা চেহারা, ভূতের মতো ফর্সা—মুখটাতে যেন ময়দা মেখে রাখা—কালো চোখ দুটোর জন্যে ওই মুখটাকে মনে হয় যেন একটা প্লাস্টারের মুখোশ। বেচারী এক সময় ধনী ছিলেন, অন্তত উনি সে রকমই বলে থাকেন। অথচ এখন উনি তাস অথবা হাতের রেখার সাহায্যে অন্যদের ভবিষ্যৎ গণনা করেন। লোকে বলে, সে কাজটা উনি নাকি ভালোভাবেই করে থাকেন। ভিয়া কান-দিয়ার মহিলারা ছাড়া আশেপাশের বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা কেতা-দুরস্ত মহিলারাও ওর কাছে আসেন। এদিকে ক্লারা ওব মায়ের ঠিক বিপরীত—স্বাস্থ্যবতী, চটপটে, সুন্দরী, মুখে ঝলমলে হাসির স্বচ্ছ অভিব্যক্তি। ওর চোখ দুটো যেন শান্ত দুটি তারা। হাসলে ওর হালকা গোলাপী ঠোঁটের ওপাশ থেকে খোসা ছাড়ানো বাদামের মতো সাদা দাঁতগুলো দেখা যায়। মোট কথা ওর মুখখানা একেবারে একটা বাচ্চা মেয়ের মতো, যে এখনও ছেনালীর হাসি হাসতে শেখেনি। একটা অফিসে স্টেনো-টাইপিস্টের কাজ করতো ক্লারা, কাজকর্মে ও খুব ভালো ছিলো বলেই মনে হয়। ও যখন বাড়িতে থাকতো আর ওর মায়ের কাছে মক্কেলরা আসতো, তখন ও রান্নাঘরের টেবিলে বসে টাইপ যন্ত্রের চাবি-গুলো টেপাটেপি করতো অথবা ইংরেজী ব্যাকরণ পড়তো।...যা বলেছি,

ক্লারা ছিলো শান্ত মেয়ে। এতই শান্ত ছিলো যে এখন বলতে পারি, ওকে আমি যতই বেশি করে ভালবাসতাম ততই গোপনে গোপনে ওকে স্থির জলের সঙ্গে তুলনা না করে থাকতে পারতাম না। কিন্তু তা প্রবাদের গভীর স্থির জল নয়—বরং আগস্ট মাসের রাত্রিকালীন সুন্দর শান্ত সমুদ্র, যাতে চাঁদ-তারার ঝিলিমিলি প্রতিফলন ফুটে ওঠে…যাতে সনাতন পদ্ধতিতে হাতে হাত রেখে, এক হাতে প্রেমিকার কোমর জড়িয়ে, প্রেমিকার কাঁধে মাথা রেখে প্রেম করতে ইচ্ছে হয়। হ্যাঁ, সত্যিই ও ছিলো স্থির-শান্ত জল—এবং তা উভয় অর্থেই বটে।

সেদিনই ক্লারাকে আমি বলেছিলাম যে উমবের্তোর সঙ্গে আমার মুখোমুখি একচোট হয়ে গেছে। তাই শুনে ও শোভন ভঙ্গিমায় হাসতে শুরু করলো, 'এও কি সম্ভব যে উমবের্তোর মতো একটা মানুষকে তুমি হিংসে করো?'

'শত হলেও সে একটা মানুষ তো বটে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কি একখানা মানুষ!'

খানিকটা স্বস্তি পেয়ে ও কি বলতে চাইছে তা ওকে বুঝিয়ে বলতে বললাম। শিশুসুলভ শান্ত সুন্দর ভঙ্গিমায় হাসতে হাসতেই ও বললো, 'কি আর বলবো…প্রথমেই ওর চেহারাটার কথা ধরো। ওকে দেখতে পুতুলনাচের ফাজিয়োলিনোর মতো—সব সময়েই যে মার খায়, মুখটা লম্বা, চুলগুলো খোঁচা খোঁচা। ও যে কি বিরক্তিকর তা যদি তুমি জানতে! পৃথিবীটাকেই ও নিজের বলে মনে করে। ও সব কিছুই ভালো-ভাবে করে, ও বুদ্ধিমান, ও হ্যানা, ও ত্যানা…সব সময়েই শুধু নিজের কথা। তাছাড়া ওর কতকগুলো অদ্ভুত ধারণা আছে। ওর মতে, বউ-মানুষ বাড়িতে থেকে শুধু রান্নাবান্না করবে আর কাচ্চাবাচ্চা সামলাবে… বউ যদি অন্য পুরুষ সম্পর্কে বেশি আলোচনা করে, তা হলে সে ব্যক্তি তার ভাই হলেও, বউয়ের কপালে অশেষ দুর্গতি ঘটবে।…আমি তো মরলেও ওকে বিয়ে করবো না!'

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ও উমবের্তোর সম্পর্কে এমন খারাপ মতামত

জানালো যে শেষটাতে আমি সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হয়ে ওকে যতবার খুশি উমবের্তোর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিয়ে দিলাম।

সেদিন থেকে আমার মা যখনই আদর্শ হিসেবে উমবের্তোর কথা তুলতো, তখনই আমি নিজের প্রতি প্রতিশোধ নিচ্ছি বলে অনুভব করতাম। আমার মা ওকে একটা বেদীর ওপরে নিয়ে তুলেছিলো, আর ক্লারা সেখান থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো ওকে। 'লোকটাকে আমি সত্যিই পছন্দ করি না,' ক্লারা আমাকে বলেছিলো, 'ও যেখানে ফোরম্যানের কাজ করে, আমি ওর সঙ্গে সেই কারখানাটায় গিয়েছিলাম। কুলি-মজুরদের সঙ্গে ও এমনভাবে কথা বলছিলো, যেন তারা নিচুস্তরের সস্তা মানুষ অথচ ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই, ও সঙ্গে সঙ্গে একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেলো—যেমন নম্র, তেমনি মনোযোগী আর তোষামুদে।' কিংবা: 'শেষ ঘটনাটা তোমাকে বলি, শোনো। একটা ভিখারীকে ও একশোটা লির‍্যা দিয়েছিলো। কেন, বলতে পারো? কারণ সেটা ছিলো জাল নোট।' অথবা: 'ওর এমন কতকগুলো অভ্যেস আছে, যা আমি মোটেই সহ্য করতে পারি নে। ও যখন মনে করে আমি ওকে দেখছি না, তখনই ও নাক খুঁটতে শুরু করে।'

উমবের্তোকে ক্লারা এত গালিগালাজ করতো যে মাঝে মাঝে আমি প্রায় ওর পক্ষ নেবার মতো অবস্থাতে পৌঁছে যেতাম—এবং হয়তো তা ক্লারার তিক্ত মন্তব্য শুনে খুশী হবার জন্যেই।

'উমবের্তো ছেলে হিসেবে ভালো,' বলতাম আমি।

ও বলতো, 'কিন্তু মাকে ও বাঁদীর মতো ব্যবহার করে।'

'কিন্তু ওর রোজগারের টাকাটা তো ও বাড়িতেই নিয়ে আসে।'

'ওর টাকা ও বাড়িতে নিয়ে আসে? কক্ষনো না—ব্যাঙ্কে রেখে দেয়।'

'উমবের্তো খুব খাটে।'

'খাটে? ও তো একটা ফাঁকিবাজ। ওর মতলব হচ্ছে, অন্যেরা

খাটবে আর ও তার সুবিধেগুলো নেবে।'

ক্লারার ব্যাপারে আমি এতটা নিশ্চিন্ত হয়ে উঠেছিলাম যে একদিন ওকে বললাম, এবারে আমাদের সম্পর্কটা প্রথা অনুযায়ী সবাইকে জানিয়ে পাকাপাকিভাবে করে ফেলা উচিত। ও তক্ষুনি বললো, 'আমিও এই কথাটাই ভাবছিলাম, কিন্তু তোমাকে বলতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। তবে এ সমস্ত ব্যাপার পুরোদস্তুর নিয়মমাফিক করতে হবে—তুমি গিয়ে আমার মাকে কথাটা বলবে। মাকে তো তুমি চেনোই।' অতএব আমরা এ ব্যাপারে একমত হলাম যে, সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় আমি গিয়ে ওর মার সঙ্গে দেখা করবো। ইতিমধ্যে ক্লারা দেখা করবে উমবের্তোর সঙ্গে—কিন্তু এই শেষবারের মতো। পরিকল্পনাটা আমি অনুমোদন করলাম, তবে বেচারী উমবের্তো—যে কিনা এ ব্যাপারটা আদৌ আশা করছে না—তার জন্যে খানিকটা করুণার ছোঁয়া অনুভব না করে নয়। সাতটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে, ভিয়া কানদিয়া পেরিয়ে আমি ক্লারাদের বাড়ির সদর দরজাটায় গিয়ে ঢুকলাম।

'ডি' লেখা সিঁড়ির চারতলায় সিনোরা দলোরেসের ফ্ল্যাটটার দরজা সামান্য একটু খোলা ছিলো। ধাক্কা দিয়ে সেটা খুলে, আমি ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি, অপেক্ষা করার ছোট ঘরখানা লোকে ভর্তি। তাদের মধ্যে দু-তিনজন টুপি ছাড়া মহিলা ভিয়া কানদিয়ারই বাসিন্দা। ঘন রঙের সুন্দর মতো মেয়েটি আমাদের বাড়িতেই থাকে, আমার চোখ-চেনা। তাছাড়া বাদামী রঙের লোমের কোট জড়ানো, গাঢ় প্রসাধন করা ক্লান্ত চেহারার এক মাঝবয়সী মহিলাও ছিলেন। ব্যবসাপত্র তাহলে ভালোই চলছে—কুর্সিতে বসে টেবিল থেকে একখানা সচিত্র সাময়িক তুলে নিয়ে ভাবলাম, ভালো পয়সাই রোজগার করছেন সিনোরা দলোরেস। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর, চটপটে এক তরুণী দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। সিনোরা দলোরেসের দু গালে একগাদা চুমু দিয়ে তরুণী বললো, 'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।' সিনোরার পরনে কালো রেশমের জাপানী পাজামা, কুর্তার কোণে রঙীন সুতোয় তোলা ড্রাগনের ছবি, দাঁতের

মাঝে মেখানেক লম্বা সিগারেটের নল। আমার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে উনি বললেন, 'একটু বোসো, রিনালদি। তারপরে তুমি ভেতরে আসতে পারো।' লোমের কোট-পরা মাঝবয়সী মহিলাকে ভেতরে ঢুকিয়ে উনিও অদৃশ্য হয়ে গেলেন। যে কোন কারণেই হোক—সম্ভবত ওঁর স্বরভঙ্গির জন্যেই—আমার মনে হলো, আমি ওঁর কাছে যে প্রস্তাবটা রাখতে যাচ্ছি সে সম্পর্কে উনি কিছুই জানেন না। তখনই আমার মাথায় একটা চমৎকার মতলব খেলে গেলো। ভাবলাম, ক্লারার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যাপারটা আমার হাতে আছে কি না দেখার জন্যে সিনোরাকে আমি আমার ভবিষ্যৎ বলতে বলবো আর তার ঠিক পরেই আমাদের সিদ্ধান্তের কথা ওঁকে জানিয়ে দেবো। কথাটা চিন্তা করে সামান্য হাসলাম আমি, তারপর আমার পালা আসার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সিকি ঘণ্টা পরে লোমের কোট-পরা মহিলা রহস্যময় সতর্ক ভঙ্গীতে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলেন—সিনোরা দলোরেস ইঙ্গিত জানালেন আমাকে।

আমি জানতাম, স্থানাভাবের জন্যে মহিলা শোবার ঘরেই কাজ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবাক হলাম। ঘরটা লম্বা, আধো ছায়ায় ঢাকা। ভেতরে দুজনের শোবার মতো একটা বড় খাট হলদে চাদর দিয়ে ঢাকা। না ভেবে পারলাম না, ক্লারা ওই বিশাল খাটটাতে ওর মার সঙ্গে শুয়ে ঘুমোয়। সমস্ত জানলাগুলোতে সুতো দিয়ে পাখি আর ফুলের ঝুড়ির কাজ-করা পর্দা। জানলার কাছে একটা ছোট্ট টেবিলের ওপরে এক প্যাকেট তাস আর একটা আতসী কাচ। সমস্ত ঘরটা অসংখ্য ছোটখাটো আসবাব, বিশেষ বিশেষ মক্কেলদের সই-করা আলোকচিত্র, অভিজ্ঞানপত্র আর স্মৃতি-স্মারকে বোঝাই। কোন কথা না বলে সিনোরা দলোরেস টেবিলের কাছে গিয়ে বসে, আমাকে তাঁর উলটো দিকে বসালেন। প্রথমেই উনি যা করলেন তা হচ্ছে, দেশলাইয়ের আগুনে ছোট্ট এক টুকরো কালো কাগজ জ্বালিয়ে দেওয়া। কাগজটা থেকে গন্ধযুক্ত সাদাটে ধোঁয়া উঠলো। 'গন্ধ পাচ্ছো?' সুসংস্কৃত, ক্লান্ত গলায় সিনোরা

বললেন, 'বলো রিনালদি, তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি?' বললাম, উনি আমার ভবিষ্যৎ বলে দেবেন বলেই আমি এসেছি। উনি তখন সিগারেটের নলটা ছাইদানে রেখে দিয়ে আমার হাতটা তুলে নিলেন, তারপর আতসী কাচটা আমার হাতের ওপরে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রেখাগুলো দেখতে লাগলেন।

কয়েক মুহূর্ত কেটে যাবার পর সিনোরা প্রায় আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠলেন, 'এ কোন্ ধরনের মানুষের সঙ্গে কথা বলছি আমি?'

অপ্রতিভ হয়ে জিগেস করলাম, 'কেন?'

'কারণ এটা এমন একজন পুরুষের হাত, যে মেয়েদের খুব বেশি পরিমাণে পছন্দ করে।'

বললাম, 'শত হলেও আমি একজন যুবক তো বটে!'

'হ্যাঁ, কিন্তু এ সব ব্যাপারে একটা সীমামাত্রা আছে। কিন্তু তোমার মধ্যে তা নেই বলেই মনে হয়। তোমার হৃৎপিণ্ড একটা হাতিচোকের মতো।'

'তাই যদি বলেন তো…'

আমি বলতে শুরু করতেই উনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি নই—তোমার হাতই বলছে যে, তুমি একটি ডন জুয়ান।'

'ওহ্, অতটা বাড়িয়ে বলবেন না!'

'আমি মোটেই বাড়িয়ে বলছি না। তোমার হৃদয়-রেখার দিকে তাকিয়ে ছাখো—ঠিক একটা শেকলের মতো। শেকলের প্রতিটা জোড় এক-একটি মেয়ে।'

'তা ছাড়া?'

'তাছাড়া—আর কিছুই নেই। ব্যবসাতে ভাগ্য কম, কাজ করার প্রবণতাও কম, চরিত্রে আন্তরিকতা সামান্যই, দায়িত্ববোধও যৎকিঞ্চিৎ।'

আমি বিরক্ত হয়ে উঠতে শুরু করলাম, 'আপনি আমার মধ্যে দোষ ছাড়া আর কিছুই দেখছেন না।'

'এগুলো দোষ নয়, বৈশিষ্ট্য। তবে মা হলে আমি নিশ্চয়ই আমার

মেয়েকে তোমায় বিয়ে করতে দিতুম না।'

কথাটা আমাকে রাগিয়ে তুললো। জিগেস করলাম, 'দেখুন তো, আমার হাতে বিয়ের রেখা আছে কিনা ?'

দ্বিধাগ্রস্তভাবে ফের উনি আতসী কাচটা তুলে নিলেন, আমার হাতটা সমস্ত দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, 'যত খুশি অভিযান চালিয়ে যেতে চাও—হবে। কিন্তু বিয়ে হবে না।'

বললাম, 'সিনোরা দলোরেস, এবারে আমাদের বোঝাপড়াটা হয়ে যাক। আমি আপনাকে হাত দেখাতে আসিনি। আমি বলতে এসেছি যে, আপনার মেয়ে আর আমি পরস্পরকে ভালবাসি এবং আজই স্থির করেছি আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবো।

কথাটা শুনে মহিলা শান্তভাবে আতসী কাচটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু বাছা...'

'কি ?'

'ছ্যাখো বাছা, হাত সর্বদা সত্যি কথা বলে। বিয়ে তোমার হবে না —শীগগিরি তো নয়ই।'

'ক্লারা আর আমার মধ্যে চুক্তি হয়ে গেছে দেখেও কেন আপনি এ কথা বলছেন ?'

'তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তিই হয়নি। তুমি ভেবেছো তুমি ক্লারার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, কিন্তু ক্লারার তাতে সায় নেই...সে তোমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ নয়।'

'কে বলেছে এ কথা ?'

'আমি বলছি...ক্লারা ইতিমধ্যেই একজনের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে।'

'কিন্তু কবে ও... ?'

'এক সপ্তাহ হলো...উমবের্তো পমপেইর সঙ্গে। তোমাকে সে কথা বলার মতো সাহস ওর নেই, কারণ ও ভারি লাজুক মেয়ে। তাছাড়া ওর মনটা খুব নরম, কাউকে আঘাত দিতে চায় না। কিন্তু ও ভীষণ দুশ্চিন্তায়

রয়েছে…কতটা দুশ্চিন্তা তা তুমি জানো না। তবে এ কথা বলতেই হবে যে, এ ব্যাপারে উমবের্তো নিজেকে একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক বলে পরিচয় দিয়েছে। তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলার আগে পর্যন্ত আরও কয়েকটা দিন ক্লারা তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে উমবের্তোর কাছে অনুমতি চেয়েছিলো—উমবের্তো সঙ্গে সঙ্গে তাতে রাজী হয়ে যায়। আমি জানি না, এ ধরনের পরিস্থিতিতে কটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুগল এমনধারা কাজ করবে।'

আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মহিলা যখন সম্মোহিনী সুরে বললেন, 'এবারে তাসগুলো দেখা যাক…আমি বাজি ফেলে বলছি, তোমার জীবনে আরও অনেক মেয়ে আসবে—' তখন আমি যান্ত্রিকভাবে পকেট থেকে ওঁর পারিশ্রমিক এক হাজার লির‍্যা বের করে টেবিলের ওপরে রেখে, বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। নিজেকে একেবারে হতচেতন বলে মনে হচ্ছিলো আমার। মনে হচ্ছিলো, হাত দেখার বদলে সিনোরা দলোরেস যেন হাতুড়ি দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করেছেন। সূর্যের উষ্ণতা পেয়ে খড়ের গাদার ভেতর থেকে ক্রমশ জেগে ওঠা অসংখ্য সাপের মতো অগুন্তি সন্দেহ আমার সেই হতশ্চেতন অনুভূতির মধ্যে গুঁড়ি মেরে উঠতে শুরু করলো। তাহলে ক্লারার সঙ্গে দেখা করতে দিয়ে আমি যখন উমবের্তোর প্রতি উদার ব্যবহার করছি বলে মনে করেছিলাম, তখন আসলে ক্লারাকে আমার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিয়ে উমবের্তোই আমার প্রতি উদারতা দেখিয়েছে। তা হলে ক্লারা উমবের্তোকে গালিগালাজ করছে শুনে আমি যেমন আনন্দ পেতাম, উমবের্তোও হয়তো তেমনি ক্লারা আমাকে গালিগালাজ করছে শুনে মজা পেতো। তার মানে পুরো সময়টাই ক্লারা একসঙ্গে দুটো খেলা চালিয়েছে। শুধু শেষ সময়টাতে বোকা বনেছি আমি।…আমার মাথায় যখন এ সমস্ত চিন্তা বয়ে চলেছে, তখন আমাকে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ বিচলিত দেখাচ্ছিলো। কারণ ছোট ঘরটাতে অপেক্ষায় বসে থাকা সেই সুন্দর মতো মেয়েটি তখুনি বেড়ালকে ডাকার মতো 'শু শু' করে একটা শব্দ

করে, একই সঙ্গে চোখের ইঙ্গিতে আমাকে ডাকলো। আমি থামতেই ও জিগেস করলো, 'কি ব্যাপার? উনি কি খুব আজে বাজে বিশ্রী কথা বলেন নাকি?'

বললাম, 'ভীষণ বিশ্রী···অন্তত আমার পক্ষে।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি, 'তাহলে আমি আর ভেতরে যাচ্ছি না। আমার তো ভীষণ ভয়, উনি হয়তো আমাকে কোন বাজে কথা বলে দেবেন!'

যান্ত্রিকভাবে আমি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, মেয়েটি অনুসরণ করলো আমাকে।

সিঁড়ির মুখে এসে আমি অপাঙ্গে ওর দিকে তাকালাম। খুবই ঘন ওর গায়ের রঙ। চুলগুলো প্রায় ছেলেদের মতো ছোট করে ছাঁটা—যেন সোহাগ ভরে ওর গোল মুখখানিকে ঘিরে রেখেছে, একটু ঝুঁকে এসে সামান্য ছায়া ফেলেছে ওর গাল আর চিবুক দুটিতে। মেয়েটিকে আমার ভারি মিষ্টি বলে মনে হলো। আর মেয়েটিও যেন আমার মনের কথা অনুমান করে, আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। বললো, 'আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আমরা এক বাড়িতেই থাকি।'

হঠাৎ সিঁড়ির নিচ থেকে রুপোলী হাসির ঝিরঝিরে শব্দ ভেসে এলো···ক্লারার ছেলেমানুষী হাসির শব্দ। আর সেই একই সঙ্গে উমবের্তোর খানিকটা কর্কশ কণ্ঠস্বর। নির্দ্বিধায় আমি মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরে জিগেস করলাম, 'কি নাম তোমার?'

'অ্যানজেলা,' সপ্রতিভ চোখে আমার দিকে তাকালো মেয়েটি।

সেই মুহূর্তে ক্লারা ও উমবের্তো আমাদের খুব কাছ ঘেঁষে চলে গেলো। লক্ষ্য করলাম, ক্লারা আমাদের এমন ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখেও শালীন ভঙ্গিমায় চোখ দুটি নামিয়ে নিলো। 'বেশ তো, তাহলে ওটাকেই নাও,' তেতো মনে ভাবলাম আমি। ওরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলো, আমরা নেমে এলাম নিচে। অ্যানজেলার কোমর থেকে হাত তুলে নিয়ে

ওকে বললাম, 'আমাদের এই দেখা হওয়ার উৎসবটুকু পালন করতে, চলো আমরা এক পাত্র পান করে আসি।'

আমার হাত ধরলো অ্যানজেলা। দুজনে মিলে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম আমরা।

ফোরো ইতালিকোয় চার কোণাচে মিনারটার কাছে ওদের দেখা করার কথা ছিলো। গতকাল বৃষ্টি হয়েছিলো—এখন আকাশটা কর্কশ, সতেজ নীল, যেন নতুন রঙ ফেরানো হয়েছে। দমকা হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে চলেছে লালচে পাড় বসানো ধূসর রঙের কেঁপে ওঠা ভারি পশমী মেঘগুলোকে। ঝলমলে রোদ্দুর মিনারটার হালকা সোনালী রঙের চূড়ার পেছনে গাছগাছালিতে-ভরা মনতে মারিয়োকে করে তুলেছে ছায়াঘন অন্ধকার। মিনারটার কাছে গাড়ি থামিয়ে গিয়োভানি হাত-ব্রেকটা টেনে তুললো, তারপর নেমে এসে হুডের আঙটা আর বাঁধন খুলতে শুরু করলো।···প্রচণ্ড গরম পড়েছে, হয়তো এটা আর একদফা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্ব লক্ষণ। গিয়োভানির ভারি ভালো লাগছিলো, দুরন্ত বেগে রক্ত বইছিলো তার শিরাগুলোর ভেতর দিয়ে। শীঘ্রিই সেই মেয়েটি এসে পৌঁছবে। দুজনে মিলে গ্রামের দিকে চলে যাবে ওরা—চলে যাবে সুন্দর কোন সবুজ জায়গায়, সন্ধ্যা অব্দি সেখানেই থাকবে দুজনে।

কিন্তু একজনের সাহায্য ছাড়া আঙটাগুলো কিছুতেই খুলতে চাইলো না, সেই সঙ্গে হুডটাও গুটিয়ে রাখতে হবে। গিয়োভানি যখন বৃথাই অসহায়ভাবে হাতড়ে চলেছে, তখন শুনতে পেলো কে একজন জিজ্ঞেস করছে, 'আমি কি আপনাকে সাহায্য করবো?'

মুখ ফিরিয়ে গিয়োভানি দেখলো, তারই সমবয়সী একটি যুবক—পাতলা কালো চেহারা, সুন্দর কোমল মুখ—ঘন কালো ভুরুর নিচে ঝকঝকে দুটি চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গিয়োভানি ওকে ধন্যবাদ জানাবার মতো সময়টুকু পাবার আগেই ছেলেটি হুডের হাতলটা চেপে ধরলো এবং মুহূর্তের মধ্যেই আঙটা ও বাঁধন খুলে হুডটা নামিয়ে

ফেললো। ফের গাড়িতে উঠে বসে অপরিচিত লোকটার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলো গিয়োভানি। সে আশা করেছিলো, লোকটা সিগারেট নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু ঘটনাটা সে রকম ঘটলো না। গিয়োভানির কাছ থেকে নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে সে গিয়োভানির একটা হাত নিজের দু হাতে চেপে ধরলো। অবাক হয়ে গিয়োভানি দেখলো, লোকটার হাত দুটো স্পষ্টই কাঁপছে। তারপর গাড়ির দরজায় একটা হাত রেখে লোকটা গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো, সিগারেটটা মুখের কাছে তুলে ধরলো, ধোঁয়া টেনে নাক দিয়ে ধোঁয়াগুলো বের করে দিলো, ঠোঁটে লেগে থাকা কিছু তামাকের টুকরো থু থু করে ফেললো এবং শেষ পর্যন্ত সীমাহীন গতানুগতিকতায় আচমকা বলে বসলো, 'দিনটা চমৎকার, তাই না?'

অবাক হয়ে গিয়োভানি অনুভব করলো, লোকটা যে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তার সঙ্গে কথা বলছে, এতে তার খারাপ লাগছে না—বরং ঠিক তার উলটোটাই। নিজের খুশিয়াল অনুভূতির সঙ্গে লোকটার মানসিকতার মিল পেয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, সত্যিই অপূর্ব।' তারপর একটু চুপ করে থেকে, কি এক বিচিত্র কারণে একটা কথা মনে হতেই ফের বললো, 'এমন ধারা বাতাসটা যদি না থাকতো, তাহলে একেবারে সর্বাঙ্গসুন্দর হতো।'

দূরের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে যুবক বললো, 'এমন দিনে গ্রামে চলে যাওয়া ভালো। আপনার তাই মনে হয় নাকি?'

লোকটার কণ্ঠস্বরে এক আশ্চর্য কোমলতা—বিষণ্ণ, অথচ প্রায় যেন ভয় ধরিয়ে দেয়। গিয়োভানি লক্ষ্য করলো মাঝে মাঝেই লোকটা একটু তোতলাচ্ছে, কিন্তু সেটাও খারাপ লাগছে না। আচমকা লোকটাকে তার ভালো লেগে যায়, দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, এমন দিনে গ্রামে চলে যাওয়া সত্যিই ভালো।'

লোকটা মাথা নেড়ে এক মুহূর্ত নীরবে ধূমপান করলো। তারপর ফের বলতে শুরু করলো, 'এমন দিনে শহর ছেড়ে আমার মাঠের

মধ্যে হেঁটে বেড়াতে ইচ্ছে করে···ইচ্ছে করে শস্যক্ষেতে শুয়ে থাকতে। সবুজ ছায়াকুঞ্জের মতো দীর্ঘ শস্যমঞ্জরীর মাঝখানে শুয়ে থাকতে পারেন আপনি—শস্যমঞ্জরী হবে আপনার শয্যা, আপনার ছায়াকুঞ্জের দেয়াল···আর ছাদ হবে উন্মুক্ত নীল আকাশ। এক কণা শস্য খুঁটে নিয়ে, আপনি সেটা দাঁত দিয়ে গুঁড়ো করতে পারেন···নরম, দুধে ভরা শস্যের দানা···সূর্যরশ্মির দিকে মুখ তুলে শুয়ে শুয়ে সে দুধটুকু আপনি চুষে নিতে পারেন। চমৎকার, নয় কি?'

গিয়োভানির মনে হলো, লোকটা সুন্দর করে কথাগুলো বলেছে কিংবা হয়তো একটু বেশি সুন্দর করেই বলেছে এবং লোকটার প্রতি একটা বিচিত্র ভালো লাগার অনুভূতি যদি ইতিমধ্যেই তাকে পেয়ে না বসতো, তাহলে সে হয়তো এতে বিরক্ত হয়ে উঠতো। আলোচনাটা একটু কম কাব্যিকতায় ফিরিয়ে আনার জন্যে গিয়োভানি জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যাপারটা যদি আপনার সুন্দর বলেই মনে হয়, তাহলে আপনি গ্রামে যান না কেন?'

সিগারেটের ধোঁয়া বুকে টেনে নিয়ে লোকটা জবাব দিলো, 'যেতে ভীষণ ইচ্ছে করে।'

'তাহলে, আমি আবার জিগেস করছি, তাহলে যান না কেন?'

'একা একা যেতে চাই না বলে।'

গিয়োভানি সহৃদয়ভাবে বললো, 'আপনার একটি বান্ধবী খুঁজে নেওয়া উচিত। সেটা করেন না কেন?'

যুবক হাত এবং মাথা নেড়ে প্রায় আক্ষেপ-পীড়িত এক বিচিত্র ভঙ্গিমা করলো, কিছুই বললো না। গিয়োভানি তা সত্ত্বেও বলে চললো, 'যাই হোক, আমি কিন্তু একটি মেয়েকে পেয়েছি···এখন ওর জন্যেই অপেক্ষা করছি।' গিয়োভানি ভেবেছিলো, যুবকটিকে যে শীঘ্রিই চলে যেতে হবে, সে কথাটা বুঝিয়ে দেবার জন্যেই ও কথাটা বলেছে। কিন্তু সেটাই এর একমাত্র কারণ নয়—হয়তো আত্মশ্লাঘা আর গোপন এক পরিতৃপ্তিও এর কারণ।

যুবক অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে দু হাত দিয়ে গাড়ির দরজাটা আঁকড়ে ধরলো। তারপর ঝকঝকে চোখ দুটো তুলে তাকিয়ে রইলো গিয়োভানির দিকে। হঠাৎ ভীষণ বিরক্ত লাগলো গিয়োভানির। 'কি হলো ?' জিজ্ঞেস করলো সে, 'আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে রয়েছেন যে ?'

গিয়োভানি লক্ষ্য করলো, লোকটা যেন সঙ্গে সঙ্গে অতিদ্রুত হতবুদ্ধি হয়ে উঠলো। 'আমি দুঃখিত,' সে বললো, 'আমি সব সময় সকলের সঙ্গেই অমন করি···মানুষের দিকে গোঁ ধরে একটানা তাকিয়ে থাকি।··· আমি দুঃখিত।'

'ঠিক আছে, যেতে দিন—আমি শুধু ভাবছিলাম, কি ব্যাপার। আসলে কেউ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে সকলেরই নিজেকে বিব্রত বলে মনে হয়।'

যুবক কিছু বললো না, কিন্তু নড়লোও না। ড্যাস বোর্ডে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকালো গিয়োভানি···এতক্ষণে মেয়েটির এসে পড়া উচিত ছিলো। কিন্তু সে নিজেই ভেবে অবাক হলো যে, মেয়েটির এমনধারা দেরি হওয়াতে মনে মনে সে একটুও অখুশি হয়নি।

'আপনি কি ছাত্র ?' গিয়োভানি জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ।'

'কি পড়ছেন ?'

'সাহিত্য।'

'আমি ডাক্তারি পড়ছি।'

'দুটো একেবারে আলাদা বিষয়,' যুবকের মুখে বিষাদ আর চিন্তার অভিব্যক্তি।

'যেভাবে আপনি গ্রামের কথা বলছিলেন তাতে আমার বোঝা উচিত ছিলো যে, আপনি সাহিত্য পড়ছেন।'

'কি রকম ভাবে ?'

'সে আমি জানি না।' সহসা গিয়োভানি অনুভব করলো, এক

অজানা লজ্জার অনুভূতিতে সে লাল হয়ে উঠেছে। বললো, 'মানে··· খুব কাব্যিক ঢঙে।'

'মাঝে মধ্যে আমি সত্যিই কবিতা লিখে থাকি,' অন্যজন শুকনো গলায় বললো।

বিরোধ মেটানোর ভঙ্গিতে গিয়োভানি বললো, 'আমিও কবিতা ভালবাসি। প্রায়ই কবিতা পড়ি, একেবারে হাল আমলের লেখা অব্দি ওয়াকিবহাল থাকতে চেষ্টা করি—যদিও আমার সময় খুব একটা বেশি নেই···বিশেষ করে যখন পরীক্ষা এগিয়ে আসে।'

গিয়োভানি ভাবলো, সে যাদের পছন্দ করে তেমন দু-তিনজন কবির নাম এখানে উল্লেখ করাটা উচিত হবে কি না। কিন্তু লোকটা তার সম্বন্ধে একটা বাজে ধারণা করে বসতে পারে, এই আশঙ্কায় সে প্রচেষ্টা থেকে বিরত রইলো। এক মুহূর্ত পরে যুবকটি করুণ বিষণ্ণ গলায় প্রশ্ন করলো, 'কবিতা কি আপনার ভীষণ ভালো লাগে?'

'হ্যাঁ। হয়তো খুব একটা ভালো করে বুঝতে পারি না, কিন্তু কিছু কিছু কবিকে আমি সত্যিই খুব পছন্দ করি। তাঁরা আমাকে একটা জীবনবোধ···একটা···' গিয়োভানি কথা খুঁজে পাচ্ছে না বুঝে, বিব্রত হয়ে চুপ করে যায়। হয়তো লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে করুণার হাসি হাসছে, তাই ভেবে খানিকটা ভয়ে ভয়ে সঙ্গীর দিকে চোখ তুলে তাকায়। কিন্তু লোকটা তেমনি গম্ভীর, ওকে নিয়ে তার একটুকুও রসিকতা করার ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না। উলটে প্রশ্ন করে, 'আধুনিক কবিদের মধ্যে কাকে আপনার সব চাইতে বেশি ভালো লাগে?'

অপ্রস্তুত গিয়োভানি অনুভব করে, এই মুহূর্তে কোন কবির নামই তার মনে পড়ছে না। তারপর আচমকা একটা নাম মনের পর্দায় ভেসে ওঠে, 'যেমন ধরা যাক, গার্শিয়া লরকার কিছু কিছু কবিতা আমি পড়েছি এবং সেগুলো আমার কাছে খুব ভালো বলেই মনে হয়েছে।'

'কোন্ কোন্ কবিতা?'

এবারে প্রায় এক অদম্য লজ্জার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে

গিয়োভানি। শেষ পর্যন্ত বলে, 'ইয়ে···এই মুহূর্তে কবিতাগুলোর নাম আমার মনে পড়ছে না। তবে এটুকু মনে পড়ছে যে সেগুলো আমার সত্যিই খুব ভালো লেগেছিলো···সেগুলো আমি বারবার করে পড়েছি। ·· ও হ্যাঁ, একজন বুল-ফাইটারের মৃত্যু সম্পর্কে একটা কবিতা ছিলো।'

'হ্যাঁ, আর কোন্‌টা ?'

'আমার মনে পড়ছে না।'

অতিরিক্ত মার্জিত স্বরে যুবক প্রশ্ন করলো, 'আপনার কি অনেক বই আছে ?'

'আপনাকে যা বলেছি, আমি হাল আমল অব্দি তাল মিলিয়ে চলতে চেষ্টা করি।'

'বইয়ের আলমারি আছে ?'

'দুটো বেশ বড়সড় বইয়ের তাক আছে। একটাতে আমার ডাক্তারির বইগুলো রাখি—অন্যটাতে থাকে, যাকে বলতে পারি, অবসর বিনোদনের বই।'

'সেগুলো কি বই ?'

'তা ধরুন গে, কবিতার বই তো আছেই—তাছাড়া উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ—সবই কিছু কিছু করে আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পড়ার মতো সময় আমার খুব একটা নেই।'

'কখন পড়েন ?'

'ধরুন, সন্ধ্যাবেলা যদি বাড়িতে থাকি, তখন অন্য তেমন কিছু করার মতো না থাকলে—পড়ি।'

গিয়োভানি অনুভব করলো, সে এমন একটা অসাবধানী মন্তব্য করে ফেলেছে, যেটা পড়ার ব্যাপারে তার যথেষ্ট আগ্রহের অভাব বলে অর্থ করা যেতে পারে। কিন্তু অন্য মানুষটা যে সেটা লক্ষ্য করেছে বা তার বিসদৃশ জবানীটা আদৌ শুনেছে, তা মনে হলো না। তবু সে তাড়াতাড়ি নিজেকে শুধরে নিয়ে বললো, 'মানে আমি বলতে চাইছি, এখন যে মেয়েটির জন্যে আমি অপেক্ষা করছি সে যদি আমাকে টেলিফোন না

করে অথবা ওর সঙ্গে বেড়াতে যেতে না বলে, তা হলে তখন আমি ওই সমস্ত বই পড়ি। শত হলেও জীবনটা বইয়ের চাইতে বেশি দামী—আপনার কি তা মনে হয় না?'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, ওই মেয়েটিই জীবন?'

'এক দিক দিয়ে—তাই।'

'সন্ধ্যাবেলা কি আপনারা একসঙ্গে বেরোন?'

'যখন তেমন হয়।'

'তখন কি করেন?'

'সাধারণত আমরা সিনেমায় যাই।'

'সিনেমা আপনার ভালো লাগে?'

'হ্যাঁ, তা লাগে।'

'কোন্ ধরনের ফিল্ম আপনার সব চাইতে বেশি পছন্দ?'

'তা আর কি বলবো—ভালো ফিল্ম।'

'কিন্তু কোন কোন ছবি তো আপনি অন্য ছবিগুলোর তুলনায় অবশ্যই বেশি পছন্দ করেন?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। যেমন ধরুন, ফরাসি ছবি।'

'কোন্ ছবিটা?'

'এখন মনে পড়ছে না।'

'ফিল্মের পরিচালকদের মধ্যে কাকে আপনার সব চাইতে বেশি ভালো লাগে?'

'পরিচালক···কোন্ দেশের?'

'তা জানি না—ইতালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, জাপানিস, অ্যামেরিকান···'

গিয়োভানি তক্ষুনি অনুভব করলো, যুবকের কথাবার্তা ক্রমশ আরও বেশি করে অন্যমনস্ক হয়ে উঠছে। যেন যান্ত্রিকভাবে—বেচাল হয়ে যাওয়া যন্ত্রমানবের চরম নির্লিপ্ততায় কথা বলছে মানুষটা। গাড়ি থেকে খানিকটা পেছিয়ে গিয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, রাশিয়ান

পরিচালকদের আপনার ভালো লাগে ?' তারপর জবাবের জন্যে একটুও অপেক্ষা না করে হাঁটতে শুরু করলো। গাড়ির আয়না দিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলো গিয়োভানি। সাদা পাথর বাঁধানো পথ ধরে সেতুটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো মানুষটা। আর সেই মুহূর্তে উলটো দিক দিয়ে যে মেয়েটি তার দিকে এগিয়ে আসছিলো, অনেক দূর থেকে হলেও তার কালো-সবুজ আর লাল রঙের ছককাটা পশমী স্কার্টটা দেখে গিয়োভানি চিনতে পারলো, ওর জন্যেই সে এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে রয়েছে। তারপরেই ঘটনাটা ঘটে গেলো পলকের মধ্যে, যার জন্যে এগিয়ে গিয়ে সেটা বাধা দেবার কথাও গিয়োভানি ভাবতে পারেনি। যুবক এবং মেয়েটির দেখা হলো, কয়েক মুহূর্ত ওরা দুজন দুজনের সঙ্গে কথা বললো ···তারপর যুবক মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। মেয়েটি প্রচণ্ড প্রচেষ্টায় তাতে বাধা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিলো। এবং যুবক তখন হাত তুলে ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিলো। মেয়েটি এবারে গাড়িটার দিকে ছুটতে শুরু করলো। যুবকও ছুটতে শুরু করলো, কিন্তু বিপরীত দিকে।

গাড়ির দরজা খুলে গিয়োভানির পাশে এসে বসলো মেয়েটি। হাঁফাতে হাঁফাতে প্রশ্ন করলো, 'তুমি কেমন আছো ?'

অপাঙ্গে ওর দিকে তাকালো গিয়োভানি—ঘন রঙা মেয়েটির ফ্যাকাশে গালে চড়ের লাল দাগটা এখনও স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে। দাগটার আকৃতি প্রায় একটা হাতের পাতার মতো। নিঃশব্দে হাতব্রেকটা নামিয়ে ইঞ্জিন চালু করলো গিয়োভানি। তারপর চার কোণাচে জায়গাটায় সাবধানে গাড়িটা পেছোতে শুরু করে জবাব দিলো, 'আমি ঠিক আছি।'

গাড়ি চলতে শুরু করার পর স্কার্টের ভাঁজগুলো ছড়িয়ে আরও আরাম করে বসলো মেয়েটি।

'কোথায় চলেছি আমরা ?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'গ্রামে চলেছি। চলেছি গ্রামে যাবো বলে, শস্যক্ষেত্রে শস্যমঞ্জরীর মাঝখানে শোবো বলে।'

অধ্যাপক জিদ ধরে থাকায় আমি বারবার করে তাঁকে বলতে লাগলাম, 'সাবধান প্রফেসর, ওরা সহজ সরল মেয়ে···যাকে বলে সত্যিকারের গাঁইয়া। কাজেই সাবধানে কাজ করুন। আপনার পক্ষে একটি রোম্যান মেয়ে খুঁজে নেওয়াই ভালো হবে···সিয়োসিয়ারিয়ার মেয়েরা সত্যিকারের গ্রাম্য মেয়ে, চাষাভুষো, অশিক্ষিত।' বিশেষ করে এই শেষ কথাটাই অধ্যাপককে খুশি করে তুললো, 'অশিক্ষিত! আমি তো ঠিক তাই চাই। তাহলে অন্তত ওই ছবির বইগুলো সে পড়বে না।' অধ্যাপক একজন বৃদ্ধ মানুষ, মুখে সাদা সুচালো দাড়ি-গোঁফ, উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু তাঁর আসল পেশা ছিলো ধ্বংসস্তূপ। প্রতি রোববার এবং অন্যান্য দিনেও তিনি এখানে-সেখানে চলে যেতেন—আপ্পিয়ান ওয়ে অথবা ফোরাম কিংবা বাথ্‌স্ অফ কারাকাল্লায় রোমের ধ্বংসস্তূপগুলোর ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর নিজের বাড়িতে ধ্বংসস্তূপ সম্পর্কিত এবং অন্যান্য বই, বইয়ের দোকানের মতো একেবারে ডাঁই করে রাখা। সামনের দরজার কাছে বেশ কিছু সবুজ বই পর্দার আড়ালে লুকোনো থাকে। কিন্তু সেখান থেকে শুরু করে ভেতর-বাড়ি পর্যন্ত প্রতিটি বারান্দা, ঘর এবং সমস্ত ফাঁকা জায়গায়—শুধু স্নানঘর আর রান্নাঘর বাদ দিয়ে—সর্বত্র শুধু বই। বইগুলো তাঁর কাছে গোলাপের গন্ধের মতোই দামী. কেউ সেগুলো ছুঁলে আর রক্ষা নেই। বইয়ের সংখ্যা এত বেশি যে, সেগুলো সব তিনি পড়েছেন ভাবতেও অসম্ভব বলে মনে হয়। যখন তিনি স্কুলে বা বাড়িতে পড়ান না অথবা ধ্বংসস্তূপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন না, তখন পুরনো বইয়ের বাজারে গিয়ে প্রতিটা ঠেলাগাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ান এবং প্রতিবারই এক বাণ্ডিল বই বগলে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। সত্যি কথা বলতে কি বাচ্চা ছেলেরা যেমন করে ডাক-টিকিট

জমায়, উনিও ঠিক তেমনিভাবে বই সংগ্রহ করেন। কিন্তু কেন যে তিনি আমার গ্রামের কোন মেয়েকে পরিচারিকা করার জন্যে ক্ষেপে উঠলেন, তা আমার কাছে এক রহস্য। ওঁর মতে, ওই মেয়েরা অনেক বেশি সৎ এবং ওদের মাথায় কোন বদচিন্তা থাকে না। বললেন, লাল আপেলের মতো গালওয়ালা চাষী মেয়েদের দেখতে তাঁর ভারি ভালো লাগে। বললেন, ওরা খুব ভালো রাঁধুনে। শেষটাতে এমন হলো যে একটা দিনও যায় না, যেদিন উনি দরোয়ানের ঘরে মাথা গলিয়ে সিয়োসিয়ারিয়ার লেখাপড়া না-জানা মেয়ের সম্বন্ধে আমাকে কিছু না বলেন। তাই আমি দেশে আমার ধর্মবাবাকে ওই ব্যাপারে লিখে দিলাম এবং তিনি জবাবে জানালেন যে, ঠিক ওই ধরনেরই একটি মেয়েকে তিনি চেনেন—মেয়েটি আমাদের পাশের গাঁ ভাল্লেকোর্সার মেয়ে, নাম তিউদা, বয়েস এখনও কুড়ি বছর হয়নি। তবে, আমার ধর্মবাবা চিঠিতে এ কথাও জানালেন যে তিউদার একটা খুঁত আছে—ও পড়তে বা লিখতে জানে না। কিন্তু আমি জবাবে জানিয়ে দিলাম, অধ্যাপক ঠিক তাই-ই চান—একেবারে নিরক্ষর কোন মেয়েই ওঁর পছন্দ।

একদিন সন্ধ্যা বেলায় আমার ধর্মবাবার সঙ্গে তিউদা রোমে এসে পৌঁছলো। আমি স্টেশনে ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। প্রথম নজরেই বুঝলাম সিয়োসিয়ারোর মেয়ে বলতে যা বোঝায়, এ মেয়েটি ঠিক তাই। এরা দম নেবার জন্যে এতটুকু ফুরসত না নিয়ে সারা দিন ধরে মাটি খুঁড়তে পারে, প্রচণ্ড বোঝা ভর্তি ঝুড়ি মাথায় নিয়ে উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ ধরে চলতে পারে। তিউদার গাল দুটো লাল—অধ্যাপক যেমনটি পছন্দ করেন···একগুচ্ছ দীর্ঘ চুল মাথার পেছন দিকে গোটানো, কালো জোড়া ভ্রূ দুটো কপাল আর গোল মুখটার মাঝখানে একটা বেষ্টনী তুলে রেখেছে। এ কথা সত্যি যে ওর পোশাক-আশাকের ধরন সিয়োসিয়ারোর মতো নয়, কিন্তু সিয়োসিয়ারোর মেয়েদের মতোই ও গোড়ালিহীন জুতো পরে দৃঢ় পদক্ষেপে মাটিতে পা ফেলে। চটির ফিতে জড়ানো ওর পায়ের গুলি দুটোও সুন্দর পেশীবহুল। ওর হাতে ছোট

একটা ঝুড়ি ছিলো—বললো, ওটা আমার জন্যেই আনা হয়েছে। ঝুড়িটার মধ্যে ডুমুর পাতায় ছাওয়া খড়ে জড়ানো এক ডজন নতুন-পাড়া ডিম। আমি বললাম, এটা ওর বরং অধ্যাপককে দেওয়াই ভালো—তাতে তাঁর ধারণাটা ভালো হবে।·কিন্তু ও জবাব দিলো, অধ্যাপকের কথা ও ভাবেনি—কারণ যেহেতু উনি 'ভদ্দরলোক', অতএব নিশ্চয়ই ওঁর নিজস্ব মুরগী আছে। তাই শুনে আমি হাসতে শুরু করলাম এবং তারপর ট্রামে যেতে যেতে একটার পর একটা প্রশ্ন করে আবিষ্কার করলাম, মেয়েটা একেবারে সত্যিকারের বুনো। ও কোনদিন ট্রেন ট্রাম বা সাততলা বাড়ি দেখেনি, সম্পূর্ণ নিরক্ষর—মানে অধ্যাপক ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন।

বাড়িতে পৌঁছে প্রথমে আমি ওকে দরোয়ানের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। তারপর লিফটে চেপে অধ্যাপকের ফ্ল্যাটে উঠে এলাম। দরজা খুলতে অধ্যাপক নিজেই এলেন, কারণ ওঁর কোন চাকরবাকর নেই—সাধারণত আমার স্ত্রীই ওঁর ঘরদোর সাফ-সুফো করে, যৎকিঞ্চিৎ রান্নাবান্নাও করে দেয়।···আমরা ভেতরে ঢুকতেই তিউদা অধ্যাপকের হাতে ঝুড়িটা দিয়ে বললো, 'এই নাও প্রফেসার, আমি তোমার জন্যে কটা তাজা ডিম নিয়ে এসেছি।' আমি বললাম, 'প্রফেসারকে "তুমি" করে কথা বলবে না।' কিন্তু অধ্যাপক ওকে সাহস দিয়ে বললেন, 'না না, তুমি আমাকে "তুমি" করেই বলতে পারো বাছা···' তারপর আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে, এ 'তুমি' হচ্ছে রোমান 'তুমি', প্রাচীন রোমানদের 'তুমি'—যে রোমানরা সিয়োসিয়ারিয়ার মানুষদের মতোই আধুনিক কেতায় 'আপনি' করে কথা বলতে জানতো না, সকলের সঙ্গে নিরহঙ্কার ব্যবহার করতো—যেন সবাই এক পরিবারের মানুষ। তারপর তিউদাকে উনি রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। রান্নাঘরটা বিরাট—তাতে গ্যাসের উনুন, অ্যালুমিনিয়ামের স্যসপ্যান এবং সত্যি বলতে কি, প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই আছে। ওগুলো দিয়ে কি করে কাজ করতে হয়, উনি তিউদাকে তা বুঝিয়ে বললেন। তিউদা শান্ত এবং গম্ভীর হয়ে সব কিছু শুনলো। তারপর ঝঙ্কৃত গলায় বললো, 'কিন্তু

কি করে রান্না করতে হয়, আমি তো তা জানি না।'

অধ্যাপক অবাক হয়ে গেলেন, 'তার মানে ? আমাকে বলা হয়েছিল তুমি রান্না করতে জানো !'

'দেশের বাড়িতে আমি কাজকর্ম .করতুম...মাঠে মাটি কাটতুম। অবিশ্যি একটু-আধটু রান্নাবান্নাও করতুম, কিন্তু সে শুধু কিছু খাওয়ার জন্যে। এমন রান্নাঘর আমার কোন জন্মেও ছিলো না।'

'রান্না কোথায় করতে ?'

'ঝুপড়িতে।'

'আমরাও এখানে রান্না করি শুধু কিছু খাওয়ার জন্যে,' অধ্যাপক দাড়ি মুচড়ে বললেন। 'এখন মনে করা যাক, তুমি আমার জন্যে রাত্তিরের রান্না রেঁধে দিতে যাচ্ছো, যাতে আমি কিছু খেতে পাই। তাহলে তুমি কি করবে ?'

তিউদা সামান্য হাসলো, 'তাহলে তোমাকে ম্যাকারনি আর কড়াইশুঁটি রেঁধে দেবো। তারপর তুমি এক গেলাস মদ নেবে।...তারপর... তারপর না হয় কয়েকটা বাদাম আর নয়তো কিছু শুকনো ডুমুর—'

'ব্যাস ?...দ্বিতীয় কোন পদ হবে না ?'

'দ্বিতীয় পদ...মানে ?'

'মানে, দ্বিতীয় কোন রান্না...মাছ বা মাংস কিচ্ছু না ?'

এবারে মেয়েটা প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়লো, 'রুটি দিয়ে এক থালা ভর্তি ম্যাকারনি আর কড়াইশুঁটি খেয়েও তোমার যথেষ্ট হবে না ? তার চাইতে বেশি আর কি চাই তোমার ?...আমি কয়েকটা রুটি দিয়ে এক থালা ম্যাকারনি আর কড়াই শুঁটি খেয়ে দিনভর মাটি কাটতুম... আর তুমি তো কোন কাজও করো না !'

'হ্যাঁ, করি বইকি। আমি পড়াশুনো করি, লিখি...আমিও কাজ করি।'

'হ্যাঁ, তুমি ইচ্ছে হলে পড়াশুনো করতে পারো...কিন্তু সত্যিকারের কাজ আমরাই করি।'

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অধ্যাপক যতই বলুন না কেন, ওকে কিছুতেই বিশ্বাস করানো গেলো না যে, 'দ্বিতীয় পদে'র কোন প্রয়োজনীয়তা আছে। যাই হোক, শেষ অব্দি দীর্ঘ আলোচনার পরে ঠিক হলো, আমার স্ত্রী এসে কিছুদিন ওকে রান্নাবান্নাটা দেখিয়ে দিয়ে যাবে। তারপর আমরা পরিচারিকার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ভেতরের চত্বরের দিকে মুখ করা সুন্দর ঘর—ঘরে একখানা খাট, একটা টানা আলমারি আর একটা পোশাকের আলমারি। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েই তিউদা জিগেস করলো. 'আমি কি একাই এখানে ঘুমোবো ?'

'তুমি কার সঙ্গে ঘুমোতে চাও ?'

'বাড়িতে আমরা পাঁচজনে একটা ঘরে ঘুমোতুম।'

'এ ঘরটা সম্পূর্ণ তোমার জন্যে।'

যেহেতু শুধুমাত্র অধ্যাপকের কাছে নয়, আমার ধর্মবাবা—যিনি আমার অনুরোধেই তিউদাকে এখানে পাঠিয়েছেন—তাঁর কাছেও আমার একটা দায়িত্ব আছে, সেজন্যে ওকে মন দিয়ে ভালোভাবে কাজকর্ম করার মিনতি জানিয়ে শেষ অব্দি আমি বিদায় নিলাম। বেরিয়েই শুনলাম অধ্যাপক ওকে বোঝাচ্ছেন, 'মনে রেখো, প্রতিদিন একটা পালকের ঝাড়ন আর ধুলো ঝাড়ার নেকড়া দিয়ে তুমি এই বইগুলোর ধুলোময়লা সাফ করবে।' ও তখন জিগেস করলো, 'এই বইগুলো দিয়ে তুমি কি করো ? এগুলো তোমার কোন্ কাজে লাগে ?' অধ্যাপক জবাব দিলেন, 'তোমার কাছে কোদাল যা, আমার কাছে এগুলোও ঠিক তাই।··· এগুলো দিয়ে আমি কাজ করি।' ও বললো, 'হ্যাঁ, কিন্তু আমার কোদাল তো মোটে একটা।'

সেদিনের পর থেকে অধ্যাপক যখন-তখন দরোয়ানের ঘরে এসে আমাকে তিউদার খবর দিতেন। সত্যি কথা বলতে কি, আগের মতো তিনি ওর ওপরে আর অতটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। একদিন বললেন, 'মেয়েটা গাঁইয়া, একেবারে গাঁইয়া···গতকাল ও কি করেছে, জানো ?

আমার টেবিল থেকে আমার ছাত্রের পড়া লেখা একটা পৃষ্ঠা নিয়ে মদের বোতলের ছিপি করেছে।' বললাম, 'প্রফেসার, আমি তো আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম···একেবারে গ্রাম্য মেয়ে!' 'হ্যাঁ,' উনি বললেন, 'তবে মেয়েটা খুব ভালো···বেশ কথাবার্তা শোনে।'

অধ্যাপকের ভাষায় 'ভালো মেয়েটি' কিন্তু অন্য মেয়েদের মতো হতে বেশি সময় নিলো না,—শুরু করলো মাইনে পাওয়া মাত্র ভ্রু-প্রস্থের একটা পোশাক কিনে যাতে ওকে সত্যিকারের তরুণীর মতো দেখায়। তারপর কিনলো উঁচু গোড়ালি লাগানো কয়েকটা জুতো। তারপর নকল কুমিরের চামড়ার একটা হাতব্যাগ। খুবই দুঃখের কথা যে, ও ওর লম্বা চুলগুলোও কেটে ফেললো। অবশ্য ওর গাল দুটো আপেলের মতোই লাল রইলো, কারণ সেগুলো অত শীঘ্রি ফ্যাকাশে হয় না—যেমন হয় শহরে জন্মানো মেয়েদের ক্ষেত্রে। ওর গাল দুটো আকর্ষণের উৎস হয়েই রইলো এবং তা শুধুমাত্র অধ্যাপকের কাছেই নয়। প্রথম বার যখন আমি ওকে চারতলার মহিলাটির শোফার হতভাগা মারিয়োর সঙ্গে দেখলাম, তখনই বললাম, 'এবারে সাবধান হও, ও কিন্তু তোমার পক্ষে সঠিক মানুষ নয়। ও তোমাকে যা বলে, অন্য সব বান্ধবীদেরও তাই বলে।' ও জবাব দিলো, 'গতকাল ও আমাকে গাড়িতে করে মনতে মারিয়োতে নিয়ে গিয়েছিলো।' 'বেশ, তারপর?' 'গাড়ি করে যাওয়া কি মজা!···তাছাড়া দ্যাখো, ও আমাকে কি দিয়েছে!' তিউদা আমাকে সাদা ধাতুর একটা পিন দেখালো, তাতে ছোট একটা হাতি খোদাই করা—কামপো দি ফিয়োরিতে ফেরিওয়ালারা এ ধরনের পিন বিক্রি করে। বললাম, 'তুমি একটা অবোধ মেয়ে। তুমি বুঝতে পারছো না, লোকটা তোমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। তাছাড়া আরও বড় কথা, তোমাকে নিয়ে ওর নিজের খুশিমতো গাড়িতে চেপে বেড়ানোও উচিত নয়···সিনোরা ব্যাপারটা শুনতে পেলে ও মুশকিলে পড়ে যাবে। তাই আবার বলছি, সাবধান হও।' কিন্তু তিউদা তাই শুনে মুচকি হাসলো এবং যথারীতি মারিয়োর সঙ্গে বেরোতেও লাগলো।

কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেলো। তারপর একদিন অধ্যাপক আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'আচ্ছা গিয়োভানি, মেয়েটা তো সৎ—তাই না?' 'সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত, প্রফেসার,' বললাম। 'ও মূর্খ, কিন্তু সৎ।' 'হয়তো তাই,' অধ্যাপক অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললেন, 'কিন্তু আমার পাঁচখানা দামী বই উধাও হয়ে গেছে। ...আমি চাই না...'

আমি তক্ষুনি প্রতিবাদ করে বললাম, তিউদা কিছুতেই তেমন কাজ করতে পারে না এবং আমি নিশ্চিত যে বইগুলো তিনি আবার খুঁজে পাবেন। কিন্তু স্বীকার করতেই হয়, আমি নিজেও খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম এবং ঠিক করলাম, এবার থেকে চোখ দুটো খোলা রাখবো। এর সামান্য কিছুদিন পরেই একদিন সন্ধ্যা বেলায় দেখলাম, তিউদা মারিয়োর সঙ্গে লিফটে উঠছে। মারিয়ো বললো, সিনোরার কথা শোনার জন্যে তাকে চার তলায় যেতে হবে—যেটা ডাহা মিথ্যে কথা, কারণ এক ঘণ্টারও আগে সিনোরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন এবং মারিয়ো তা জানে। আমি ওদের উঠতে দিলাম এবং তারপর নিজেও লিফটে চেপে সোজা অধ্যাপকের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। দরজাটা ওরা হাট করে খুলে রেখেছিলো, তাই আমিও ভেতরে ঢুকে পড়লাম। বারান্দা ধরে এগুতে এগুতে শুনতে পেলাম, পড়ার ঘরে ওরা দুটোতে কথাবার্তা বলছে। বুঝলাম, আমি ভুল করিনি। খুব আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে আমি দরজা দিয়ে ভেতরের দিকে তাকালাম এবং তাতে কি দেখলাম? দেখলাম, বইয়ের আলমারির পাশে হেলিয়ে রাখা একটা কুর্সির ওপরে উঠে, মারিয়ো ছাদের খুব কাছাকাছি জায়গায় রাখা এক সারি বইয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে। আর তিউদা, লাল গালওয়ালা সেই পুণ্যবতী নারী, কুর্সিটা ধরে রেখে বলছে, 'ওই যে ওইটে...ওই বড়টা...চামড়ায় বাঁধানো সুন্দর বড়টা।'

আমি তখন দরজার বাইরে পেছিয়ে এসে বললাম, 'বাঃ তিউদা, চমৎকার! দুজনে মিলে কাজটা ভালোই করছো।...এবারে আমি তোমাদের

ধরে ফেলেছি।···প্রফেসার এ ব্যাপারটা আমাকে আগেই বলেছিলেন, কিন্তু আমি তার কথা বিশ্বাস করিনি।···সত্যিই, চমৎকার কাজ করেছো!'

জানলা দিয়ে গায়ে এক বালতি জল ঢেলে দেওয়া কোন বেড়ালকে কোনদিন দেখেছেন কি? আমার গলার স্বর শুনে মারিয়ো ঠিক তেমনিভাবে এক লাফে নেমে, তিউদাকে আমার কাছে একা ফেলে রেখে, এক দৌড়ে পালিয়ে গেলো। আমি তখন তিউদাকে এমন কথা শোনালাম, যাতে অধিকাংশ মেয়েই অন্তত কান্নায় ভেঙে পড়তো। কিন্তু মোটেই তা নয়—সিয়োসিয়ারোর মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা, সম্পূর্ণ আলাদা। কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে ও আমার কথা শুনলো। তারপর খটখটে শুকনো চোখ দুটো তুলে বললো, 'কে ওঁর জিনিস চুরি করেছে? বাজার করার পরে যে পয়সাটা বাকি থাকে, আমি সব সময় তার সবটাই ওঁকে ফেরত দিয়ে দিই। অন্য রাঁধুনীরা সব জিনিসের দ্বিগুণ করে দাম ধরে, আমি কক্ষনো তাদের মতো করি নে।'

'হতভাগী মেয়ে, তুমি ওঁর বইগুলো চুরি করছিলে না? সেটাকে চুরি করা বলে না?'

'কিন্তু ওঁর তো এতো গাদাগুচ্ছের বই আছে—'

'গাদাগুচ্ছের থাক বা অল্পস্বল্পই থাক, তুমি তা ছোঁবে না।·· আর এবারে মনে রেখো, ফের যদি তোমাকে ধরতে পারি, তাহলে সোজা দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবো।'

ও যে চুরির অপরাধে অপরাধী, সে কথা তখন একগুঁয়ের মতো ও মুহূর্তের জন্যেও মেনে নিতে রাজী হয়নি। কিন্তু অল্প কয়েক দিন পরেই বগলের তলায় এক বাণ্ডিল বই নিয়ে এসে বললো, 'এই যে, প্রফেসারের বইগুলো···আমি এগুলোকে ফের নিয়ে এসেছি, যাতে এখন ওঁর আর নালিশ করার মতো কিছু না থাকে।'

আমি বললাম, ও ঠিক কাজটাই করেছে আর নিজের মনেই ভাবলাম যে, শত হলেও তিউদা মেয়েটা সত্যিই ভালো—দোষ সবই ছিলো

মারিয়োর। ওর সঙ্গে লিফটে চেপে ওপরে গিয়ে, আমি বইগুলোকে যথাযথ জায়গায় রেখে দিতে ওকে সাহায্য করার জন্যে প্রফেসারের ফ্ল্যাটে গিয়ে ঢুকলাম। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন আমরা বাণ্ডিলগুলো খুলছি তখনই অধ্যাপকও সেখানে এসে হাজির হলেন।

বললাম, 'প্রফেসার, এই যে আপনার বই—তিউদা এগুলোকে আবার ফিরিয়ে এনেছে। ও ওর এক বন্ধুকে ছবি দেখার জন্যে বইগুলো ধার দিয়েছিলো।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে···ও ব্যাপারে আমরা কোন কথা তুলবো না।'

গায়ে ওভারকোট আর মাথায় টুপি নিয়েই উনি বইগুলোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর একটা বই খুলেই আর্তনাদ করে উঠলেন, 'কিন্তু এগুলো তো আমার বই নয়!'

'তার মানে?'

'আমার গুলো ছিলো প্রত্নতত্ত্বের বই,' উত্তেজিতভাবে আর একখানা বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে অধ্যাপক বলে চললেন, 'আর এগুলো তো পাঁচ খণ্ড আইনের বই!'

'তুমি কি করেছো, দয়া করে আমাদের বলবে?' তিউদাকে আমি জিগেস করলাম।

এতে তিউদা একেবারে তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলো, 'আমি পাঁচটা বই নিয়েছিলাম, পাঁচটা বই-ই ফিরিয়ে এনেছি। তাহলে আর গণ্ডগোলটা কিসের?···এ জন্যে ওদের আমি অনেক টাকা দিয়েছি··· আমি বিক্কিরি করার সময় ওরা আমাকে যত টাকা দিয়েছিলো, তার চাইতেও বেশি।'

অধ্যাপক এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, কোন কথা না বলে উনি হাঁ করে আমার আর তিউদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'একটু শুধু তাকিয়ে দেখুন,' তিউদা বলতে লাগলো, 'এগুলোর বাঁধাই ঠিক ওগুলোর মতোই···বরং ওগুলোর চাইতেও ভালো। তাকিয়ে দেখুন

না···ওজনও ঠিক একই রকমের। আমি এগুলো ওজন করে দেখেছি··· সাড়ে চার কিলো হয়েছে—ঠিক আপনার গুলোর মতো।'

এ কথায় অধ্যাপক হাসতে শুরু করলেন, কিন্তু খানিকটা তিক্ত ধরনের হাসি। বললেন, 'বাছুরের মাংসের মতো বই ওজন দরে বিকোয় না। প্রত্যেকটা বই অন্যটার চাইতে আলাদা।···এ বইগুলো দিয়ে আমি কি করবো?···দেখতে পাচ্ছো না? প্রত্যেক বইয়ের বিষয়বস্তু আলাদা ···ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লেখা।'

কিন্তু তিউদাকে তা বোঝানো অসম্ভব। একগুঁয়ের মতো বারবার ও বলে চললো, 'পাঁচটা ছিল, এখনও পাঁচটাই আছে।···সেগুলো বাঁধাই করা ছিলো, এগুলোও বাঁধাই করা।···আমি শুধু এটুকুই জানি।'

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অধ্যাপক তখন এই বলে ওকে রান্নাঘরে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন, 'যাও, গিয়ে তোমার রান্নাবান্না করো গে···যথেষ্ট হয়েছে।···আমি আর বিরক্ত হতে চাই না।' তারপর ও চলে যেতে আমাকে বললেন, 'আমি দুঃখিত···মেয়েটা ভালো, কিন্তু সত্যিই ও বড় বেশি গাঁইয়া।'

'আপনিই তো ওকে চেয়েছিলেন, প্রফেসার!'

'হ্যাঁ, দোষ আমার, উনি বললেন।'

তিউদা অধ্যাপকের কাছেই রইলো এবং সেই সঙ্গে অন্য একটা কাজও খুঁজতে লাগলো। তারপর কোন একটা অঞ্চলে একটা দুধের পানশালায় ধোয়া-মোছা করার কাজ পেয়ে গেলো। মাঝে-মধ্যে ও আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দরোয়ানের ঘরে আসে। বইয়ের প্রসঙ্গটা কখনই তোলা হয় না। কিন্তু ও আমাকে বলে, ও লিখতে পড়তে শিখছে।

স্বামীর সামনে আমি দাঁড়িয়েছিলাম—সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়। এই মাত্র আমরা বিছানা ছেড়ে উঠেছি। আমার স্বামী বিছানার ধারে বসে জামার গলায় টাই বাঁধছে। হঠাৎ ও প্রশ্ন করলো, 'ওটা কিসের দাগ?'

সহজাত প্রবৃত্তিবশেই আমি চোখ নামিয়ে নিজের শরীরের দিকে তাকালাম। কারণ ওর চোখের দৃষ্টি আমার দিকে—আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, আমার পেটের দিকে। কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। জিগেস করলাম, 'কোন্ দাগ?'

আমার স্বামীটি ধীরস্থির, চিন্তাশীল এবং কোনদিনই সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রশ্নের জবাব দেয় না—অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে, যেন সঠিক জবাবটা খুঁজে পাচ্ছে না। কাজেই এখনও চারুকলা শিক্ষার স্কুলে ছাত্রদের জন্যে বিশেষ ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো মডেলের মতো ও আমাকে ঘরের মাঝখানে ঋজু ও নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখলো। শেষ পর্যন্ত বললো, 'দাগটা ওখানে, দেয়ালের গায়ে।'

সহসা আমার মনে পড়লো, কোন এক কালে আমি যদি ওর সামনে এখনকার মতো এমনিভাবে কিছু না পরে দাঁড়াতাম, আর ও যদি এখনকার মতো এমনি একটানা একমনে তাকিয়ে থাকতো আমার দিকে—তাহলে শেষটায় ও আবেগ আর উত্তেজনার কাছে হেরে যেতো, ভুলে যেতো তাৎক্ষণিক কোন্ কারণে ও আমার দিকে তাকিয়েছিলো। কিন্তু এখন আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম, ও এতটুকুও উত্তেজিত হয়-নি। ওর চোখ দুটো সতর্ক কিন্তু সম্পূর্ণ শান্ত—যেন স্বচ্ছ উদাসীনতার ছোট্ট দুটি অন্ধকার হ্রদ।

'দাগটা রেডিয়েটারের কাছে,' ফের বললো ও।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। সত্যিই একটা দাগ রয়েছে ওখানে—ঠিক

দেয়ালটার গায়ে, তাপসঞ্চালক যন্ত্রটার কাছে। কিন্তু আমার শরীরটা ওর চোখ থেকে দেয়ালের দাগটাকে আড়াল করে রেখেছে, কাজেই সেটা ও দেখলো কি করে? দাগটা আঁকাবাঁকা, একটা বিচিত্র আকৃতির, অনেকটা উত্তর আমেরিকার মতো। 'হ্যাঁ, একটা দাগ রয়েছে বটে,' বললাম। 'কিন্তু ওটা কিসের?'

কথাটা বলে আমি তাপসঞ্চালক যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেলাম, দাগটা পরীক্ষা করার ভান করলাম, তারপর দেয়ালটার পাশ ঘেঁষে এমনভাবে ঘুরে দাঁড়ালাম যাতে দাগটা প্রায় সম্পূর্ণভাবে আড়াল হয়ে যায়।

'ড্যাম্পের দাগ,' ও মন্তব্য করলো।

তখনও দেয়ালের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমি রসিকতা করার ভঙ্গিতে বললাম, 'ওটার একটা বিশেষ আকৃতি রয়েছে। দেখি, তুমি সত্যি সত্যি লক্ষ্য করতে পারো কি না। বলো তো, দাগটা দেখতে কিসের মতো?'

টাই বাঁধা শেষ করে ও আবার দাগটার দিকে তাকালো—তার মানে, আমার দেহের ভেতর দিয়ে তাকালো—তারপর বললো, 'তুমি ঠিকই বলেছো। ওটার একটা অদ্ভুত আকৃতি রয়েছে। দেখতে উত্তর আমেরিকার মতো লাগছে।'

যুক্তিসম্মত কারণেই আমি বললাম, 'তুমি আমাকে আর ভালবাসো না।'

'এ কথা বলছো কেন?'

আমার বলা উচিত ছিলো, 'কারণ তোমার কাছে আমি স্বচ্ছ, অদৃশ্য হয়ে উঠেছি। তুমি আমার ভেতর দিয়ে ছাখো, যেন আমি কাচ দিয়ে তৈরি, যেন আমি আদৌ তোমার সামনে নেই।' কিন্তু আমার সে কথা বলার সাহস ছিলো না। তাই কোমরে হাত রেখে নীরব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হতে লাগলো, আমি যেন তুটো হাতল লাগানো সরু গলার একটা লম্বা কাচের বয়ম। মানুষটা আমার এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে গায়ে কোটটা চড়িয়ে বললো, 'আমার দেরী হয়ে গেছে—আমি চললাম।'

একা একা চিন্তা করতে করতে আমি আস্তে-সুস্থে পোশাক পরে নিলাম। এটা স্পষ্ট যে, ওর কাছে আমি অদৃশ্য। নাকি সকলের কাছেই? ঝিকে ডেকে, আমি আবার দাগটার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'গিয়োভানা, এখানে যে এই দাগটা, এটা কিসের?'

'কোন্ দাগ, সিনোরা?'

'এই যে, এই দাগটা—রেডিয়েটারের পাশে।'

'কিন্তু সিনোরা, আপনি তো মাঝখানটাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি দেখবো কি করে?'

আমি সামান্য সরে গেলাম।

'ও মা, তাই তো! একটা বিরাট দাগ দেখছি যে!' ঝি বললো, 'আমি তো বুঝে উঠতে পাচ্ছি না, এটা কি হতে পারে?'

ওই একই দিনে, আমরা তখন টেবিলের পাশে বসে ছিলাম। আমার স্বামী বসেছিলো আমার ঠিক উলটো দিকে। তার পেছনেই দেয়ালে ঝোলানো নয়া শিল্পরীতির একটা আয়না, আয়নার কাঠের ফ্রেমটার সর্বত্র ফুলের ডাঁটি আর পাপড়ি। ডানদিকে সামান্য একটু সরলেই আমি আয়নাটাতে নিজেকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছিলো—ভারি সুন্দর। ওই দিন আমি স্বামীকে খুশি করবার জন্যে সেজেছিলাম। ব্রাসিয়ার পরিনি, গায়ে শুধু ঢিলেঢালা একটা নরম সোয়েটার, গলার কাছটা 'ভি'এর মতো গভীর করে কাটা। আমি জানতাম, এমনধারা পোশাক একদিন ওর কাছে দুর্নিবার ছিলো।... আমার স্বামীর বোনঝি, গিলবার্তা, ঠিক তখনই ভেতরে এসে ঢুকলো। গিলবার্তা সতেরো বছরের তরুণী, বুকের দিকটা ছিপছিপে কিন্তু পা দুটো বড়সড়—দিন পনেরো ধরে ও আমাদের এখানে অতিথি। গিলবার্তা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এসে বসলো না, আমার পেছনে টেবিলটার কাছে দাঁড়িয়ে ড্রপার দিয়ে গ্লাসের মধ্যে কি একটা ওষুধ ঢালতে লাগলো। ...আমার স্বামী একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো। কিন্তু আমি ষোল আনা নিখুঁতভাবে অনুভব করছিলাম, ওর দৃষ্টি আমার বুক ভেদ

করে চলে যাচ্ছে—তীক্ষ্ণ তলোয়ারের মতো ওর চোখ দুটো আমার পেছন দিকের কোন বস্তুর সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত সত্যিই ও আস্তে আস্তে বললো, 'গিলবার্তো, তোমার কি মনে হয় না, ওই মিনি স্কার্টটা একটু বেশি রকমের বাড়াবাড়ি হয়েছে?'

গিলবার্তো তক্ষুনি কোন জবাব দিলো না। আমার পেছনে তখনও ও ওষুধের কৌটাগুলো গুনে চলেছে, 'আট নয় দশ এগারো বারো।' তারপর প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, 'কিন্তু মামুসোনা, বাড়াবাড়ি বলছো কেন?'

আমার স্বামীটি আমার শরীরের ভেতর দিয়েই তাকিয়ে রইলো। গিলবার্তোও নড়াচড়া করছিলো না, হয়তো ছোট ছোট চুমুকে ওর ওষুধটা খেয়ে নিচ্ছিলো। ওদের কথাবার্তা ক্রমশ দীর্ঘায়িত হয়ে উঠলো। আমার স্বামীটি মিনি স্কার্টের ঝুল, জুতো—যেগুলো মেয়েরা মিনিস্কার্টের সঙ্গে পরে, এবং ওই জাতীয় অন্যান্য জিনিসের সম্পর্কে আরও কিছু কিছু মন্তব্য করলো। এদিকে আমার নিজেকে অদৃশ্য, স্বচ্ছ বলে মনে হচ্ছিলো। ভাবছিলাম, টেবিল থেকে আমার উঠে চলে যাওয়া উচিত কিনা। কিন্তু আমি জানতাম, আমার স্বামী ঠিক সেটাই চাইছে। তাই ঋজু এবং স্থাণু হয়েই বসে রইলাম। আয়না দিয়েও আর নিজের দিকে তাকাচ্ছিলাম না—কারণ আমার প্রায় এই আশঙ্কাই হচ্ছিলো যে, তা হলে আমিও হয়তো কিছুই দেখতে পাবো না।

পরের দিন, রোববার আমার স্বামী, গিলবার্তো আর আমি আমাদের এক বন্ধুর জমিদারিতে—যেখানে প্রচুর পরিমাণে পায়রা আর তিতির পাওয়া যায়—শিকারে যাবো বলে ঠিক করলাম। তিনজনে মিলে যখন আমাদের বাড়ির বাগানে বেরিয়ে এলাম, তখন গিলবার্তো আর আমার স্বামী গাড়িতে উঠে বসলো···আমি সদর দরজাটা খুলে দিতে গেলাম। গাড়ি নিয়ে বেরুবার সময় প্রতিবার আমিই এ কাজটা করে থাকি —আমার স্বামী চালকের আসনে বসে আর আমি গিয়ে বাইরে বেরুবার দরজাটা খুলে দিই। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে গিলবার্তো ওর

পাশে বসে রয়েছে বলে আমি একটা বিশ্রী যন্ত্রণাদায়ক বেদনা অনুভব করলাম। ওরা বসে বসে গাড়ির সামনের কাচটার ভেতর দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছিলো। আমি শ্বাসরোধকর এক বিভ্রান্ত অবস্থায় দরজার ভারি লোহার পাল্লা দুটোকে ঠেলতে শুরু করলাম। ওদের দিকে না তাকিয়ে, কিংবা বলা যায় ওদের দিকে না তাকাবার ভান করে, কিন্তু আসলে ওদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে—কাজটা আমি সেরেও ফেললাম। হয়তো ওরা নিজেদের এই ভেবে ছলনা করছিলো যে, কাচের জেল্লার জন্যে বাইরে থেকে ওদের দেখা যাবে না। কিন্তু আমি দেখলাম, ওরা দুজন দুজনের দিকে মাথা নামিয়ে এনে চকিত চুম্বনে পরস্পর পরস্পরের ঠোঁটে হালকা স্পর্শ বুলিয়ে নিলো। তারপরেই গাড়িটা হঠাৎ এক লাফে সামনের দিকে এগিয়ে এলো, আমি কোনমতে ঠিক সময়মতো এক-পাশে সরে গেলাম। আমার স্বামী আস্তে সুস্থে এটা-সেটা করে, শেষ অব্দি দিব্যি শান্ত গলায় বললো, 'গাড়িটায় কিছু একটা গোলমাল হয়েছে—হঠাৎ নিজে থেকেই চলতে শুরু করে।'

গাড়িতে উঠে আমি বিক্ষুব্ধ সুরে বললাম, 'তুমি আর একটু হলে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলে প্রায়!'

'কিন্তু আমি তো দেখলাম তুমি থামটার অত কাছাকাছি রয়েছো—ধাক্কা মারতাম কি করে?'

আমরা চলতে শুরু করলাম। সামনের আসনে ওরা দুজন, আমি পেছনে। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে আমরা জঙ্গলের দিকে বাঁক নিলাম, তারপর একটা ফাঁকা জায়গায় এসে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। আমার স্বামী আর গিলবার্তো, দুজনে পাশাপাশি খুব ঘন হয়ে হাঁটছিলো। প্রায় দু গজ পেছনে থেকে আমি ওদের অনুসরণ করতে লাগলাম। আমাদের তিনজনেরই পরনে শিকারের পোশাক—গায়ে চামড়ার জ্যাকেট. পায়ে জুতো আর সঙ্গে বন্দুক। জঙ্গলের মধ্যে গাছগুলো ইতস্তত ছড়ানো। তখন শরৎকাল, মাটির বুকে ঝরা পাতা বেছানো। গাছগুলো অধিকাংশই প্রাচীন, বিচ্ছিন্ন এবং মোটামুটি সব কটাই যেন মৃত্যুপথযাত্রী—শুধু

ডগার দিকে খানিকটা সবুজ লতার ফাঁস আর বাকি অংশের মধ্যে প্রায় নিষ্পত্র এক-একটা একক শাখা যেন হতাশায় হাত বাড়িয়ে রেখেছে সামনের দিকে। কালো রঙের পাখিগুলো মরা পাতার ওপরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিলো, ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে কুঁকড়ে ওঠা বড় বড় পোকাগুলোকে তুলে নিয়ে আবার উড়ে যাচ্ছিলো আকাশে। সূর্যটা লাল, আকাশ নীলাভ আর ধোঁয়াটে—যেন আগুন লেগেছে। আমার স্বামী আস্তে আস্তে হাঁটছিলো আর মাঝে মাঝে আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছিলো। দাঁড়াচ্ছিলো এমনভাবে, যাতে ওর শরীরটা গিলবার্তার শরীরের সঙ্গে ঘন হয়ে ছুঁয়ে থাকছিলো। গিলবার্তা এখন ওর পাশাপাশি নয়, ঠিক পেছন পেছন হাঁটছিলো। আমার স্বামীর এমন আচমকা থমকে দাঁড়ানোতে ও যেন প্রতিবারই অবাক হচ্ছিলো, কিন্তু কোনবারই সংস্পর্শ এড়াবার চেষ্টা করছিলো না। তাই প্রতিবারই ওর বুক আর পেট মুহূর্তের জন্যে আমার স্বামীর পেছনে ঘন হয়ে লেগে থাকছিলো।

এর সব কিছুই আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার মন তখন নিজের ইচ্ছেমতো চিন্তা করতে শুরু করলো—সত্যি কথা বলতে কি, তাকে আমি কিছুতেই সামলে রাখতে পারলাম না।…তাহলে আমার স্বামীর কাছে আমি অদৃশ্য। সত্যিই ও এমন হাবভাব করছিলো, যেন আমাকে দেখতে পাচ্ছে না—যেন আমি ওখানে নেই। কিন্তু একজন অদৃশ্য মানুষ এমন অনেক কাজই করতে পারে যা কোন দৃশ্যমান মানুষের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য নয়। যেমন, কোন মানুষ অদৃশ্যে থাকার সুযোগ নিয়ে বন্দুক তুলে কাউকে লক্ষ্য করে গুলি করতে পারে। কিন্তু সে এমন সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য যে কেউ তা বুঝতেই পারবে না। তাই অদৃশ্য হয়ে থাকার ব্যাপারটা, আমি ভাবতে লাগলাম, ঠিক দুধারে ধার থাকার মতো। অদৃশ্য মানুষের কিছু অসুবিধে অবশ্যই আছে, কিন্তু সুবিধেও আছে।

একটা গুলির শব্দ আশ্চর্য একটা চাপা প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে দিলো।

আমার দৃষ্টি গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটে যাওয়া কুকুরটাকে অনুসরণ করলো। কুকুরটার ঠিক পরেই গিলবার্তার হাত ধরে ছুটে গেলো আমার স্বামী। মুখে একটা রক্তমাখা পায়রা নিয়ে কুকুরটা ফিরে এলো। আমার স্বামী গিলবার্তার সঙ্গে নিচু হলো, কুকুরটার মাথার ওপরে একটা দ্রুত-চুম্বন বিনিময় করে নিলো ওরা। তারপরেই আমার স্বামী চিৎকার করে উঠলো, 'প্রথম পায়রা!'

আমি কিছুই বললাম না, সবাই মিলে জঙ্গলের মধ্যে এগুতে লাগলাম। আচমকা আমরা পুরোপুরি চৌকো একটা মাঠে এসে পড়লাম। মাঠে ঘন রঙের পুরু ঘাস, চারধারে ঈষৎ লালচে গভীর অরণ্য। আমি মনস্থির করে নিলাম—আমি অদৃশ্য, এই সেই জায়গা আর এটাই প্রকৃত সময়। চিৎকার করে আমি আমার স্বামীকে ডান দিকে তাকাতে বললাম, সেখানে চমৎকার একটা পায়রা বসে ছিলো। অনুগতভাবেই ও আর গিলবার্তা সে দিকে ফিরে তাকালো। ইতিমধ্যে ওর বাঁ দিকে দাঁড়ানো অবস্থায় আমি আমার বন্দুক তুলে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করলাম। বন্দুক আমি ভালোই ছুঁড়ি, লক্ষ্য ভেদ করতে ভুল করবো না।

কিন্তু পায়রাটা আচমকা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, একেবারে আমার সামনে দিয়ে উড়ে গেলো। পলকের মধ্যে আমার স্বামী ঘুরে দাঁড়ালো এবং লক্ষ্য স্থির না করেই গুলি চালালো। আমি কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম, আমার মুখ ঠাণ্ডা ঘন ঘাসের বুকে। দেখলাম আমার স্বামী আমার খুব কাছ দিয়ে এগিয়ে গেলো—এগিয়ে গেলো পায়রাটাকে কুড়িয়ে নিতে, যেটাকে সে আমার শরীরের ভেতর দিয়ে গুলি চালিয়ে মেরেছে। পলকের জন্যে আমি ওর জুতোজোড়া দেখতে পেলাম—হালকা রঙের ভিজে ওঠা জুতো, ফিতের ভাঁজে সামান্য কয়েকটা ঘাসের ফলা আটকে রয়েছে। কিন্তু ও আমাকে দেখতে পেলো না···আমি যেমনটি ছিলাম, এখন তার চাইতে অনেক বেশি অদৃশ্য।

এই বিশাল প্রান্তরে রক্তক্ষয় হতে হতে আমি মরে যাবো আর ওরা একা একা দুজনে মিলে শহরে ফিরে যাবে।

গাড়িটা ওকেই অনুসরণ করছে না কি অন্য কোন কারণে নেহাতই গতি শ্লথ করেছে, দেখার জন্যে দোকানটার সামনে থেমে দাঁড়ালো মেয়েটি। গাড়িটা ছোট্ট একটা কাদা-মাখা ফৌজি গাড়ি, চালকের আসনেএকাকী শুধু একজন অফিসার। দোকানের সামনে এসে গতি কমাতে কমাতে প্রায় থেমে গেলো গাড়িটা। মেয়েটি নিজেকেই শুধালো, আমন্ত্রণ পেলে ও তাতে রাজী হবে কি না এবং ঠিক করলো, হবে না। অন্তত টুপি আর পোশাকের ছোটাখাটো দোকানে ভর্তি এই রাস্তাটা, যেখানে ও সুপরিচিতা, সেখানে তো অবশ্যই না। গাড়ির দিকে পেছন ফিরে দোকানের জানলায় একটা রেশমী রুমালের দিকে তাকিয়ে রইলো ও—যে রুমালটার জন্যে ভীষণ লোভ হওয়াতে দিন কতক আগে ও সেটার দাম জেনে গিয়েছিলো। শব্দ শুনে বুঝলো, গাড়িটা ওর পেছনে শান-বাঁধানো পথের কিনারা ধরে এগিয়ে এসে সামনের দিকে চলে গেলো। লালসার বস্তুটির দিকে সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কাঁধ দুটো সামান্য ঝাঁকালো মেয়েটি, যেন বিদায় জানালো রেশমী রুমালটাকে। যে রুমালটা পাবার জন্যে ওর এত তীব্র আকাজ্ক্ষা অথচ অর্থের স্বল্পতার জন্যে যেটা ওর নাগালের এত বাইরে, সেটার দিকে তাকিয়ে এক ধরনের উদাসী এবং মুগ্ধ আনন্দ উপভোগ করার পর ওর মনটা আবার সেই গাড়িটার দিকে ফিরে গেল, যেটাকে ও এত অবজ্ঞা করে চলে যেতে দিয়েছে। অথচ ওই রুমালটার কথা মনে রেখেই ও অফিসারটিকে দু-তিনটি স্পষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি উপহার দিয়ে সাহস জুগিয়েছিল। তাছাড়া এই দিন ও মোটামুটি এমনি একটা উদ্দেশ্য নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলো যে, ও এমন একজনকে খুঁজে নেবে যে ওকে রুমালটা কিনে দিতে পারবে। উদ্দেশ্য এবং চরিত্রের এই বৈপরীত্য ওকে রাগিয়ে তুললো।

অন্তত একবারের জন্যে হলেও, কেন ও সত্যিকারের সঙ্গতিময় হয়ে নিচের পারে না ? এখন থেকে ও যখন এই পেশাটাকেই অবলম্বন করেছে, তখন কেন চিরদিনের মতো বিবেকের তাড়না আর আকস্মিক মর্যাদাবোধ বিসর্জন দেবার জন্যে মনস্থির করতে পারে না ?

দুঃখিত মনে মেয়েটি রুমালটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে এক পাশে জরিদার রেশমী পোশাক রাখা একটা জানলার আয়নায় মুহূর্তের জন্যে নিজের দিকে এক ঝলক তাকালো। বাতাস ওর দীর্ঘ চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিয়েছে, গুঁড়ো গুঁড়ো চুলগুলো উড়ে উড়ে পড়ছে ওর কপাল আর বড় করে খুলে রাখা হাসি-ছলছল চোখ দুটিতে। ঠাণ্ডার তীক্ষ্ণ কামড় আর অপরূপ শীতের দিন মেয়েটির মুখখানিকে কঠিন করে তুলেছে। প্রসাধনের রঙের নিচে মুখখানা ফ্যাকাশে ও রক্তহীন। অথচ সেই তুলনায় ঠোঁট দুটি আরক্ত এবং পুরুষ্টু। ওর মাথায় টুপি নেই, বাদামী রঙের কোটটার কলার ওলটানো, কোমরে শক্ত করে আঁটা কটি-বন্ধ। যাই হোক মেয়েটি ভাবলো, ওকে নিশ্চয়ই ওই বীভৎস মেয়েগুলোর মতো লাগছে না—যাদের ফৌজি লোকগুলোর হাতে হাত জড়িয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। আচমকা এক অপ্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলো ও—ভাবলো, আকস্মিকভাবে মিলে যাওয়া কোন আল-টপকা লোকের কাছে নিজেকে ও বিলিয়ে দেবে না। ভাবনাটাকে নিজের কাছে চরম ও অভঙ্গুর বলেই মনে হলো ওর এবং এই সিদ্ধান্তটা যেন ওর স্বাভাবিক বেপরোয়া মনোভাব ও অসার মানসিক প্রশান্তিকে ফিরিয়ে আনলো আবার। এইভাবে শান্ত হয়ে নিজেকে দেখার জন্যে ও আরও খানিকক্ষণ আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো, পরিপাটি করে নিলো অবাধ্য চুলগুলোকে।

রাস্তাটা একটা ঢালু জায়গায়—শহরের মুখোমুখি একটা চৌরঙ্গীর দিকে উঠে গেছে। চৌরঙ্গীর মাঝখানে ওপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে উঠে যাওয়া একটা চৌকো মিনার। আয়না থেকে চোখ সরিয়ে নিলো মেয়েটি। তারপর রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলো, গাড়িটা মিনারের

নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—যাতে ও কি করছে না করছে অফিসারটি সে দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে এবং ও যদি চৌরঙ্গীর দিকে না এগোয় তা হলে সে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ফের ওকে অনুসরণ করতে পারে। 'লোকটা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, আমাকে ও রুমালটা কিনে দেবে,' খুশি-ভরা হালকা মনে ভাবলো মেয়েটি—যেন যতক্ষণ ও আয়নার দিকে তাকিয়েছিলো, ততক্ষণ এ সুযোগটা বৃথা চলে যেতে দেবার জন্যে কষ্ট পাচ্ছিলো ওর মনটা। কোন কিছু চিন্তা না করে এগিয়ে গিয়ে দোকানের দরজাটা খুললো মেয়েটি, ওর পূর্ব-পরিচিতা দোকানী মহিলাকে ডেকে বললো, পরদিন সকাল পর্যন্ত রুমালটা যেন উনি আলাদা করে রেখে দেন। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললো মিনারটার দিকে।

কিন্তু এগিয়ে যাবার পথেই মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে নেওয়া সিদ্ধান্তটা আচমকা ওর মনে পড়ে যায়—ঠোঁট কামড়ে রাগত ভঙ্গিমায় মাথায় ঝাঁকুনি তোলে মেয়েটি। এই তাহলে ওর সিদ্ধান্তের দাম! নিজের প্রতি এক নিদারুণ বিরক্তি অনুভব করে ও, তবু পেছনে ফিরে যাবার কথা ভাবে না। ন্যায্যতা প্রমাণের জন্যে এই ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করে যে, তাতে কোন লাভ হতো না···লোকটা ওকে ঠিকই ধরে ফেলতো। কিন্তু ও ঠিক করলো, লোকটার দিকে না তাকিয়ে ও তার পাশ কাটিয়ে চলে যাবে এবং সে যদি ওর কাছে এসে আলাপ জমাতে চায় তাহলে এমনভাবে জবাব দেবে, যাতে ওর সম্ভ্রান্ততা সম্পর্কে কোন সন্দেহ না থাকে।

চৌরঙ্গীতে পৌঁছে ও গাড়ির সামনে দিয়ে চোখ নিচু করে সোজা পাঁচিলটার কাছে এগিয়ে গেলো—যেখান থেকে সমস্ত শহরটার দৃশ্য উপভোগ করা যায়। ও ভালো করেই জানতো, এখানে দাঁড়িয়ে এমন একটা সুপরিচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য মন দিয়ে দেখার অর্থ—অফিসারটিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ওর কাছে নিয়ে আসা। কিন্তু সব কিছু চিন্তা করে দেখলো, তাতে কোন দোষ নেই। কারণ আলাপিতা হওয়া, এমন কি কথার জবাব দেবার সঙ্গেও অন্য ব্যাপারগুলোর দুস্তর ব্যবধান।···

পাঁচিলের ওপরে কনুই রেখে, চুলে বিলি কাটতে কাটতে তাই নিচের দিকে তাকিয়ে রইলো ও।

ও যেমনটি ভেবেছিলো, অফিসারটি ঠিক তেমনি গাড়ি থেকে নেমে ওর পাশে এসে, পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। চোখের কোণ দিয়ে লোকটাকে লক্ষ্য করলো মেয়েটি। খুবই কম বয়েস, ওর চাইতেও কম। মুখটা লাল, গোলাকার, খানিকটা কর্কশ—হালকা নীল রঙের ছোট ছোট চোখ ছুটি গভীরে বসানো। ছুঁচলো স্তম্ভগুলোর ওপরে হাত রেখে এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে দূরের বাড়িগুলোর ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো মানুষটা—যেন এমনটি দেখবে বলে সে আশা করেনি। লোকটা ঘুরে তাকাতে পারে এবং চোখে চোখ পড়লে তার থেকে বাক বিনিময়সহ আলাপও হয়ে যেতে পারে ভেবে, বেহায়ার মতো তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মেয়েটি। কিন্তু অফিসারটি যেন মুখ ঘোরাবে কি না, সে বিষয়ে মনস্থির করে উঠতে পারছিলো না। ও যে নিজে থেকেই আলাপিতা হতে চায়ই সেটা এত পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে যতই সময় কাটতে লাগলো ততই নিজের ওপরে রেগে উঠতে লাগলো মেয়েটি। এ ধরনের সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্যায়টা সব সময়েই ওর স্নায়ুর ওপরে চাপ সৃষ্টি করে, আলাপ শুরুর সূচনায় পুরুষ মানুষটির কণ্ঠস্বর ক্ষিপ্ত করে তোলে ওকে। কিন্তু এবারে ও অনুভব করলো, এক্ষেত্রে ও যদি প্রথম পদক্ষেপটা না নেয় ত᠆ কোন দিনই কিছু হবে না। তাই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মানুষটার নৈর্ব্যক্তিক, নিস্তব্ধ মুখখানার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকালো ও, আচমকা জিজ্ঞেস করে বসলো, 'দিনটা চমৎকার, তাই না?'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো অফিসারটি, গভীর প্রত্যয়ে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, চমৎকার।'

কোমল আর অমায়িক কণ্ঠস্বর লোকটার। তারপর আবার নৈঃশব্দ্য। 'আমি আর ওর সঙ্গে কথা বলবো না,' বিরক্তি দেখানো মুখ করে ভাবলো মেয়েটি। 'আর একটা মিনিট এখানে থাকবো, তারপর চলে যাবো।'

স্পষ্টতই অফিসারটি নিজের সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলার জন্যে লড়াই করছিলো। অবশেষে যথারীতি এ সব ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, গাড়িটার দিকে দেখিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা কি গাড়িতে উঠবো?'

আমন্ত্রণ পেয়ে মেয়েটির মনে হলো, ওর পা দুটো যেন নিজেদের ইচ্ছেতেই গাড়িটার দিকে এগিয়ে যাবে। রাগ বেড়ে উঠলো ওর।

'কেন?' লোকটার দিকে তাকিয়ে অপ্রীতিকর হাসি ছড়ালো ও।

'যাতে আমরা একত্র হতে পারি,' অফিসারটি খোলাখুলি জবাব দিলো।

'কিন্তু আমরা একত্র হবো কেন?'

মেয়েটি অনুভব করলো, রাস্তায় সন্দেহজনক মতলবে কোন অপরিচিত লোক কোন মহিলার গতিরোধ করলে মহিলাটি যেমন করে স্থির প্রত্যয়ে লোকটার ভুল বুঝিয়ে দেন, ওরও তেমনি করা উচিত।

যুবকটিকে অপ্রতিভ দেখাচ্ছিলো। বললো, 'কথা বলার জন্যে।' তারপর বুদ্ধি করে জুড়ে দিলো, 'আমরা কোন কাফেতেও যেতে পারি।'

'কিন্তু আমি কখনও কাফেটাফেতে যাই না।'

'কেন?'

'কারণ,' আভিজাত্যের হাসির সঙ্গে জোর দিয়ে দিয়ে মেয়েটি উচ্চারণ করলো, 'কাফেটাফেতে যাওয়া আমার অভ্যেস নয়—স্রেফ তাই।'

'ও,' অফিসারটি বললো, যেন ওই কথাগুলোতেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। তারপর আবার গাড়িটার দিকে দেখিয়ে বললো, 'তাহলে গাড়িতে চেপে একটু ঘুরে আসা যাক।'

'কিন্তু যে সব মানুষদের আমি চিনি না, তাদের সঙ্গে গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়ানোও আমার অভ্যেস নয়।'

মেয়েটি দেখলো, লোকটার চুলের গোড়া অব্দি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

'আমার নাম ক্রস,' লোকটা বললো, 'গিলবার্ট ক্রস···আর আপনার নাম ?'

'আপনার কাছে আমার কোন নাম নেই,' জবাবে নিজেকে গুটিয়ে নিলো মেয়েটি।

তারপর মুহূর্তের নীরবতা।

অফিসারটি আবার চেষ্টা চালাতে শুরু করলো, 'আপনি আমার সম্পর্কে আজেবাজে ভাবছেন। কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমি কি চাই, তা আপনি জানেন না।'

'ভালো করেই জানি,' মেয়েটি ফুঁসে উঠলো। 'কয়েক ঘণ্টা ফুর্তি লোটার জন্যে আপনি আমাকে মজুরী দিতে চান, তাই নয় কি ?'

মেয়েটি লক্ষ্য করলো, কোন জবাব না দিয়ে লোকটা আবার লাল হয়ে উঠেছে। হুল ফোটানোর সুরে ও বলে চললো, 'আপনি আমাকে কত দিতে চান, তাও জানি।···দুই বা তিন হাজার লিরা, কিংবা হয়তো আরও বেশি। ঠিক বলিনি ?'

অফিসারটি রসিকতা করার চেষ্টা করলো, 'দরটা আপনি যখন এত ভালো করেই জানেন···'

'জানি বৈকি।···হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আপনার বন্ধুবান্ধবরা, মানে ফৌজি লোকেরা কিন্তু সাধারণত আপনার চাইতে বেশি চালু হয়—অত ভণিতা না করে, চট্ করে দরটা বলে দেয়।'

'আমার সঙ্গী-সাথীরা আমার মতো লাজুক নয়।'

'হ্যাঁ, তারপর···' মেয়েটি বলতে থাকে, 'আপনি আমাকে দু-এক প্যাকেট সিগারেট দিতে চাইবেন।'

'ওঃ, সিগারেট···হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—' অফিসারটি মৃদু হাসার চেষ্টা করে।

'আর চাইলে, কয়েক টিন খাবারও দেবেন হয়তো ?'

মেয়েটি দেখলো, লোকটা মাথা নেড়ে নেড়ে মৃদু হাসি হেসে চলেছে। তারপর একটা হাত এগিয়ে দিয়ে খানিকটা চেষ্টা করে বললো, 'আমি

দেখছি ভুল করেছিলাম।...দয়া করে মাফ করে দেবেন।'

মেয়েটি দেখলো, লোকটা বিদায় নিতে চলেছে। ও যে ধরনের মেয়ে নয়, লোকটা ওকে সেই ধরনের মেয়ে বলেই ধরে নিয়েছে এবং এত রাজ্যের ঝামেলার পর ও আবার সেই একা হতে চলেছে—ভেবে প্রায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলো মেয়েটি। ওর বোকামো আর বিরক্তি উধাও হয়ে গেলো তখনই।

'না,' মেয়েটি এত দ্রুত বলে উঠলো যে কথাটা ওর নিজের কাছেই হাস্যকর শোনালো। 'না, আপনি ভুল করেননি।'

'ভুল করিনি?'

'আমি তাই বলেছি,' মেয়েটি অধৈর্য হয়ে বললো। দেখলো, লোকটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে—কিন্তু এবারে সেটা আর বিব্রত হবার জন্যে হয়েছে বলে মনে হলো না।

'তাহলে কি আমরা যাবো?'

'চলুন।'

ওরা গাড়িটার কাছে এগিয়ে গেলো। অফিসারটি ওকে উঠতে সাহায্য করে, এক লাফে ওর পাশে উঠে বসে গাড়ি চালিয়ে দিলো।

'কোথায়?'

'আমি যেখানে থাকি,' মেয়েটি সহজ করে বললো। 'আমি পথ দেখিয়ে দেবো।'

চৌকো মিনারটাকে পাক দিয়ে গাছপালার নিচু শাখাপ্রশাখার তলা দিয়ে ওরা দ্রুত বাগানের দিকে এগিয়ে চললো। দিনটা সত্যিই সুন্দর, যতদূর চোখ যায় রাস্তাগুলো পথচারীদের ভিড়ে ভর্তি। কাদামাখা ফৌজি গাড়ি হলেও সমস্ত পথচারীদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে অহেতুক আত্মশ্লাঘার অনুভূতি চেপে রাখতে পারছিলো না মেয়েটি। ও যখন রাজী হবে বলেই মনস্থির করে ফেলেছিলো, তখন কেন যে অফিসারটির সঙ্গে অমন খারাপ ব্যবহার করলো—এখন সে কথাই ভাবছিলো ও। রাগও হচ্ছিলো, আবার যেটা ওর করা উচিত

হয়নি সেটাই করেছে বলে অস্পষ্টভাবে খুশীও হচ্ছিলো একই সঙ্গে।

অফিসারটি ভদ্রভাবে মেয়েটির নির্দেশ অনুসরণ করে বাগানের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এসে, তুধারে গাছ-বসানো একটা চওড়া রাস্তা ধরে এগুতে লাগলো। গাড়ির গতি এবং তুরন্ত হাওয়ায় মেয়েটির এলোমেলো চুল দেখে বাসনার তাগিদ অনুভব করছিলো সে—যা শীগ্রিই মিটবে বলে এখন সে নিশ্চিত। ওদিকে লজ্জা এবং আদিম পরিতৃপ্তি—তুই-ই অনুভব করছিলো মেয়েটি।…ওরা একটা দারিদ্র্য পীড়িত অঞ্চলে এসে পৌঁছেছিলো, রিক্ত প্লেন গাছগুলোর দীর্ঘ শাখার আড়ালে এখানে শুধু ভীড়াক্রান্ত মলিন জানলার সারি।

'এ দিকে,' পাশের একটা রাস্তার দিকে দেখালো মেয়েটি।

ট্রাম লাইনের ওপর দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে মোড় ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট রাস্তায় গাড়ি ঢোকালো অফিসারটি।

'এ দিক দিয়ে…ডাইনে…বাঁয়ে,' মলিন রাস্তাগুলোর মোড়ে মোড়ে নির্দেশ দিতে লাগলো মেয়েটি, অফিসারটিও মন দিয়ে প্রতিটি নতুন নির্দেশ মেনে নিয়ে গাড়ির পথ পালটে নিতে লাগলো। 'এই যে, এসে গেছি,' অবশেষে বললো মেয়েটি এবং গাড়িটাও থেমে দাঁড়ালো।

ওদের মুখোমুখি লতায় ছাওয়া একটা দরজা। বাগানটাতে গাছ-গাছালির ভিড় যেন বড্ড বেশি। সরু একটা পথ ম্যাটমেটে বাদামী রঙের বাড়িটার দিকে চলে গেছে। বাড়িটাকে নেহাতই ছোট্ট আর সাধারণ বলে মনে হয়…সামনের দিকে চারটে জানলা।

'ইচ্ছে হলে গাড়িটা আপনি বাগানেই রাখতে পারেন।'

ঘাড় নেড়ে ফের গাড়ি চালু করলো অফিসারটি। মেয়েটি দরজার একটা পাল্লা খুলে, খানিকটা চেষ্টা করে অন্য পাল্লাটাও খুলে ফেললো। ভাবলো, 'আমার ইচ্ছে, গাড়িটা ও বাগানেই রাখুক। কারণ গাড়িটা বাইরে থাকবে ভাবতেও আমার সত্যি কেমন যেন লজ্জা আর অস্বস্তি হচ্ছে।' দরজার সামনে উঁচু বারান্দাটার এক পাশে একটা শান-বাঁধানো জায়গা, তাতে অনায়াসে একটা গাড়ি রাখা যায়। কিন্তু অন্য

দিকে, রাস্তার কাছে, বাড়ির দেয়াল আর পাঁচিলের মাঝখানে প্রাচীন আইভিতে ছাওয়া এক ফালি সবুজ জমি আর তার নিচের দিকে সরু তারের জাল দেওয়া ছোট্ট একটা খুপরি। মেয়েটি এখানে তিনটে মুরগী আর একটা মোরগ রাখে। অফিসারটি যতক্ষণে গাড়িটা সীমায়িত জায়গাটাতে রাখবে, ততক্ষণ সময় কাটাবার জন্যে ওই খুপরিটা একবার দেখতে গেলো মেয়েটি। মোরগটা হলদেটে সাদা রঙের, মাথায় লাল রঙের ঝুঁটি। মুরগীগুলো কালো—ঝরা পাতা আর ছোটখাটো ঝোপ-গুলোর ভেতর থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া শক্ত। 'আমি দরজার সামনে এমন করে চাকরবাকরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না,' ভাবলো মেয়েটি। 'তার চাইতে বরং মুরগীগুলোকে খেতে দিই। লোকটা এসে আমাকে অমন ঘরোয়াভাবে দেখলে, আমার সম্পর্কে ওর একটা ভালো ধারণা হবে।' অফিসারটিকে সময় দেবার জন্যে খাবারের পাত্রটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে দানাগুলো ছড়াতে শুরু করলো ও। শব্দ শুনে বুঝলো, গাড়িটা গর্জন তুলে ভেতরে ঢুকে আচমকা থেমে গেলো। তবু ফিরে তাকালো না মেয়েটি। মুরগী তিনটে লোভীর মতো খুঁটে খুঁটে দানা খাচ্ছিলো। ও ভাবলো, পরনে সুন্দর পোশাক, হাতে খাবারের পাত্র, পায়ের কাছে মুরগী—ওকে নিশ্চয়ই একটা সুন্দর ছবির মতো লাগছে। দরজা বন্ধ করার মৃদু আওয়াজ পেয়েও দানা ছড়াতে লাগলো ও। মোরগটাকে ক্ষুধার্ত বলে মনে হচ্ছিলো না, এক পাশে দাঁড়িয়ে মাঝে-মাঝেই শুধু ঠোঁট দিয়ে পায়ের পেছন দিকটা খুঁটছিলো। খুপরিটাতে ঢুকে মেয়েটির কাছে এগিয়ে এলো লোকটা, 'দরজাটা আমি বন্ধ করে দিয়ে এসেছি।'

'মুরগী আপনার ভালো লাগে?' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো মেয়েটি।

'সত্যি কথা বলতে কি, পছন্দ করি না,' মৃদু হেসে জবাব দিলো লোকটা।

'মুরগী ডিম পাড়ে,' আকর্ষণীয় এবং গভীর অর্থবহভাবে বললো

মেয়েটি। যেন বোঝাতে চাইলো, 'আমি গরীব। আজকালকার দিনে যে সব মুরগী ডিম পাড়ে, সেগুলোর দাম আছে।'

মোরগটা এক পাশে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো—আচমকা যেন অন্যমনস্কভাবেই সেটা এগিয়ে এসে, ফুলে ফেঁপে থাকা বিশেষ একটা গম্ভীর ধরনের মুরগীর পিঠে লাফিয়ে উঠলো। মুরগীটা উবু হয়ে বসে রইলো, ছাড়া পাবার কোন চেষ্টাই করলো না। মোরগটা ঠোঁট দিয়ে হিংস্রভাবে মুরগীটার ঝুঁটি চেপে ধরলো, খানিকটা ছটফট করলো মুরগী-টার পিঠের ওপরে বসে। তারপর নেমে এসে ব্যস্তভাবে শেষ দানাগুলো খুঁটে খেতে শুরু করলো। মুরগীটা তখন ডানায় ঝাঁকুনি তুলে পালক-গুলো ঝেড়ে নিলো, তারপর আগের চাইতে আরও গম্ভীর আর অহঙ্কারী ভঙ্গিমায় মোরগটার পাশাপাশি গিয়ে দানা খুঁটতে শুরু করলো।

'ওরা ভালবাসাবাসিও করে,' লাজুক হাসি ছাড়লো অফিসারটি।

মন্তব্যটা বদ রুচির পরিচয় বলে মনে হলো মেয়েটির, কোন জবাব দিলো না ও। এক মুহূর্ত পরে খানিকটা উদাসীভাবে জিজ্ঞেস করলো, 'এবারে আমরা যাবো কি?'

মুরগীর ঘর থেকে বেরিয়ে, পাঁচিলের পাশ দিয়ে ভেতরে যাবার দর-জার দিকে এগুলো ওরা। কাদা-মাখা গাড়িটা দাঁড়িয়ে রইলো বারান্দার সামনে।

'আপনি কি সীমান্ত থেকে আসছেন?' গাড়িটা দেখিয়ে প্রশ্ন করলো মেয়েটি।

'হ্যাঁ।'

'সেখানে কি লড়াই চলছে?' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাসি মুখে জানতে চাইলো ও, কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই অখুশী হলো। অথচ কেন—তা ও জানে না।

'হ্যাঁ, ওরা যুদ্ধ করছে,' বিরক্ত হয়ে জবাব দেয় অফিসারটি।

মেয়েটি পয়সা রাখার ব্যাগ থেকে চাবি বের করে, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। ওকে অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকে, মাথা থেকে টুপি খুলে নিলো

অফিসারটি। ওদের সামনে নোংরা এক সারি ঠাণ্ডা সিঁড়ি, তাতে প্রাচীন যুগের লোহার বেষ্টনী।

'আমি দোতলায় থাকি, তিনতলায় অন্য লোক থাকে,' আগে আগে যেতে যেতে মেয়েটি বললো। অফিসারটি কোন জবাব দিলো না।

দোতলায় উঠে দরজা খুলে মানুষটাকে ভেতরে ঢোকালো মেয়েটি, দরজায় চাবি লাগিয়ে চাবিটা তালার গায়েই ঝুলিয়ে রাখলো, তারপর অফিসারটির হাত থেকে টুপিটা নিয়ে আলনায় রাখলো। গা থেকে হাতা-বিহীন কোটটা খুলে, টুপির নিচে সেটা ঝুলিয়ে রাখলো অফিসারটি। চকচকে কাঠ আর ধাতু দিয়ে তৈরি পোশাকের আলনাটা সরু একটা বারান্দায় রয়েছে, দু ধারে নোংরা অন্ধকার দেয়াল। ছোটখাটো চৌকো মাপের বৈঠকখানা ঘরটাতে গিয়ে ঢুকলো ওরা। বারান্দার মতো এ ঘরের দেয়ালগুলোও ম্যাড়মেড়ে রঙের। আসবাবপত্রের মধ্যে একটা ডিভান আর কাচ ও নিকেলে তৈরি একটা টেবিলকে ঘিরে দুখানা আরামকুর্সি। এক কোণে টুলের ওপরে একটা রেডিও। জানলার কাছে গিয়ে পর্দাটা তুলে দিলো মেয়েটি, কিন্তু খুব একটা আলো ভেতরে ঢুকলো না। জানলাগুলো বড় বড়, তাতে নীল পর্দা—যার ভেতর দিয়ে বিশাল একটা গাছের কঙ্কালসার ডালগুলো দেখা যায়। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলো অফিসারটি, ঠাণ্ডা নীল ঢাকনা পরানো শক্ত ডিভান-টাতে বসতে ইতস্তত করছিলো সে।

'বোসো, বোসো,' উত্তাপহীন ঘনিষ্ঠতায় 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে চলে এলো মেয়েটি। অফিসারটি বসলো এবং মেয়েটি তার নাগালের মধ্যে আসতেই, হয়তো ওর সম্বোধনের ঘনিষ্ঠতায় সাহসী হয়েই, সামনের দিকে ঝুঁকে ওর একখানা হাত ধরার চেষ্টা করলো।

'না, না···এক মিনিট একটু দাঁড়াও,' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো মেয়েটি, তারপর বারান্দার শেষ প্রান্তে গিয়ে আন্তর্গৃহ আলাপনীর গ্রাহক-যন্ত্রটা তুলে ধরলো। প্রায় তক্ষুনি ও শুনতে পেলো ওর মা জিজ্ঞেস

করছেন, ও ফিরেছে কি না। 'কথা যখন বলছি, তখন ফিরে এসেছি বৈকি,' অকরুণভাবে জবাব দিলো ও। 'বাচ্চাটাকে নেমে আসতে দিয়ো না যেন···আমার সঙ্গে লোক আছে···আমি নিজেই ওপরে চলে যাবো।' ওর মা ওকে আরও প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ও গ্রাহযন্ত্রটা নামিয়ে রাখলো।

মেয়েটি এবারে ভাবতে শুরু করলো, টাকাপয়সার ব্যাপারে ওর প্রাথমিক ঘৃণার ভাবটা ও অফিসারটির কাছে বজায় রাখার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে সচেষ্ট হয়েছে কিনা। 'অন্তত এই মানুষটার কাছ থেকে আমি কোন টাকাকড়ি নিতে রাজী হবো না,' ভাবলো ও। প্রথমবার ও যখন মেয়েমানুষ খুঁজে বেড়ানো একটা ফৌজী মানুষকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলো, তখন ও কোন লাভের আশা করেনি। বিদায়ের মুহূর্তে লোকটা ওকে টাকা দিতে চেয়েছিলো এবং লোকটার ব্যবহারে খুশী-ভরা হালকা মেজাজ আর অচিন্ত্যনীয় স্বতঃস্ফূর্ততা দেখে সত্যি সত্যি অবাক হয়েই টাকাটা নিতে রাজী হয়েছিলো ও। কিন্তু পরে প্রথম সাময়িক প্রেমিকটির আচরণেও খানিকটা ঘৃণার ভাব লক্ষ্য করে, অথবা লক্ষ্য করেছে বলে মনে করে। সে জন্যে ওর অনুতাপ হয়েছিলো। টাকাটা ব্যাগে রাখতে রাখতে ও তখন নিজের কাছেই শপথ করেছিলো, এই প্রথম আর এই-ই শেষ। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে দ্বিতীয় বারেও সেই একই ঘটনা ঘটলো···সেই একই রকমের শর্তসাপেক্ষ ব্যাপার, একই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা—যা একই সঙ্গে আনন্দদায়ক এবং অপমানকর দুই-ই; এবং তৃতীয় বারেও ঠিক তাই। শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এই লাভজনক বৃত্তিটাতেই ও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিলো। কিন্তু ওই লজ্জাজনক করুণ অনুভূতিটার জন্যে সর্বদাই ও যেমন করে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তেমনি এই অফিসারটিকে ও আগে থেকে কটু মন্তব্য দিয়ে আপ্যায়ন করেছে! এবং এখন সেই একই প্রশ্ন ওর সামনে এসে হাজির হয়েছে—টাকা নিতে ও রাজী হবে, কি না? এ কথা সত্যি, অন্যদের তুলনায় এই লোকটাকে যে ওর বেশি পছন্দ হয়েছে, তা নয়।

কিন্তু এই যুবকের কৌতূহলশূন্য উদাসী প্রেম মনটাকে নাড়া দিয়ে যায়। লোকটা নেহাতই ছেলেমানুষ, বয়েসে ওর চাইতে নিশ্চয়ই বছর পাঁচ-ছয়েকের ছোট। মেয়েটি ভাবলো, লজ্জা আর ভদ্র আচরণেই লোকটার যৌবনের প্রকাশ। ও নিশ্চয়ই ছাত্র ছিলো, অবশ্যই বড় ঘরের ছেলে এবং এর আগে কোন দিনও নারীসঙ্গ করেছে কিনা সন্দেহ। মনে মনে এসব কথা চিন্তা করতে করতে ছোট্ট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রান্নাঘরটাতে গিয়ে ঢুকলো মেয়েটি। তারপর আলমারি খুলে একটা বোতল আর দুটো গ্লাস বের করে, সেগুলো একটা ট্রেতে করে বাইরে নিয়ে এলো।

বিকেল ফুরিয়ে আসছিলো। শূন্য টেবিলটার মুখোমুখি শূন্য দুটো আরামকুর্সির মাঝখানে ডিভানটার ওপরে পকেটে হাত গুঁজে, পা ছড়িয়ে বসে থাকা অফিসারটিকে ঘরের ঝাপসা অন্ধকারে যেন আরও অবাস্তব আর অলৌকিক বলে মনে হচ্ছিলো। টেবিলের ওপরে ট্রেটা নামিয়ে রেখে বোতলের ছিপি খুললো মেয়েটি। একটু নিচু হতেই চুলগুলো ওর নাকের ওপরে এসে পড়লো—কেমন যেন ক্লান্ত অথচ আরও আকর্ষণীয় দেখালো ওকে। গ্লাস দুটো ভর্তি করে দিলো ও।

'ইংরেজি মদ,' মৃদু হেসে অফিসারটির পাশে বসলো মেয়েটি। 'তুমি পছন্দ করো?'

'হ্যাঁ, অপূর্ব জিনিস,' পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে ওর দিকে এগিয়ে ধরলো অফিসারটি।

'সিগারেট!' অতিরিক্ত উচ্ছল হয়ে ওঠে মেয়েটি, 'ধন্যবাদ···কিন্তু আমার কয়েকটা রয়েছে···' ব্যাগের মধ্যে খুঁজতে থাকে ও। কিন্তু অফিসারটি এমন ভাব দেখায়, যেন বলতে চায়, 'আমার থেকেই একটা নাও না!' সঙ্গে সঙ্গে খোঁজাখুঁজি বন্ধ করে মেয়েটি এবং যে বিবশ ভদ্রতা-বোধে ও অর্থগ্রহণে রাজী হয়, সেই ভদ্রতার কারণেই একটা সিগারেট তুলে নেয়। সামান্য সময় নিঃশব্দে বসে ধূমপান করে ওরা। মেয়েটি ওর কোটটা খুলে ফেলেছিলো—ওর পরনে শুধুমাত্র পশমী সোয়েটার আর ছোট মাপের পাতলা স্কার্ট। ঠাণ্ডা ঘরে বসে শীতে কাঁপছিলো ও।

'বেশ ঠাণ্ডা,' সামান্য হেসে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাসের ধোঁয়া বের করে দেখালো মেয়েটি।

'হ্যাঁ, খুব,' আস্তে আস্তে জবাব দিলো অফিসারটি।

'আমাদের, মানে ইতালিয়ানদের চাইতে তোমরা ইংরেজরা ঠাণ্ডায় অনেক বেশি অভ্যস্ত। তোমাদের দেশে সব সময়েই শীত।'

'এ বছরে লণ্ডনেও খুব শীত,' মেয়েটির দিকে না তাকিয়েই বললো অফিসারটি।

'কেন?'

অফিসারটিকে কাঁধ ঝাঁকাতে দেখলো মেয়েটি।

'ট্রেনগুলোকে সব পল্টনের কাজে লাগানো হচ্ছে···কারুরই এক কণা কয়লা নেই।'

'যুদ্ধটাকে তোমরা খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে নিয়েছো। ইংলণ্ডে সবাই যুদ্ধের কাজ করে···এমন কি মেয়েরাও। তাই নয় কি?'

'অবশ্যই,' দৃঢ় প্রত্যয়ে জবাব দেয় অফিসারটি। 'সবাই যুদ্ধে জড়িত ···মেয়েরাও···ঠিকই বলেছো তুমি।'

তারপর দীর্ঘস্থায়ী এক নৈঃশব্দ্য। অফিসারটি ছোট ছোট নীল চোখ মেলে একটানা তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। মেয়েটি অনুভব করে, লোকটার দৃষ্টির আঘাতে ক্রমশ বিচলিত হয়ে উঠছে ও। 'এবারে ও আমাকে চুমু দেবার চেষ্টা করবে,' ভাবলো মেয়েটি। যেন এক নিবিড় আতঙ্ক অনুভব করলো ও, মুখটা বিদ্রোহী হয়ে উঠে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশে কুঁচকে গিয়ে সামান্য বিরক্তির অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুললো। ও বিবাহিতা, একটি মেয়ে আছে এবং প্রেমিকও আছে অনেক। কিন্তু দুটো অপরিচিত ঠোঁট ওর ঠোঁটের কাছে এলেই এক ধরনের কুমারীসুলভ বীতরাগে ওর চামড়া কুঁচকে আসে।···যাই হোক, অফিসারটি শুধু ওর হাতখানা তুলে ধরলো এবং বিয়ের আংটিটা দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি বিবাহিতা?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার স্বামী কোথায় ?'

সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলো মেয়েটি। ও কি সত্যি কথাটাই বলে দেবে ? বলে দেবে যে, স্বামীর সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ? অন্য একজন অফিসারের ক্ষেত্রে কোন এক অজ্ঞাত কারণে একটা কথা হঠাৎ ওর মাথায় এসে গিয়েছিলো—বলেছিলো, ওর স্বামী একজন যুদ্ধবন্দী। মুহূর্তের জন্যে ওই মিথ্যেটা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়েছিলো। কারণ তাতে এক দিক দিয়ে ওর আচরণ খারাপ বলে মনে হলেও, অন্য দিক দিয়ে ওর অবস্থাটা করুণ বলে মনে হয়···দারিদ্র্য এবং নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্যে স্বাভাবিক বলে মনে হয় ওর আচার-আচরণ। অতএব 'উনি একজন বন্দী,' বেহায়ার মতো অফিসারটির চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো মেয়েটি।

কোন কথা না বলে ওর দিকে আগের মতোই তাকিয়ে রইলো অফিসারটি। কিন্তু মেয়েটির মনে হলো, মানুষটার চোখে যেন সমবেদনার আলো ফুটে উঠেছে এবং সেটুকুকেই সম্বল করে রইলো ও।

'আমি এখন একা,' জোর দিয়ে দিয়ে বললো মেয়েটি। 'আমার স্বামী রোজগার করতেন, কিন্তু এখন আমার কিছুই নেই···'

মেয়েটির মনে হলো, ও যেন সত্যি কথাই বলছে—যদিও ও ভালো করেই জানে, কথাটা সত্যি নয়···ওর স্বামী বন্দী নয়, প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তাগুলোর জন্যে সে ওকে যথেষ্ট টাকা-পয়সা পাঠিয়েছিলো, এতদিন সেই অর্থই ও ব্যয় করেছে এবং এখন আবার বিলাসিতার জিনিস কেনাকাটার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তবু ওর মনে হলো, ও যেন সত্যি কথাই বলছে। এবং আঘাতদায়ক সত্যি কথা বলতে গেলে যেমন হয়, ও তেমনি বেদনা অনুভব করলো।

'আর তুমি···তুমি কি বিবাহিত ?' জিজ্ঞেস করলো মেয়েটি।

'বিয়ে ঠিক হয়ে আছে,' পাতলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ব্যাগ বের করলো অফিসারটি। তারপর ব্যাগ থেকে একটা ছবি বের করে এগিয়ে দিলো মেয়েটির দিকে। ছবিটা একটি সাধারণ মেয়ের—

সুন্দরী নয়, আবার একেবারে সাদামাঠাও নয়—গাছগাছালির পট-ভূমিকায় একটা সাইকেলের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে মেয়েটি।

'সুন্দর' বললো ও।

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর,' নিবিড় আত্মপ্রসাদে ছবিটা আবার ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলো অফিসারটি।

মেয়েটির ছবি মানুষটাকে যদি জুড়িয়ে দেয়, আচমকা সেই আশঙ্কায় ত্রস্ত হয়ে উঠলো ও। খানিকক্ষণ আগে যেজন্যে ও এত ভয় পাচ্ছিলো, এখন সেই চুম্বনের জন্যেই প্রলোভিত করে তুলতে চাইলো মানুষটাকে।

'বড় জোর ঘণ্টাখানেক হলো আমাদের পরিচয় হয়েছে,' সামান্য হাসলো ও, 'অথচ মনে হচ্ছে, আমরা যেন যুগ যুগ ধরে দুজন দুজনকে চিনি।'

মানুষটার হাতে হাত রেখে ওর আঙুলগুলো নিজের আঙুলে জড়িয়ে নিলো মেয়েটি।

এতক্ষণে গোধূলি ঘন হয়ে এসেছে, ঘরের কোণ থেকে ছায়া নেমে এসেছে ডিভান আর ডিভানে বসে থাকা যুগলের ওপরে। এক হাতে মেয়েটির হাত চেপে ধরে, অন্য হাতে ওর মাথাটা নিজের দিকে টেনে আনলো অফিসারটি—নিজের ঠোঁটের দিকে নয়, কাঁধের দিকে। ছায়াঘন ঠাণ্ডা ঘরে খানিকক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে রইলো ওরা। মানুষটার কাঁধে মেয়েটির মাথা...কি করবে ঠিক বুঝতে পারছিলো না মেয়েটি, বড় বড় করে চোখ মেলে রেখেছিলো অন্ধকারের মধ্যে। এ ধরনের আবেগ-প্রবণতার সঙ্গে ওর পরিচয় এই প্রথম নয়, তাই সরাসরি উদ্দাম ব্যবহারই ও আশা করেছিলো—যা প্রতিটা ক্ষেত্রেই ওকে প্রচণ্ড পরিমাণে বিব্রত আর বিরক্ত করে তোলে। অবশেষে বেশ কিছুক্ষণ পরে—যা মেয়েটির কাছে অনন্ত বলেই মনে হচ্ছিলো—লোকটা ওকে চুমু দেবার জন্যে এগুলো। 'দাঁড়াও,' আগে থেকে বুঝতে পেরে রুমাল দিয়ে ঠোঁটের লালিমা মুছে নিলো মেয়েটি। তারপর চুমু খেলো ওরা।

চুমু দেবার পরে মেয়েটির মাথা আবার নিজের কাঁধের ওপরে টেনে

আনলো অফিসারটি, সোহাগের হাত বোলাতে শুরু করলো ওর কপালে আর চুলে। চুলগুলো কপালে টেনে এনে এলোমেলো করে দিলো, তারপর পাট করে দিয়ে, এলোমেলো করে দিলো আবার। লোকটার আদরের মধ্যে এক ধরনের নীরব এবং আবেগময় উন্মাদনা···যেন মেয়েটির কপালটা ও অন্য কোথাও সরিয়ে দিতে চায়—ঢেউ যেমন করে সৈকতের ওপরে সরিয়ে দেয় সাদা নুড়ি পাথরগুলোকে। মেয়েটি অনুভব করলো, ও এমন একজন পুরুষের পাল্লায় পড়েছে যার কাছে দৈহিক প্রেমের চাইতে স্নেহ-মমতার, কামনার চাইতে কোমলতার প্রয়োজন অনেক বেশি। লোকটাকে তার ইচ্ছে মতো আদর করতে দিয়ে ক্রমশ ঠাণ্ডা আর ক্লান্ত হয়ে উঠছিলো মেয়েটি। মাঝে মাঝেই ওকে ছোট্ট করে একটা চুমু দেবার জন্যে আদর থামাচ্ছিলো অফিসারটি, তারপর খোলা আঙুল দিয়ে ওর চোখের একটু ওপরে কপালটাতে হাতের চাপ দিচ্ছিলো, বিলি কেটে দিচ্ছিলো চুলের একেবারে গোড়া পর্যন্ত। মানুষটার হাত হালকা এবং ভারি—দুই-ই। হালকা তার কারণ, ওর হাতে এক ধরনের আবেগের উত্তাপ। আর ভারি তার কারণ, এত জোরে সে হাতের চাপ দিচ্ছে যেন কোন মলম মালিশ করছে।

ঠিক তখনই গভীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে দরজায় করাঘাত শোনা গেলো।

'দুঃখিত,' উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি। তারপর ছায়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে, চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা সামান্য একটু খুলে ধরলো। প্রথমটাতে ও কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। তারপর নিচের দিকে তাকিয়ে ওর মেয়ের গোল মুখখানা দেখতে পেলো—লম্বা চুলগুলো মাথার ওপরে ফিতে দিয়ে বাঁধা।

'দিম্মাকে বলেছিলাম, তোমাকে যেন নিচে না পাঠায়···আমার সঙ্গে লোক আছে,' দরজা না খুলেই বললো মেয়েটি।

'দিম্মা জানতে চাইছে, তুমি রাত্তির বেলা খাবার খেতে আসবে কি না।'

'হ্যাঁ, যাবো। এবারে তুমি যাও, আবার এসো না যেন···আমি ওপরে যাবোখন।'

'আচ্ছা।'

বাধ্য মেয়ের মতো ফিরে যায় বাচ্চাটা। দরজা দিয়ে ওর একটা একটা করে সিঁড়ি ভাঙার শব্দ শুনতে পায় মেয়েটি—সিঁড়ির ধাপগুলো ওর পায়ের পক্ষে বড্ড উঁচু। তারপর শব্দটা মরে যায়, আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে মেয়েটি। ঘরে ঢুকতেই মানুষটার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে ও।···চুলগুলো তখনও ওর চোখের ওপরে লুটিয়ে রয়েছে··· মুখ না ফিরিয়েই প্রশ্ন করে, 'এবারে কি আমরা আমার ঘরে যাবো?'

বারান্দা ধরে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো ওরা। শীতল গোধূলি এখানেও স্পর্শাতীত ধূলিকণার মতো নিচু বিছানা আর দু-তিনটে বৈশিষ্ট্য-হীন আসবাবপত্রের ওপরে ছড়িয়ে আছে বলে পরিবেশটা কেমন যেন জনহীন পরিত্যক্ত বলে মনে হয়। অফিসারটিকে ভেতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে মেয়েটি। ও ঘুরে দাঁড়াতেই মানুষটা জড়িয়ে ধরে ওকে, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে দুজনেই বসে পড়ে বিছানার ওপরে। কোন রকমে হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপরে রাখা আলোটা জ্বেলে দেয় মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ওরা—কি বলবে বুঝে না পেয়ে মেয়েটি শিশুর মতো প্রশ্ন করে, 'আমাকে তোমার কেমন মনে হয়?'

মেয়েটি লক্ষ্য করে, মানুষটা ওকে মনোযোগ দিয়ে যাচাই করছে। মুহূর্তের জন্যে ও এই ভেবে আশঙ্কিত হয়ে ওঠে যে, মানুষটা হয়তো স্বচ্ছন্দে এমন জবাব দিয়ে বসবে, যা ওকে অপমানিত করে তুলবে। প্রশ্নটা করার জন্যে অনুতাপ হয় ওর।

'মনে হয় তুমি খুব সুন্দর,' শেষ অব্দি গভীর আন্তরিকতা আর আপাতনম্র সুরে জবাব দেয় অফিসারটি।

'ধন্যবাদ, তুমি খুব সহৃদয় মানুষ,' খুশীর অভিব্যক্তি নিয়ে মুখ নিচু করে মেয়েটি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি জানলাটা বন্ধ করে আসছি।'

জানলার কাছে গিয়ে পর্দাটা নামিয়ে দেয় মেয়েটি। 'এখন ওকে আমার পোশাক খোলার কথা বলতে হবে,' ভাবলো ও। লোকটার অনভিজ্ঞতার জন্যে নিজের সমস্ত কমনীয়তা ছুঁড়ে ফেলতে হচ্ছে ভেবে নতুন করে বিরক্তি অনুভব করলো ও। কিন্তু কথাটা ওর মাথায় আসতে না আসতেই দেখলো, লোকটা শান্তভাবে গায়ের কোটটা খুলে কুর্সির ওপরে ঝুলিয়ে রাখছে। তারপর পাতলুনের বক্‌লস্ খুলতে শুরু করলো সে। এ ব্যাপারটা যেন মানুষটার প্রথম আলিঙ্গনের ভীরুতার সঙ্গে একেবারে সামঞ্জস্যহীন।

অকারণ ক্রোধে দাঁতে দাঁত চেপে, বিছানার ধারে বসে জুতো খুলতে শুরু করলো মেয়েটি। শব্দ শুনে বুঝলো, যুবক ওর পেছনে—বিছানার ওপরে—লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। আচমকা ওর মনে হলো, লোকটা হয়তো ওকে লক্ষ্য করতে পারে এবং সেটা অসহ্য ঠেকলো ওর কাছে।

'দয়া করে উলটো দিকে ফেরো,' প্রচণ্ড বেগে লোকটার দিকে মুখ ঘোরালো মেয়েটি। 'আমি যখন পোশাক খুলছি তখন কেউ আমাকে লক্ষ্য করবে, আমি তা সহ্য করতে পারি নে।'

মেয়েটি লক্ষ্য করলো, আচমকা ওর ফেটে পড়া দেখে মানুষটা অবাক হয়ে বালিশে মাথা ঘুরিয়ে নিলো···কিন্তু চাদরের বাইরে আধখানা খোলা বুক নিয়ে চিৎ হয়েই শুয়ে রইলো আগেকার মতো। ও যখন সব চাইতে বেঢপ পরিস্থিতিতে রয়েছে—ওর একটা হাঁটু বিছানায় আর একটা পা মেঝেতে, সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে ওর শরীরটা, স্তনদুটো আর চুল-গুলো ঝুলছে নিরালম্বের মতো—ঠিক তখনই অধৈর্য অথবা কৌতূহলী হয়ে ফের মাথা ঘোরালো মানুষটা। বিরক্তি বেড়ে উঠলো মেয়েটির। তবু মানুষটার শরীরের ওপরে ঝুঁকে, নিজের বাহুসন্ধির কবোষ্ণ অন্ধকারে ওর চোখ দুটো ঢেকে দিয়ে, টেবিলের ওপরে রাখা আলোটা নিভিয়ে দিলো।

পরে সুতোর কাজ করা অমসৃণ চাদরের নিচে নগ্ন শরীরে একে অন্যের বাহুবন্ধনে শুয়ে রইলো ওরা। মেয়েটি অনুভব করলো, অন্ধকারে মানুষটার হাত ওর কপালে আবার সেই দীর্ঘ মালিশ শুরু করেছে—

আগের মতোই তাতে সেই তীব্র আবেগময়তা, কিন্তু সেই সঙ্গে ঈর্ষা আর অধিকারবোধের এক নতুন কম্পন। ওর শরীরের যে সব অংশ মানুষটার শরীরে ছুঁয়ে নেই, সে সব অংশগুলো ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। অথচ মানুষটার সোহাগ বর্ষণের মধ্যেও ও অনুভব করছিলো, ওর মুখে এক তিক্ত অবিশ্বাসের কুটিল রেখা ফুটে উঠেছে। নিজের চিন্তাগুলোকে থামাতে চাইছিলো মেয়েটি, কিন্তু ওর মনটা ওর ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে স্বাধীন ভাবে চিন্তার স্রোতে ভেসে চললো—ঠিক চিন্তা নয়, অবাস্তব অলীক কিছু কল্পনার সঙ্গে ফেলে আসা কিছু স্মৃতি আর সম্পর্কের সংমিশ্রণ। যেমন, ও কল্পনা করলো, যুবক অফিসারটি ওর প্রেমে পড়েছে···ওকে সে তার নিজের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। এই অলীক কল্পনা থেকে জন্ম নিলো আরও কিছু স্বপ্ন—কি ভাবে ওরা নতুন জীবন কাটাবে, কাদের সঙ্গে ওদের পরিচয় হবে, কি রকম বাড়িতে ওরা বাস করবে···ভাবলো, ওর মেয়ে আর মায়ের কথা। তারপর ওর চিন্তা বয়ে চললো অন্য খাতে —যেখান থেকে ওর চিন্তা শুরু হয়েছিলো, তার সঙ্গে এর যোগাযোগ সামান্যই···সেগুলো আবার স্বতঃস্ফূর্ত বংশলতার মতো বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে বিচিত্র লক্ষ্যে ছুটে চললো ইচ্ছেমতো। এক সময় মেয়েটি সচকিত হয়ে অনুভব করলো, বিকেলবেলা অফিসারটির সঙ্গে দেখা হওয়ার একটু আগে রাস্তায় কে ওকে সম্ভাষণ জানিয়েছিলো, ও সে কথাটাই চিন্তা করছে। এই সমস্ত অনাহূত চিন্তা ওর মনে এক অস্পষ্ট বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো বিশেষ করে ঠিক তখনই, যখন ওর শীতার্ত পিঠের নাছোড়বান্দা অস্বস্তির মতো 'আমাকে টাকা দেবার জন্যে লোকটাকে আমি বাধ্য করবো, কিনা'—এই প্রশ্নটা ওকে জ্বালিয়ে তুললো।

অতএব এখন রাত্রির অন্ধকারে নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে রইলো ওরা। অবশেষে মেয়েটি ঝিমোতে শুরু করলো এবং এক অনির্দিষ্ট কাল পরে জেগে উঠলো আবার। দেখলো অফিসারটি ইতিমধ্যে উঠে পোশাক টোশাক পরে, টিউনিকের বোতাম এঁটে নিচ্ছে। ঘরের আলোটা জ্বলছে

এবং সেটা এ ধরনের সাক্ষাৎকারের ফলস্বরূপ ঘরের অনিবার্য বিশৃঙ্খলাই স্পষ্ট করে তুলেছে।

'আমি বাইরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো,' ওকে দরজার দিকে দেখিয়ে বেরিয়ে গেলো মানুষটা।

লোকটা চলে যাবার পরেও কোঁচকানো বিছানাটাতে খানিকক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইলো মেয়েটি। তারপর লোকটা ওকে টাকা না দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে ভেবে, আচমকা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো ও। লোকটার এমনধারা তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাবার ব্যাপারটা রীতিমতো সন্দেহজনক। নিজের ভয়ে নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠলো মেয়েটি···নিজে ওদের শিকার হওয়া সত্ত্বেও ও প্রায় আশা করছিলো, অফিসারটি সত্যি সত্যি চলে যায়নি। প্রেমের সৌরভের মতো লেগে থাকা আতঙ্ক থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে না পেরে, দ্রুত পোশাক-টোশাক পরে নিলো ও।

আলমারির আয়নায় চুল আঁচড়ে নিলো মেয়েটি। লক্ষ্য করলো, লোভ ক্রোধ আর সন্দেহের উত্তেজনায় ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। আয়নার গভীরে নিজের হীন প্রতিমূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খাটের কাছে টেবিলটার ওপরে ভাঁজ করে রাখা টাকাগুলো দেখতে পেলো ও। ব্যগ্র কৌতূহলের ভ্রূকুটি নিয়ে নোটগুলো গুণে দেখলো মেয়েটি। ও যেমনটি আশা করেছিলো, অঙ্কটা তার চাইতে অনেক বেশি। অফিসারটি হয়তো সত্যি সত্যি চলে গেছে ভেবে এবারে সত্যিই শঙ্কিতা হয়ে উঠলো ও···এক ছুটে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

বৈঠকখানা ঘরে অফিসারটিকে দেখতে পেলো মেয়েটি। ঘরের আলো জ্বেলে এক গ্লাস পানীয় নিয়ে ডিভানের ওপরে বসেছিলো মানুষটা। দাঁতের মাঝখানে একটা তামাকের নল। ওকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো সে।

মেয়েটি কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'তুমি নিজে নিজেই পানীয় নিয়েছো বলে আমি খুব খুশী হয়েছি। আমাকেও একটু ঢেলে দেবে?'

বোতলটা নিয়ে মেয়েটির গ্লাস ভরে দিলো মানুষটা। ডিভানে বসে লোভীর মতো সেটা পান করলো মেয়েটি। লোকটার প্রথম চুম্বন ওর

কাছে যতটা ভীতিপ্রদ বলে মনে হয়েছিলো, এখন লোকটা চলে যাবে ভাবতে ঠিক ততখানিই ভয় লাগছিলো ওর। দৈহিক নিঃসঙ্গতা আর বিচ্ছেদের অপমানকর এবং যন্ত্রণাময় এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা অনুভব করছিলো ও। ও চাইছিলো, মানুষটা থাকুক। ওরা এক সঙ্গে বসে ক্রমাগত পান করতে পারে···মাতাল হয়ে যেতে পারে। ও পান করতে চাইছিলো—তার কারণ ও ভাবছিলো, যে সব কথা ওকে একদিন না একদিন কাউকে না কাউকে বলতেই হবে, পানের অবকাশে সে সমস্ত কথাই ও অফিসারটিকে বলে দিতে পারবে।

নিজের জন্যে দ্বিতীয় গ্লাস পানীয় ঢেলে, অফিসারটির গ্লাস ভর্তি করতে শুরু করলো মেয়েটি। কিন্তু অফিসারটি হাতের ইঙ্গিতে ওকে নিষেধ জানালো।

'আর একটু নেবে না?' আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলো মেয়েটি।

'না, ধন্যবাদ।'

'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে,' এক আকস্মিক আশায় ঝলমলে চোখ নিয়ে উচ্ছল হয়ে উঠলো মেয়েটি। 'তুমি আমার সঙ্গে রাত্তিরের খাওয়াটা খেয়ে যাও না কেন? আমি তোমার জন্যে রান্না করবো···স্প্যাগেত্তি বানাবো। স্প্যাগেত্তি তুমি পছন্দ করো?'

'হ্যাঁ, সত্যিই পছন্দ করি।' লোকটা হতাশার স্বরে বললো, 'কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে!'

'না, যেও না! খাওয়াদাওয়া করো···আর রাত্তিরটাও থেকে যাও।'

'তা অসম্ভব।'

'তুমি এখন আর আমাকে সহ্য করতে পারছো না।···সবই কি শেষ হয়ে গেলো?'

বিস্মিত ভঙ্গিমায় লোকটাকে মাথা নাড়তে দেখে স্বস্তি পেলো মেয়েটি—যেন মানুষটাকে ও যে কারণে অভিযুক্ত করেছে, মানুষটা আদৌ সে অপরাধ করেনি।

'আমি থাকতেই চাই। আমার মতো পরিস্থিতিতে পড়লে যে কোন

মানুষই থাকতে চাইবে। কিন্তু আমি থাকতে পারছি না,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো মানুষটা।

আতঙ্কে অধীর হয়ে উঠলো মেয়েটি। সামনের দিকে ঝুঁকে মানুষটার একখানা হাত তুলে নিয়ে, তাতে নিজের ঠোঁট দুটি চেপে ধরলো ও। মিনতি করে বললো, 'যেও না!' তারপর কি বলছে তা ঠিক মতো না বুঝেই বললো, 'আমার কেমন মনে হচ্ছে, তুমি থাকলে আমি তোমার প্রেমে পড়ে যাবো।'

'কঠিন ফৌজি কানুনে আমাকে যেতেই হবে,' ওকে বুঝিয়ে বললো অফিসারটি। তারপর মৃদু হাসির সঙ্গে—যদিও তা বিদ্বেষের হাসি নয়—জুড়ে দিলো, 'আসছে কাল তোমার সঙ্গে আবার অন্য কারুর দেখা হবে, তখন তুমি আমার কথা সব কিছুই ভুলে যাবে।'

মানুষটার কথার বিরোধিতা করার মতো সাহস হলো না মেয়েটির। চুলগুলো পরিপাটি করে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে তাকে অনুসরণ করলো ও। হাতাবিহীন কোটটা গায়ে চড়িয়ে নিলো অফিসারটি। তারপর পকেট থেকে একটা টর্চ বের করে এগিয়ে গেলো সিঁড়ির দিকে। সিঁড়িগুলোর নিচে বাগানের অন্ধকারে টর্চের উজ্জ্বল রোশনাই গাড়িটার কর্দমাক্ত অংশটাকে আলোকিত করে তুললো।

সিঁড়ির শেষ ধাপগুলো নেমে এলো ওরা।

'বিদায়,' হাত এগিয়ে দিলো অফিসারটি।

'বিদায়,' মানুষটার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলো মেয়েটি। তারপর বললো, 'তুমি গাড়িতে উঠে বোসো, আমি দরজাটা খুলে দিচ্ছি।'

গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করলো অফিসারটি। মেয়েটি ততক্ষণে দরজা খোলার জন্যে ছুটে গেছে। পাল্লা দুটো ঠেলে খোলার জন্যে নিজের সবটুকু শক্তির প্রয়োজন হলো ওর। গাড়িটা রাস্তায় গিয়ে উঠলো। ঠিক তখনই আচমকা মেয়েটির মনে পড়লো, দরজা খোলার পরে ও প্রথমেই মুরগীর খুপরিটা দেখতে গিয়েছিলো। তখন রতিবিলাসের আগে অহঙ্কারে কেমন ফুলে ছিলো মুরগীটা! আর পরেও আত্মগর্বে

সেটা ফুলে ছিলো ঠিক আগের মতোই। কত দ্রুত প্রেম থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলো মুরগীটা—শুধু একটু ডানার ঝটপটানি আর সেই সঙ্গেই সব শেষ। অথচ সেই একই সময়ে মুরগীটার অহঙ্কারী হাবভাব কতই না মেকি বলে মনে হয়েছিলো ওর, কত ঘৃণ্য বলে মনে হয়েছিলো ডানার ওই ঝটপটানি।

রাত্রির বুকে গাড়িটার চলে যাবার শব্দ শুনে সম্বিৎ ফিরে পেলো মেয়েটি। একটা একটা করে দরজার পাল্লা ত্নটো বন্ধ করে সামনের দরজার দিকে ফিরে এলো ও। 'অহঙ্কার নিয়ে আর ডানা ঝাপটেই ফিরে এসেছি আমি,' ভেতরে ঢুকে ভাবলো মেয়েটি।

টেনিস ক্লাবে অপরাধ

শীতের প্রায় মাঝামাঝি নাগাদ আমাদের শহরের এক অন্যতম সুপরিচিত টেনিস ক্লাবের কার্যনির্বাহক সমিতি একটা বল নাচের উৎসব করবে বলে সিদ্ধান্ত নিলো। সমিতি গঠিত হয়েছিলো সর্বশ্রী লুসিনি, মাস্ত্রোগিয়োভানি, কস্টা, রিপানদেলি এবং মিচেলিকে নিয়ে। তারা শ্যাম্পেন, অন্য পানীয় ও জলখাবার যোগানোর জন্যে এবং একটা ভালো ঐকতানবাদক দলকে ভাড়া করার জন্যে কিছুটা টাকার অঙ্ক আলাদা করে সরিয়ে রাখলো—তারপর যাঁরা আমন্ত্রিত হবেন, তাঁদের একটা তালিকা তৈরি করতে শুরু করলো। ক্লাবের অধিকাংশ সভ্যই সেই শ্রেণীর মানুষ, সাধারণ ভাবে যাদের উচ্চ মধ্যবিত্ত বলা হয়। তাঁরা সকলেই ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশজাত এবং যেহেতু প্রত্যেকেরই কোন না কোন ধরনের কাজ থাকা দরকার, তাই আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা সকলেই কোন না কোন পেশার অধিকারী। অতএব তাঁদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিত জনের ভেতর থেকে যথেষ্ট সংখ্যক নাম সংগ্রহ করা তেমন কিছু কঠিন কাজ নয়। পদমর্যাদায় বা গুরুত্বে তাদের মধ্যে অনেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হলেও, খবরের কাগজে উঁচু তলার সংবাদ স্তম্ভে ঘটনাকে অভিজাত চাকচিক্য দেবার পক্ষে তাঁরা কেউই কম সম্মানবৃদ্ধিকর নন। যাই হোক, যখন আমন্ত্রণ পত্র পাঠানো ছাড়া আর কোন কাজ বাকি নেই, তখন একেবারে শেষ মুহূর্তে—সাধারণত যেমন হয়ে থাকে —আচমকা এমন একটা ঝামেলা এসে উদয় হলো, যা আগে চিন্তা করা যায়নি।

'আচ্ছা, "রাজকুমারী"র ব্যাপারটা কি হবে?' ত্রিশ বছরের যুবক রিপানদেলি জিজ্ঞেস করলো, 'তাঁকে কি আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি না?' দক্ষিণী ধরনের সুদর্শন চেহারা রিপানদেলির, মাথায় চকচকে কালো চুল,

চোখ দুটো কালো, ঘন রঙের ডিম্বাকৃতি মুখের সুষ্ঠু গড়ন। অ্যামেরিকার অন্যতম বিখ্যাত একজন চিত্রতারকার সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার জন্যে রিপান-দেলি পরিচিত—সে নিজেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এবং মেয়েদের ওপরে ছাপ রাখার জন্যে সে এটাকে ব্যবহারও করে থাকে।

মাস্ত্রোগিয়োভানি, লুসিনি এবং মিচেলি 'রাজকুমারী'কে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারটা অনুমোদন করলো। ওরা বললো, উৎসবে মহিলা অতিরিক্ত এক চিলতে আমোদ যোগাবেন···হয়তো সেটাই হবে এক-মাত্র আমোদ। উচ্চ কণ্ঠে হাস্যরোল এবং পারস্পরিক পিঠ চাপড়া-চাপড়ির মধ্যে গতবার যে কাণ্ড হয়েছিলো, তা ওরা একে অন্যকে স্মরণ করিয়ে দিলো। সে বারে 'রাজকুমারী' এত বেশি শ্যাম্পেন খেয়ে ফেলেছিলেন যে উনি সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে গিয়েছিলেন, কে একজন ওঁর জুতোজোড়া লুকিয়ে রেখেছিলো এবং শেষ অভ্যাগতটি চলে না যাওয়া পর্যন্ত উনি অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন—যাতে পায়ে শুধুমাত্র মোজা পরা অবস্থায় উনি ওখান থেকে বেরুতে পারেন।···

একমাত্র কস্টা—যাকে ওরা সবাই অমঙ্গলের পাখি বলে থাকে—লম্বা জবুথবু চেহারার কস্টা, যার লম্বা নাকে কচ্ছপের খোল দিয়ে তৈরি বিশাল ফ্রেমের এক চশমা, যার পাতলা চিবুকটা কখনই ঠিকমতো কামানো থাকে না—একমাত্র সেই কস্টাই প্রতিবাদ জানালো।

'না, এবারে ওঁকে বাড়িতেই থাকতে দাও,' কস্টা বললো। 'গতবার নাচের সময় আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছিলো। তোমরা মজা চাইলে ওঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে পারো, কিন্তু এখানে ওসব কোরো না···'

সঙ্গীরা অসন্তোষ প্রকাশ করে কস্টার সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলো। বললো, সে খেলাধুলো পণ্ড করে দেয়, সে বোকা এবং আর যাই হোক সে ক্লাবের মালিক নয়।

কার্যনির্বাহক সমিতির ছোট ঘরটাতে দু ঘণ্টা ধরে বসে রয়েছে ওরা, সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারাক্রান্ত। দেয়ালে নতুন প্লাস্টার লাগানো হয়েছে বলে ভেতরটা উষ্ণ এবং স্যাঁতসেঁতে। কোটের তলায়

ওদের সকলেরই পরনে বিভিন্ন রঙের পুরু সোয়েটার। কিন্তু বাইরে জানলার শার্শীর ওধারে ফার গাছের যে একক শাখাটা দেখা যাচ্ছে, ধূসর আকাশের পটভূমিকায় সেটা এতই অচঞ্চল এবং বিষণ্ণ যে, বৃষ্টি হচ্ছে কি না তা দেখার জন্যে এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকে তাকানোর প্রয়োজন হয় না।...

'আমি জানি,' কস্টা উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝালো সুরে বললো, 'আমি জানি, তোমাদের মতলব হচ্ছে হতভাগী মহিলাটির সঙ্গে কোন নোংরা ধরনের বদমাইশি করা।...আমি তোমাদের প্রত্যেককেই বলছি—তোমরা নিচ জঘন্য...নিজেদের জন্যে তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।'

'কস্টা, আমি ভেবেছিলাম তুমি আর একটু বেশি বুদ্ধিমান,' নিজের জায়গা থেকে নড়াচড়া না করে রিপানদেলি ঘোষণা করলো।

'এবং আমি ভাবিনি, তোমাদের মনে এত শয়তানি,' আঙ্‌টা থেকে ওভারকোটটা নামিয়ে নিয়ে কাউকে বিদায় না জানিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো কস্টা। এবং আরও পাঁচ মিনিট আলোচনার পরে সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে রাজকুমারীকে বল নাচে আমন্ত্রণ জানাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

রাত দশটার সামান্য পরে বল নাচ শুরু হলো। সমস্ত দিন বৃষ্টি হওয়ার দরুন রাতটা স্যাঁতসেঁতে এবং কুয়াশাচ্ছন্ন। শহরতলির যে রাস্তায় ওদের ক্লাব-বাড়িটা, তার বেশ খানিকটা দূর থেকেই দু সারি আবছা প্লেন গাছের মাঝখান দিয়ে বাড়িটার আলোর আভা আর অভ্যাগতরা এসে পৌঁছলে কিছু বিভ্রান্ত আলোর গতি এবং তাদের গাড়িগুলো দেখা যায়। বাড়িতে ঢোকার মুখোমুখ একটা ছোট ঘরে একটা ভাড়াটে-চাকর অভ্যাগতদের কোট আর চাদরগুলো রেখে দিচ্ছিলো। তারপর হালকা সান্ধ্য পোশাক পরা মহিলারা এবং টেইল কোট পরা পুরুষরা কথা বলতে বলতে আর হাসতে হাসতে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত বল নাচের বিশাল ঘরটাতে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

ঘরটা সত্যিই বিশাল, সম্পূর্ণ বাড়িটার সমান উঁচু। ঘরের চারদিকে দোতলার সমান উচ্চতায় নীল রঙের সূক্ষ্মাগ্র কাঠের বেষ্টনী দেওয়া একটা গ্যালারি। এই গ্যালারি থেকে কতকগুলো ছোট ছোট ঘরে যাওয়ার পথ—যে ঘরগুলো সাজঘর এবং খেলাধূলার সরঞ্জাম রাখার কুঠরী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাঠের ওই বেষ্টনীটার মতো একই ধরনের এবং একই রঙের বিরাট একটা ঝাড়বাতি ছাদ থেকে ঝুলছে। এই বিশেষ উপলক্ষে ঝাড়বাতিটা থেকে রঙচঙে কাগজের ফেস্টুন টেনে দেওয়া হয়েছে ঘরের চার কোণ পর্যন্ত। ঘরের অন্য প্রান্তে দোতলার সিঁড়ির নিচে পানশালা তথা জলখাবারের জায়গা—সেখানে সারি সারি চড়া রঙের বোতল আর ঝকঝকে একটা কফি বানানোর যন্ত্র।

'রাজকুমারী'—যিনি আদৌ রাজকুমারী নন, কিন্তু কথিত আছে যিনি একজন কাউন্টেস মাত্র (জনশ্রুতি এই যে, এক সময় উঁচু সমাজের ব্যভিচার, প্রেমিকের সঙ্গে পালানো ইত্যাদিতে লিপ্ত থেকে এখন উনি অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারে বিধ্বস্ত)—তিনি এগারোটার একটু পরেই এসে পৌঁছলেন। ছোট ঘরটার হাট করে খুলে রাখা দরজাটার উলটো দিকে একদল মহিলার সঙ্গে বসে থাকা রিপানদেলি ওঁর সুপরিচিত চেহারাটা দেখতে পেলো। বেঁটেখাটো, খানিকটা মোটাসোটা চেহারা মহিলাটির—পা দুটো আঙুলজোড়া পাখির পায়ের মতো বাইরের দিকে বাঁকানো। রিপানদেলির দিকে পেছন ফিরে একটু নিচু হয়ে উনি তখন চাকরটার হাতে ওর অঙ্গাবরণীটা তুলে দিচ্ছিলেন। 'এসে গেছে,' ভাবলো রিপানদেলি, নিদারুণ আনন্দে মনটা ভরে উঠলো তার। নাচের ভিড় ঠেলে সে ঠিক সময় মতোই মহিলার কাছে গিয়ে পৌঁছলো। মহিলা তখন নিজের মনগড়া কোন অর্থহীন কারণে চাকরটার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে, তার মুখে চপেটাঘাত করতে যাচ্ছিলেন।

'সুস্বাগতম, সুস্বাগতম!' দোরগড়া থেকে মহিলার উদ্দেশ্যে বললো রিপানদেলি।

'ওঃ রিপানদেলি, এসো তো—এসে এই পশুটার কাছ থেকে

আমাকে নিয়ে যাও!' রিপানদেলির দিকে ফিরে তাকালেন মহিলা।

রাজকুমারীর মুখটা সুন্দর নয়। কোঁকড়ানো চুলের অরণ্যের নিচে ভীষণ ছোট্টখাট্ট মুখ, বলিচিহ্নিত কালো চোখ দুটোতে বিবর্ণ ও বন্য চাউনি। বিশাল লম্বা নাকের ফুটো দুটো লোমে ভর্তি। চওড়া খসখসে ঠোঁট-দুটোতে একটানা রীতিমাফিক বোকাটে হাসি। রাজকুমারীর পোশাক-আশাক একই সঙ্গে জমকালো এবং মলিন। ওঁর পরনে সাবেকি আমলের লম্বা স্কার্ট, বক্ষ-আবরণীর বন্ধন এতই আঁট যে ওর দীর্ঘ দুই শিথিল স্তনের স্ফীত অংশ দুটি বাইরে বেরিয়ে এসেছে। হয়তো গলার কাছে পোশাকের অত্যধিক গভীর করে কাটা অংশটুকু লুকোবার জন্যেই, উনি তার ওপরে একটা কালো রঙের শাল জড়িয়ে নিয়েছেন। শালের মধ্যে প্রতিটি সম্ভাব্য রঙে পাখি ফুল ও আরবীয় নকশায় সুতোর কাজ করা। রাজ-কুমারীর কপালে একটা পট্টি বাঁধা, পট্টির নিচ দিয়ে ওঁর বিদ্রোহী চুলগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।...এই ধরনের পোশাকে সজ্জিতা এবং ঝুটো জহরতের গহনায় অলঙ্কৃতা হয়ে, এক চোখে পরে থাকা রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো চশমার ভেতর দিয়ে সামনের দিকে তাকাতে তাকাতে উনি বল-নাচের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ভাগ্যক্রমে নৃত্যরত যুগলদের ভিড়ের জন্যে কেউই ওঁকে তেমন করে লক্ষ্য করলো না। রিপানদেলি ওঁকে একটা কোণের দিকে নিয়ে চললো। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা উদ্ধত কণ্ঠস্বর শুনবে বলে মনে করে বললো, 'প্রিয় রাজকুমারী, আপনি না এলে আমাদের কি হতো বলুন তো?'

ওঁর চোখের প্রবঞ্চিত দৃষ্টি দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় ওঁকে যা বলা যায়, উনি তার সব কিছুই সত্যি বলে মেনে নেন। কিন্তু স্রেফ ন্যাকামো করেই উনি বললেন, 'আপনারা, মানে অল্পবয়সী পুরুষমানুষরা, যত-গুলো সম্ভব মেয়েমানুষ গেঁথে তুলতে চেষ্টা করেন...যতগুলো তুলতে পারেন, আপনাদের পক্ষে ততই ভালো। তাই নয় কি?'

'আমরা কি নাচবো, রাজকুমারী?' নাচের জায়গায় ওঁকে নিয়ে যেতে যেতে প্রশ্ন করলো রিপানদেলি। তারপর নিজের বাহুতে মহিলার

শরীরের সম্পূর্ণ গুরুভার অনুভব করে বললো, 'আপনি ঠিক পালকের মতো নাচেন।'

'সবাই আমাকে তা-ই বলে, কর্কশ স্বরে জবাব এলো।

রিপানদেলির মাড় দেওয়া জামার সামনের অংশে দলিত হয়ে যেন নিবিড় আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠলেন মহিলা, হৃৎস্পন্দন বেড়ে উঠলো তাঁর। রিপানদেলি আরও খানিকটা সাহসী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'রাজকুমারী, তোমার বাড়িতে কবে আমাকে আমন্ত্রণ জানাবে?'

সকলেই জানে, মহিলা সম্পূর্ণ একাকী থাকেন। কিন্তু উনি বললেন, 'আমার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নিতান্তই কম। এই তো, সেদিন ওই ডিউকও আমায় এই কথাটা জিগেস করেছিলেন,···আমি তখন তাঁকে এই একই কথা বলেছিলুম···খুব সাবধানে বেছে বেছে ঠিক করা মাত্র গুটি কয়েক বন্ধু আছে আমার। কিন্তু জানোই তো, আজকালকার দিনে কেউ আর বেশি সাবধানী হতে পারে না।'

'হতকুচ্ছিৎ বুড়ী কুত্তি কাঁহিকা,' ভাবলো রিপানদেলি। উঁচু গলায় বললো, 'না না', আমি সবার সঙ্গে তোমার বাড়িতে আমন্ত্রিত হতে চাই না। আমি একটু অন্তরঙ্গভাবে তোমাকে দেখতে চাই—তোমার খাস কামরায়···কিংবা···কিংবা তোমার শোবার ঘরে।'

এটাকে একেবারে আস্পর্ধাই বলা চলে, কিন্তু মহিলা বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নিলেন। কোমল সুরে এবং নাচের আবেগের জন্যে সামান্য হাঁফাতে হাঁফাতে উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি তোমাকে যেতে বলি, তাহলে তুমি তখন লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবে বলে আমাকে কথা দেবে তো?'

'খাঁটি কথা, সোনার মতো খাঁটি।'

'তাহলে আজ তোমাকে আমার বাড়িতে যাবার অনুমতি দিতে পারি। তোমার তো গাড়ি আছে, তাই না?'

এতক্ষণে নাচ শেষ হয়ে গিয়েছিলো, অভ্যাগতরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিলেন জলখাবারের জায়গাটার দিকে। রিপানদেলি দোতলায় একটা ছোট্ট ঘরের কথা বললো, সেখানে তাদের জন্যে শ্যাম্পেনের

বোতল অপেক্ষা করে রয়েছে। সিঁড়িটা দেখিয়ে সে বললো, 'এদিক দিয়ে চলো। ওপরে বসে আমরা আরও ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলতে পারবো।'

ছোট ঘরটার চারদিকের দেয়াল জুড়ে সারি সারি সাদা আলমারি, সাধারণত তাতে র‍্যাকেট আর টেনিস-বল রাখা হয়। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের ওপরে বরফের বালতির মধ্যে এক বোতল শ্যাম্পেন। যুবক দরজা বন্ধ করে রাজকুমারীকে বসতে বললো এবং তক্ষুনি তাঁকে এক গ্লাস পানীয় ঢেলে দিলো।

'রাজকুমারীদের মধ্যে যিনি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা,' মহিলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রিপানদেলি বললো, 'এবং যে রমণীর কথা আমি দিন-রাত্রি চিন্তা করি, তাঁর স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে!'

'আমিও তোমার স্বাস্থ্য পান করছি!' বিস্ময়ে হতভম্ব এবং উত্তেজিত হয়ে জবাব দিলেন মহিলা। গায়ের শালটা খুলে যাওয়ায় ওঁর কাঁধ ও বুক দেখা যাচ্ছিলো। ওঁর পিঠের পাতলা গড়ন দেখে মনে হতে পারে, মহিলা এখনও তরুণী। কিন্তু ওঁর শরীরের সামনের দিকটা, যেখানে প্রতিটি দৈহিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ওঁর পোশাকের প্রান্তভাগটা প্রথমে একধারে এবং তারপর আর এক ধারে একটু একটু করে পিছলে নেমে যাচ্ছে, সেখানকার বলি-লাঞ্ছিত মাংসপেশীর হলদেটে রঙ আগ্রাসী বয়সের ধ্বংসলীলা প্রকট করে তুলেছে।

নিজের করপুটে মাথা রেখে ছু চোখে মিথ্যে আবেগের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলো রিপানদেলি। আচমকা বলে উঠলো, 'রাজকুমারী, তুমি আমায় ভালবাসো?'

'আর তুমি?' যেন এক নিদারুণ প্রলোভনের কাছে হার স্বীকার করে যুবকের কাঁধে হাত রাখলেন মহিলা।

বন্ধ দরজার দিকে এক ঝলক চকিত দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো রিপানদেলি। ...এখন ওরা নিশ্চয়ই আবার নাচতে শুরু করে দিয়েছে, নিচতলার ছন্দোময় কোলাহল স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে।

'প্রিয় আমার,' ধীর গলায় সে জবাব দিলো, 'আমি তোমাকে চাই …তোমার চিন্তা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে।…আর কিছু ভাবতে বা বলতে আমি অক্ষম।'

ঠিক তখনই দরজায় করাঘাত শোনা গেলো এবং দরজা খুলে লুসিন, মিচেলি, মাস্ত্রোগিয়োভানি এবং জানকোভিচ নামে চতুর্থ এক ব্যক্তি হুড়মুড় করে ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলো। এই অপ্রত্যাশিত চতুর্থ ব্যক্তিটি ক্লাবের সব চাইতে পুরনো সদস্য, বয়েস প্রায় পঞ্চাশ, চুলে ইতিমধ্যে পাক ধরেছে। ভদ্রলোকের চেহারাটা রোগা-পাতলা, বিষণ্ণ মুখ, পাতলা নাক। দুটো গভীর বিদ্রূপাত্মক বলিরেখা তাঁর চোখের কোণ থেকে গলা অব্দি নেমে এসেছে। উনি একজন শিল্পপতি, অনেক পয়সা কামিয়েছেন। দিনের বেশির ভাগ সময়টাই উনি ক্লাবে বসে তাস খেলে কাটান এবং ক্লাবের অল্পবয়সী সভ্যরাও তাঁকে তাঁর নাম ধরে, বেনিয়ামিনো বলে ডাকে। যাই হোক, রিপানদেলি এবং রাজকুমারীকে দেখা মাত্রই উনি পূর্ব পরিকল্পনা মতো এক কাতর আর্তনাদ করে মাথার ওপরে হাত দুটো তুলে ধরলেন।

'এ কি! আমার ছেলে এখানে? একজন মহিলার সঙ্গে? আর তাও কিনা যে মহিলাকে আমি ভালবাসি…তারই সঙ্গে?'

'আমার বাবা,' রাজকুমারীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো রিপানদেলি। 'আমরা গেছি!'

'বেরিয়ে যাও এখান থেকে!' জানকোভিচ বৈচিত্র্যহীন সুরে রিপানদেলিকে বলতে লাগলেন, 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বদমাশ ছেলে কোথাকার!'

'বাবা, একমাত্র একটি কণ্ঠস্বরকেই আমি মেনে চলবো,' রিপানদেলি ক্রুদ্ধ গলায় জবাব দিলো, 'প্রেমের কণ্ঠস্বর।'

বিষণ্ণ ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি নিয়ে রাজকুমারীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন জানকোভিচ, 'প্রিয়তমে, আমার এই বদমাশ ছেলেটার কাছে তুমি ধরা দিও না। তার চাইতে তুমি বরং আমার কাছে এসো…তোমার ওই

সুন্দর ছোট্ট মাথাটা তোমার বেনিয়ামিনোর বুকে রেখে দাঁড়াও—যে বেনিয়ামিনো চিরদিন তোমাকে ভালবেসে এসেছে।'

হাসি চাপার জন্যে সজোরে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলো রিপানদেলি। তারপর তার তথাকথিত পিতৃদেবের দিকে তেড়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'তুমি আমাকে বদমাশ বললে, তাই না?' অতঃপর রাগারাগি এবং বিভ্রান্তির এক চমৎকার দৃশ্য। এক দিকে জানকোভিচ আর অন্য দিকে রিপানদেলি—তুজন যাতে তুজনের দিকে তেড়ে গিয়ে ঘুষোঘুষি শুরু করতে না পারে, সে জন্যে ওদের সাঙ্গোপাঙ্গরা যেন অতি কষ্টে ওদের সামলে রাখলো। হৈচৈ চেঁচামেচি আর নষ্টামির অট্টহাসি ছাপিয়ে ধ্বনি উঠলো, 'ধরে রাখো, সামলে রাখো···নয়তো ওরা একজন আর একজনকে খুন করে ফেলবে।' রাজকুমারী তখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হাতে হাত জড়িয়ে এক কোণে সিঁটিয়ে রয়েছেন। অবশেষে তুই ক্রুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বীকে শান্ত করা সম্ভব হলো। লুসিনি এগিয়ে এসে বললো, 'এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই। বাপ আর ছেলে তুজনেই একটি মহিলাকে ভালবাসে। এখন একমাত্র রাজকুমারীকেই তুজনের মধ্যে একজনকে পছন্দ করে নিতে হবে।'

অতএব রাজকুমারীকে রায় দিতে বলা হলো। কিংকর্তব্যবিমূঢ়, চাটুকারিতায় মুগ্ধ এবং উদ্বিগ্ন রাজকুমারী তাঁর যথারীতি হেলে তুলে হাঁটার ভঙ্গিমায়, এক পা এক দিকে অন্য পা অন্য দিকে ফেলে ফেলে, কোণ থেকে বেরিয়ে এলেন। 'আমি বেছে নিতে পারছি না,' তুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখে শেষ পর্যন্ত উনি বললেন, 'কারণ··· কারণ আমি তোমাদের তুজনকেই পছন্দ করি।'

জবাবে হাসি ও সরব সমর্থন উঠলো। আচমকা লুসিনি ওঁর কোমরটা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে বসলো, 'আচ্ছা রাজকুমারী, আমাকে তোমার পছন্দ?' এটা ছিলো এক ধরনের উচ্ছৃঙ্খল উৎসবের সঙ্কেতচিহ্ন —পিতাপুত্র ঝগড়া মিটিয়ে একজন অন্যজনকে জড়িয়ে ধরলো, রাজকুমারীকে সকলের মাঝখানে বসিয়ে জোরজার করে প্রচুর পরিমাণে মদ্য-

পান করানো হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই উনি সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে উঠলেন…হাসতে ও হাততালি দিতে শুরু করলেন…চুলগুলো মুখের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে প্রকাণ্ড করে তুললো ওঁর মাথাটা।

মানুষগুলো ওঁকে চালাকির প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো। এক সময় মিচেলি বললো, 'কোন একজন আমাকে বলেছে যে তুমি রাজকুমারী নও, আসলে তুমি তেমন কিছুই নও—নেহাতই ছোটখাটো একজন শুয়োরের মাংস বিক্রেতার কন্যা। কথাটা কি সত্যি?'

'ওটা একটা মিথ্যে রটনা,' রাগ ও ঘৃণায় ফুঁসে উঠলেন মহিলা। 'কথাটা তোমাকে যে-ই বলে থাকুক, নিঃসন্দেহে সে নিজেই একটা শুয়োরের মাংস বিক্রেতার ব্যাটা। আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, যুদ্ধের আগে একজন সত্যিকারের রাজকুমার আমাকে চমৎকার এক-গুচ্ছ অর্কিড পাঠিয়েছিলেন…আর সেই সঙ্গে লিখে দিয়েছিলেন, আমার ছোট্ট সোনা আদেলিনাকে—তার গোগো…'

মহিলার কথাগুলো চিৎকার ও হর্ষধ্বনির সঙ্গে গৃহীত হলো। এই পাঁচটি মানুষ—যাদের প্রণয়ীরা গোপনে তাদের নিনি, লুলু, আমার ছোট্ট সোনা অথবা আমার দুষ্টু পাজী বলে ডাকে—তারা গোগো এবং আদে-লিনা, এই দুটো আদরের ডাকের মধ্যে প্রচুর মজার খোরাক খুঁজে পেলো। কোমর ধরে হাসতে হাসতে বেঁকে গেলো সকলে। 'আহা গোগো, দুষ্টু গোগো,' বলতে লাগলো ওরা। মাতাল এবং তোষামোদে উদ্বেলিত রাজকুমারী চতুর্দিকেই সামান্য হাসি ও দৃষ্টির প্রসাদ বিতরণ করতে লাগলেন। 'ওহ্, রাজকুমারী, কি মজার চিজ তুমি!' লুসিনি ঠিক ওঁর মুখের ওপরে চিৎকার করে উঠলো এবং সে যেন ওঁকে কোন প্রশংসার কথা বলেছে, এমনিভাবে একটু হাসলেন মহিলা। 'ওহো রাজ-কুমারী, আমার রাজকুমারী,' আবেগভরে গান গেয়ে উঠলো রিপান-দেলি। কিন্তু পরক্ষণেই একেবারে আচমকা তার মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো, হাত বাড়িয়ে মহিলার একটা স্তন নিষ্ঠুরভাবে চেপে ধরলো সে। মুখ লাল করে নিজেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করলেন রাজকুমারী, কিন্তু

পরমুহূর্তেই আবার হেসে উঠে যুবকের দিকে এমন একখানা দৃষ্টিতে তাকালেন যে সঙ্গে সঙ্গে সে তার মুঠি মুক্ত করে দিলো। 'ওহ্, কি থলথলে বুক!' অন্যদের চিৎকার করে বললো রিপানদেলি, 'ঠিক যেন নেকড়া চটকালাম।···আচ্ছা, ওর পোশাক-টোশাক খুলে দিলে কেমন হয়?'

রসিকতার পরিকল্পনাটা এখন মোটামুটি শেষ হয়ে এসেছে, তাই রিপানদেলির প্রস্তাব দারুণভাবে সফল হলো। লুসিনি বললো, 'রাজকুমারী, আমরা শুনেছি তোমার শরীরের গড়ন নাকি অপূর্ব সুন্দর। তুমি দয়া করে আমাদের তা দেখতে দাও···তাহলে আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে মরতে পরবো।'

'এসো রাজকুমারী,' ভেড়ার ডাকের মতো স্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বললেন জানকোভিচ। তারপর বেশি তাড়াহুড়ো না করে মহিলার পোশাকের ফিতেটা ওঁর হাতের ওপর থেকে টেনে নামাবার চেষ্টা করতে শুরু করলেন। 'তোমার সুন্দর শরীরটাকে এভাবে লুকিয়ে রাখাটা আমরা আর বরদাস্ত করতে পারি না ··ওই গোলাপী আর শুভ্র তনু ···ছ বছরের ছোট্ট মেয়ের শরীরের মতো টোলে ভরা···'

'ওহ্, কি বেহায়া তোমরা!' হাসতে হাসতে বললেন মহিলা, কিন্তু বেশ খানিকটা পেড়াপীড়ির পর পোশাকটা উনি বুকের মাঝখান অব্দি নামাবার অনুমতি দিলেন। ওঁর চোখ দুটো তখন চকচক করছে, আনন্দে থিরথির করে কাঁপছে ঠোঁটের কোণ দুটো।

'আমার গড়নটা সত্যিই সুন্দর, তাই না?' রিপানদেলিকে জিজ্ঞেস করলেন মহিলা। কিন্তু রিপানদেলি তাতে মুখ বিকৃত করলো, অন্যেরা সমস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলো যে এটুকুই যথেষ্ট নয়—তারা আরও দেখতে চায়। লুসিনি ওঁর পোশাকের ওপরের অংশটা ধরে টান লাগালো। তারপরেই হয়তো নিজের মাঝবয়সী শরীরটা খুলে দেখানোর জন্যে লজ্জিত হলেন মহিলা। কিংবা সুরার বাষ্পজালের মধ্যে আচমকা এক ঝলক সচেতনতা প্রবেশ করে ওঁর বাস্তব পরিস্থিতিটা ওঁকে

দেখিয়ে দিলো। উনি দেখলেন—উনি লাল হয়ে উঠেছেন, চুলগুলো এলোমেলো, বুক অর্ধেক খোলা, ছোট্ট সাদা ঘরটাতে একদল বর্বর পুরুষ ঘিরে রেখেছে ওকে। একেবারে সহসা মানুষগুলোকে বাধা দিতে শুরু করলেন উনি···'আমাকে ছেড়ে দাও বলছি,' চিৎকার করে উঠে প্রাণ-পণে উনি ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করতে লাগলেন নিজেকে। কিন্তু কৌতুকের উৎসব মানুষ পাঁচটাকে উত্তেজিত করে তুলেছিলো। দুজন ওর হাত দুটো ধরে রাখলো, অন্য তিনজন পোশাকটা টেনে নামিয়ে দিলো কোমর পর্যন্ত—উন্মুক্ত হয়ে উঠল থলথলে পাণ্ডুর স্তনসহ হলদেটে একটা কোঁচকানো কবন্ধ শরীর।

'ওহ্, ভগবান, কি কুৎসিত চেহারা!' মিচেল চিৎকার করে উঠলো, 'আর কত রাজ্যের পোশাকই না পরেছে! একেবারে পোশাকের গাঁটরি ···নিচে অন্ততপক্ষে গোটা চারেক আঁট অন্তর্বাস তো নির্ঘাত পরেছে···'

এই অনাকর্ষণায় ক্রুদ্ধ নগ্নতার দৃশ্যে অন্যেরা মজা পেয়ে হাসছিলো, পোশাকের বোঝা থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছিলো মহিলার নিতম্ব দুটিকে। ব্যাপারটা আদৌ সহজ নয়, কারণ রাজকুমারী প্রচণ্ডভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এলোমেলো চুলের নিচে ওর টকটকে লাল মুখখানিতে আতঙ্ক হতাশা এবং লজ্জার ছবি এতই স্পষ্ট যে দেখে মায়া হয়। কিন্তু ওর প্রতিরোধ রিপানদেলির মনে করুণা জাগানোর বদলে, মৃত্যুবিমুখ আহত জন্তুর বিক্ষোভের মতো বিরক্তি জাগিয়ে তুললো। 'এই কুচ্ছিৎ কুত্তি, তুই নড়াচড়া বন্ধ করে শান্ত হয়ে থাকবি, কি না?' আচমকা ধমকে উঠলো রিপানদেলি, তারপর কথাটাতে জোর দেবার জন্যে টেবিল থেকে একটা শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে নিয়ে হতভাগ্য মহিলার মুখে ও বুকে বরফ-শীতল পানীয়টা ছুঁড়ে দিলো। এই আকস্মিক ঝাপটায় তিক্ত এক সবিলাপ চিৎকার করে উঠলেন মহিলা, প্রতিরোধের সংগ্রাম ফেটে পড়লো চরম হয়ে। যেমন করেই হোক, উৎপীড়কদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে কোমর অব্দি নগ্ন অবস্থায়, মাথার ওপরে হাত নাড়তে নাড়তে, আগুনের শিখার মতো ছড়ানো চুল নিয়ে,

নিতম্ব থেকে নিচের দিকে এলোমেলো হয়ে নেমে আসা পোশাকের স্তূপসহ উনি সজোরে নিজেকে দরজার দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

অপার বিস্ময় এক মুহূর্তের জন্যে পাঁচটা মানুষকে নিশ্চল করে রাখলো। কিন্তু রিপানদেলি চিৎকার করে উঠলো, 'ওকে ধরো, নয়তো ও গ্যালারিতে বেরিয়ে যাবে!' সতর্কতা হিসেবে বেরুবার দরজায় আগে থাকতেই চাবি দেওয়া ছিলো, তার ওপরে পাঁচটা মানুষ সবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো মহিলার ওপরে। মিচেলি ওর একটা হাত চেপে ধরলো, মাস্ত্রো-গিয়োভানি জড়িয়ে ধরলো কোমরটা আর রিপানদেলি টেনে ধরলো চুল-গুলো। মহিলাকে ওঁরা হিড়হিড় করে টেনে ফের টেবিলের কাছে নিয়ে এলো। ওর প্রতিরোধ মানুষগুলোকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলো। মহিলাকে পেটানোর, গায়ে আলপিন ফোটানোর, চরম উৎপীড়ন করার জন্যে এক নিষ্ঠুর বাসনা অনুভব করছিলো সকলে। 'এবারে আমরা তোকে ন্যাংটো করতে চাই,' ওর মুখের ওপরে চিৎকার করে বললো রিপানদেলি, 'উদোম ন্যাংটো।' তখনও সংগ্রাম চালাতে চালাতে আতঙ্কিত চোখে তার দিকে তাকালেন রাজকুমারী, তারপর একেবারে হঠাৎ প্রাণপণে চিৎকার করতে শুরু করলেন।

প্রথমে ফ্যাঁসফেঁসে একটা কান্নার শব্দ, তারপর একটু ফোঁপানির মতো একটা আওয়াজ, এবং সব শেষে তৃতীয়বার অপ্রত্যাশিতভাবে তীক্ষ্ণ ও চরম কর্কশ এক আর্তনাদ। ভয় পেয়ে মিচেলি ও মাস্ত্রোগিয়ো-ভানি ওঁকে ছেড়ে দিলো। আর রিপানদেলি সম্ভবত সেই মুহূর্তেই এই প্রথমবার পরিস্থিতিটার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো—যার সঙ্গে সে ও তার সঙ্গীরা জড়িত হয়ে পড়েছে। রিপানদেলির মনে হলো, পাঁচটা আঙুল দিয়ে একটা বিশাল হাত যেন তার হৃৎপিণ্ডটাকে এক-টুকরো স্পঞ্জের মতো সজোরে চেপে ধরেছে। একটা প্রচণ্ড ক্রোধ—দরজার ওপরে ফের ঝাঁপিয়ে পড়া মহিলার প্রতি এক নিদারুণ ঘৃণা তার সমস্ত চেতনা ভরিয়ে তুললো। চিৎকার করতে করতে মহিলার ওপরে ঘুষি ছুঁড়তে লাগলো সে এবং একই সঙ্গে আশাহীনতার তিমিরময় এক

অনুভূতি তাকে যন্ত্রণাকাতর করে তুললো—যার প্রকৃত অর্থ, 'আর কিছুই করার নেই···সব চাইতে খারাপ ব্যাপারটাই ঘটে গেছে। এখন অনিবার্যকে মেনে নেওয়াই বরঞ্চ ভালো···'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো রিপানদেলি। ওর হাতটা যেন আর ওর নিজের হাত নয়, যেন ওর ইচ্ছাশক্তির আওতার বাইরে সম্পূর্ণ স্বাধীন একটা অংশ বিশেষ-হাতটা টেবিল থেকে খালি বোতলটা তুলে নিলো, তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে শুধু একবার মাত্র মহিলার ঘাড়ের পেছন দিকে নামিয়ে আনলো।

দোরগোড়ার কাছ জুড়ে আড়াআড়িভাবে লুটিয়ে পড়লেন রাজ-কুমারী। এমনভাবে পড়ে রইলেন, যাতে আঘাতের দক্ষতা সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকে না। ওঁর শরীরটা ডান পাশে ফেরানো, কপাল বন্ধ দরজার সঙ্গে ঠেকানো, পোশাক-টোশাকগুলো চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে নেকড়ার স্তূপের মতো। তখনও বোতলটা হাতে নিয়ে ওঁর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা রিপানদেলি তার সমস্ত মনোযোগ মহিলার পিঠের দিকে স্থির করলো। ওঁর বাহুসন্ধির কাছে মসুরের মাপে একটা আঁচিল। এই ছোট্ট অংশটুকু এবং তাছাড়া হয়তো ঘন চুলের রাশি মহিলার মুখটা আড়াল করে রেখেছিলো বলেও, এক মুহূর্তের জন্যে রিপানদেলি কল্পনা করে নিলো—সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে সম্পূর্ণ আলাদা একজনকে আঘাত করেছে সে। ধরা যাক, ও নিখুঁত গড়নের এক অপরূপা, যাকে রিপানদেলি বৃথাই দারুণভাবে ভালবেসেছিলো, যার প্রাণহীন শরীরের ওপরে তিক্ত অনুশোচনায় কাঁদতে কাঁদতে সে নিজেকে ছুঁড়ে দেবে, এবং হয়তো তার প্রাণটাও ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। কিন্তু তখনই কবন্ধ শরীরটা একটা আশ্চর্য ঝাঁকুনি তুলে আচমকা চিৎ হয়ে গেলো, দুধারে ঢলে পড়লো স্তন দুটো, আর মুখটা···সে এক বীভৎস দৃশ্য! চুলগুলো ওঁর চোখ দুটোকে লুকিয়ে রেখেছিলো ('ভাগ্যিস,' ভাবলো রিপান-দেলি), কিন্তু ওঁর আশ্চর্য অভিব্যক্তিহীন আধখোলা মুখটা রিপানদেলিকে কসাইখানায় জবাই হওয়া এক শ্রেণীর জন্তুর কথা ভীষণ পুঙ্খানুপুঙ্খ

ভাবে মনে করিয়ে দিলো, যা সে শিশুবয়সে দেখেছিলো। 'ও মরে গেছে,' শান্তভাবে ভাবলো রিপানদেলি এবং একই সময়ে নিজের প্রশান্তিতে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো সে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বোতলটা টেবিলের ওপরে রেখে দিলো।

ঘরের অন্যপ্রান্তে জানলার কাছে বসে থাকা বাকি চারজন অবুঝের মতো রিপানদেলির দিকে তাকালো। মাঝখানে টেবিলটা থাকায় ওরা রাজকুমারীর দেহটার দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলো না—ওরা শুধু আঘাত করার দৃশ্যটা দেখেছিলো। তারপর এক ধরনের সতর্ক কৌতূহলে লুসিনি উঠে দাঁড়ালো এবং সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দরজাটার দিকে তাকালো। দোরগোড়া জুড়ে পড়ে রয়েছে বস্তুটা। সঙ্গীরা দেখলো, লুসিনি বিবর্ণ হয়ে গেলো। 'এবারে আমরা বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি,' সঙ্গীদের দিকে না তাকিয়ে নিচু ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো সে।

সব চাইতে দূরের কোণটিতে বসে থাকা মিচেলি এবারে উঠে দাঁড়ালো। সে চিকিৎসাশাস্ত্রের একজন ছাত্র, অতএব এই পরিস্থিতিতে তার খানিকটা দায়িত্ব আছে বলে তার মনে হলো। 'হয়তো স্রেফ অজ্ঞান হয়ে গেছে,' পরিষ্কার কণ্ঠস্বরে বললো মিচেলি। 'একটু অপেক্ষা করো…আমরা ওঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনবো।' টেবিল থেকে আধা ভর্তি একটা গ্লাস তুলে নিয়ে সে মহিলার দেহের দিকে নিচু হয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালো, অন্যরা গোল হয়ে ঘিরে রইলো তাকে। সকলে লক্ষ্য করলো, মিচেলি মহিলার পিঠের নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওঁকে তুলে ধরে ঝাঁকুনি দিলো…সামান্য একটু মদ ঢেলে দিলো ওঁর দু ঠোঁটের মাঝখানে। কিন্তু মহিলার মাথাটা এবার ওধারে হেলে পড়লো, কাঁধ থেকে হাত দুটো ঝুলে রইলো প্রাণহীনের মতো। মিচেলি ফের ওঁকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে ওঁর বুকে কান রাখলো। তারপর একটু পরেই উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমার মনে হচ্ছে, মরে গেছে—'এটুকু প্রচেষ্টাতেই তার মুখে তখন রক্তিম আভা।

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। 'ঈশ্বরের দোহাই, ওকে ঢেকে দাও!' মহিলার

দেহটা থেকে চোখ সরাতে না পেরে আচমকা চিৎকার করে উঠলো লুসিনি।

'তুমি নিজেই ঢাকো না বাপু!'

আবার স্তব্ধতা। নিচতলা থেকে বাজনার আওয়াজ স্পষ্ট ওদের কানে এসে পৌঁছচ্ছে, নিশ্চয়ই ট্যাংগো বাজাচ্ছে ওরা। ওরা পাঁচজনে একে অন্যের দিকে তাকালো। একমাত্র রিপানদেলি ছাড়া ওরা সকলেই এখন বসে পড়েছে। সোজা সামনের দিকে তাকিয়েছিলো রিপানদেলি, কাঁধ দুটো নোয়ানো, মাথাটা দু হাতে ধরা। তাকে ঘিরে থাকা বন্ধুদের কালো পাতলুনগুলো দেখতে পাচ্ছিলো সে। কিন্তু তারা যথেষ্ট ঘেঁষা-ঘেঁষি হয়ে না থাকার দরুন তাদের মাঝখানকার ফাঁকগুলো দিয়ে ঘরের অন্যপ্রান্তে সাদা রঙ করা দরজাটার কাছে পড়ে থাকা নিস্পন্দ দেহটাকে না দেখে থাকা একেবারে অসম্ভব।

'কি যে পাগলের মতো কাজ-কারবার!' যেন কোন উদ্ভট ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাবার ভঙ্গিমায় রিপানদেলির দিকে ফিরে তাকালো মাস্ত্রোগিয়োভানি। 'একটা বোতল দিয়ে!…ওই মুহূর্তে তোমার কি হয়েছিলো, বলো তো?'

'এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই,' কাঁপা কাঁপা গলায় কে একজন বললো। নড়াচড়া না করেও রিপানদেলি বুঝতে পারলো লুসিনি কথাটা বলেছে। 'তোমরা সবাই সাক্ষী, আমি তখন জানলার কাছটিতে বসে ছিলুম।'

ওদের মধ্যে সব চাইতে বয়স্ক মানুষ জানকোভিচ তাঁর বিষণ্ণ মুখ আর একঘেয়ে নীরস কণ্ঠস্বরে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ বৎসগণ, কে কাজটা করেছে আর কে করেনি, তা নিয়ে তোমরা তর্ক চালিয়ে যাও।…তারপর এই আকর্ষণীয় আলোচনাটার ঠিক মধ্যিখানে কেউ একজন এখানে এসে ঢুকবে, তখন আমরা সকলে মিলে অন্য কোথাও গিয়ে আমাদের তর্কটা শেষ করবো।'

'যাই হোক না কেন, সেখানে আমরা যাবো,' বিষণ্ণ সুরে বললো রিপানদেলি।

জানকোভিচ একই সঙ্গে হিংস্র ও হাস্যকর একটা ভঙ্গিমা করলো, 'এ ছোঁড়াটা একটা পাগল! ও নিজে কয়েদখানায় যেতে চায় বলেই ও চায় অন্য সকলেও সেখানে যাবে।' এক সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে জানকোভিচের মুখখানা হাসিতে গভীরভাবে কুঁচকে উঠলো, 'এবারে আমি যা বলি শোনো।'

'? ? ?'

'আচ্ছা ছাখো, রাজকুমারী তো একা একাই থাকতেন, তাই নয় কি? কাজেই হপ্তাখানেক বা তার আগে মহিলার উধাও হয়ে যাবার ব্যাপাবটা কেউ লক্ষ্য করবে না।···এখন আমরা নিচে যাবো, নাচবো, এমন ভাব দেখাবো যেন কিছুই হয়নি। নাচ শেষ হবার পরে ওঁকে আমবা আমার গাড়িটাতে তুলে সোজা শহরের বাইরে কোথাও নিয়ে যাবো···কিংবা ধরো, নদীর মধ্যে ফেলে দেবো। তখন সবাই ভাববে যে উনি আত্মহত্যা করেছেন : উনি একা থাকতেন···কোন এক হতাশার মুহূর্তে·· এ সমস্ত ব্যাপার হয়েই থাকে। যাই হোক, কেউ যদি আমাদের জিজ্ঞেস করে যে উনি কোথায়—আমরা বলবো, কোন এক সময়ে উনি এ ঘর থেকে চলে গিয়েছিলেন এবং সেই থেকে ওঁকে আর দেখা যায়নি। ··কি, এ ব্যাপারে আমরা সকলে রাজী তো?'

অন্যেরা আতঙ্কে পাণ্ডুর হয়ে উঠলো। মহিলা মারা গেছেন, তা ওরা জানতো। কিন্তু একটা অপরাধ অনুষ্ঠান করা, কাউকে খুন করা এবং সে জন্যে দোষী হয়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা তখনও তাদের মনে ঢোকেনি। তাদের মনে হচ্ছিলো, শুধু মাত্র আমোদের ব্যাপারটাতে তারা রিপানদেলির সহযোগী ছিলো—খুনের ব্যাপারে নয়। কিন্তু মৃতদেহটা নদীর জলে ফেলে দেবার প্রস্তাব আচমকা তাদের বাস্তবেব মুখোমুখি নিয়ে এলো। লুসিনি, মিচেলি ও মাস্ত্রোগিয়োভানি প্রতিবাদ করে জানালো যে, এ ব্যাপারে তাদের কিছুই করার নেই, তারা কিছু করতে চায়ও না এবং রিপানদেলি নিজেই যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে নিজেকে এ ব্যাপারটা থেকে খোলসা করে নেবে।

জানকোভিচ পরি আইনগত সম্ভাবনাগুলি মনে মনে চিন্তা করে নিচ্ছিলেন। দিব দিলেন, 'বেশ—তার অর্থ, আদালতে ফের আমাদের দেখা ানদেলি খুনের জন্যে দোষী সাব্যস্ত হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অ সহায়তা করার জন্যে আমরা প্রত্যেকেই কয়েক বছর করে সা যাবো।'

আতঙ্কে সকলে। বয়সে সকলের চাইতে ছোট লুসিনির মুখটা সাদা, চোখ ভর্তি। 'আমি জানতাম, ঘটনাটা এমনি ভাবেই শেষ হবে,' তাসে মুঠি নাচিয়ে সে চিৎকার করে উঠলো, 'আমি জানতাম···যদি কোনদিনও এখানে না আসতাম!'

কিন্তু জানকোসঠিক কথাই বলেছেন, তা একেবারে স্পষ্ট একটা সিদ্ধান্তে তাতেই হবে, কারণ যে কোন মুহূর্তেই যে কোন লোক ঘরে ঢুকে পারে। উপস্থিত মানুষগুলোর মধ্যে সব চাইতে বয়স্ক মানুষটার মঅনুমোদিত হলো এবং একেবারে হঠাৎ, যেন কাজ দিয়ে চিন্তার পে দেবার জন্যেই, ওরা পাঁচজনে তৎপরতার সঙ্গে অপরাধ অনুমস্ত চিহ্নগুলো মুছে ফেলতে শুরু করলো। বোতলটা আর। আলমারির মধ্যে চাবি দিয়ে রাখা হলো। লাশটা বিনা আয়হলেও, এক কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢেকে রাখা হলো একতোয়ালে দিয়ে। দেয়ালে ছোট একটা আরশি টাঙানো ছিলো—ক সেটার কাছে গিয়ে নিজেকে যাচাই করে নিলো, সে পরিচ্ছন্ন ফিটফাট রয়েছে কিনা। তারপর একের পরে এক ঘর বেরিয়ে এলো ওরা। আলো নেভানো হলো, দরজায় চাবি লাগলো এবং চাবিটা নিলেন স্বয়ং জানকোভিচ।

সেই মুহূর্তে চর উৎসব চরম আনন্দঘন হয়ে উঠেছে। ঘরটা লোকে লোকারণ্য গুচ্ছের মানুষ দল বেঁধে দেয়ালের কাছ ঘেঁষে বসে রয়েছে, তবসে রয়েছে জানলার তাকের ওপরে। অসংখ্য নাচিয়ে ঘূর্ণি তুলে বেড়চ্ছে এখানে-সেখানে। হাজারো 'উল্কা' উড়ে বেড়াচ্ছে চ—মানুষগুলো হরেকরঙা সেই সব পশমী গোলা-

গুলোকে লুফে নিয়ে ছুঁড়ে মারছে একে অন্যকে। প্রতিটি কোণ থেকে ভেসে আসছে খেলনা-বাঁশির তীক্ষ্ণ শিস। ঝাড়লণ্ঠনের সঙ্গে ঝোলানো ঝিরিঝিরি কাগুজে ফিতেগুলোর মাঝে মাঝে নানান রঙের বেলুনগুলো ছুলছে। মাঝে-মধ্যেই নৃত্যরত যুগলরা যখন সেগুলোকে পেড়ে নেবার জন্যে প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে, একজনের কাছ থেকে অন্যজন কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে, অথবা যে নিজেরটা অটুটভাবে রেখে দিয়েছে তাকে ঘিরে ভিড় জমাচ্ছে—অমনি তীব্র শব্দ তুলে এক একটা বেলুন ফেটে যাচ্ছে।…হাসি, কণ্ঠস্বর, আওয়াজ, আকৃতি, তামাকের ধোঁয়ার নীল মেঘ—ওপর থেকে নিচের এই আলোকিত গুহার দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে থাকা পাঁচটি মানুষের হতবিহ্বল অনুভূতির কাছে এব সমস্ত কিছুই আরব্য রজনীর অধরা উৎসবের সোনালী কুয়াশার সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাচ্ছিলো, সৃষ্টি করছিলো দায়িত্বহীনতা ও মূর্খতার এক অসার স্বর্গোদ্যান যাব মধ্যে ওরা হারিয়ে গেছে…হারিয়ে গেছে চিরদিনেব মতো। ওবা যতই চেষ্টা করুক না কেন, ওদের ভাবনাগুলো ওদেব পেছনদিকে টানছিলো…জোব করে আবার টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো আলমার বোঝাই সেই ছোট্ট ঘরটাতে—যেখানে টেবিলের ওপবে মদেব গ্লাস, কুর্সিগুলো এলোমেলো, জানলাটা বন্ধ আর এক কোণে মেঝের ওপরে একটা লাশ।

তবু অবশেষে জোর করে সিঁড়ি বেয়ে নে[illegible] এলো ওরা।

'এখন তোমাদের কাছে আমাব প্রার্থনা,' শেষ হুকুম হিসেবে জানকোভিচ বললেন, 'তোমরা সজীব হয়ে ওঠো, নাচো, নিজেরা আনন্দ করো—যেন কিছুই হয়নি।' মাস্ত্রোগিয়োভানির পেছন পেছন ওবা পাঁচজনেই ভেতবে ঢুকে ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেলো। অন্য পুরুষ নাচিয়েরা, যাদের পরনে ওদের মতোই কালো পোশাক, নৃত্যসঙ্গিনীদের বাহুবন্ধনে নিয়ে নাচের ছন্দোময় ধীর পদক্ষেপে যারা বাদকবৃন্দের মঞ্চের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো—তাদের মধ্য থেকে এখন ওদের আর আলাদা করে চিনে নেবার কোন উপায় রইলো না।

—